ডিটেকটিভ উপন্যাস

অগ্নিনিরয়



শ্রী কৌশিক মজুমদার প্রণীত



Down St.
PICCADILLY
GREEN
PARK
Victoria Memorial
CONSTITUTION HILL
St James' Palace
PALL
THE MALL
ST JAMES'S PARK
Horse Guards Parade
Government Offices
PARLIAMENT
Westminster
Buckingham Palace
BIRD CAGE WALK
Qn. Annes' Mansions
Imperial Westminster Hospital
St. Margarets Ch.
BUCKINGHAM GATE
YORK ST.
TOTHILL ST.
St. James' Pk.
Christ Ch.
GT SMITH ST.
79
Westminster Abbey
Ecclesiast! Comm's
St. Peter's Ch.
GROSVENOR PLACE
BELGRAVE
PALACE RD.
Victoria Palace
VICTORIA STREET
Victoria
GT PETER ST.
WOOD ST.
MARSHAM ST.
MILLBANK ST.
Westminster Cathedral (R.C.)
75
VICTORIA
FRANCIS ST.
ROCHESTER ROW
HORSEFERRY ROAD
St. Johns Ch.
BUCKINGHAM PALACE RD.
GILLINGHAM ST.
VAUXHALL BRIDGE RD.
VINCENT SQUARE
PAGE ST.
EARL ST.
77
CHAPTER ST.
REGENCY ST.
DUNDONALD ST.
Tate Gallery
EBURY ST.
BELGRAVE RD.
WARWICK ST.
ST. GEORGES RD.
DENBIGH ST.
CHURTON ST.
Royal Army Med. Coll.
71
EBURY BR.
SUTHERLAND ST.
St. Gabriel's Ch.
MORETON ST.
Trinity Ch.
BESSBORO' ST.
Vauxhall Bridge
COMMERCIAL RD.
70
LUPUS ST.
CLAVERTON ST.
ST. GEORGES SQUARE
72
GROSVENOR ROAD
PIMLICO PIER
RIVER
NINE ELMS PIER
Chelsea Bridge
NINE ELMS LA.
Nine Elms Goods Depot
QUEENS

Roy! Waterloo Hosp.
St. John's Ch.
Waterloo Junctn
WATERLOO
Union Jack Club
New County Hall
New Scotland Yard
Westminster Pier Bridge
Waterloo
74
YORK ROAD
WATERLOO ROAD
NEW CUT
CHARLOTTE ST.
UNION
Head Offices Fire Brig.
LOWER MARSH
BLACKFRIARS RD.
GRAVEL LANE
GT SUFFOLK ST.
FRIAR ST.
SOUTHWARK
WESTMINSTER BRIDGE RD.
Westminster Br. Rd.
Canterbury M.H.
Surrey M.H.
Royal Eye Hospital
Clock Tower
St. George's Circus
BOROUGH RD.
St. Thomas' Hospital
Houses of Parliament
LAMBETH PALACE RD.
HERCULES RD.
Christ Ch.
R.C. Cathedral
ST. GEORGE'S RD.
LONDON RD.
NEWINGTON CAUSEWAY
S. London M.H.
Lambeth Palace
Ch.
LAMBETH ROAD
Bethlem Hospital
Elephant & Castle
St. Matt Ch.
LAMBETH PIER
Lambeth Bridge
THAMES
BROOK ST.
HAYLES ST.
Elephant & Cas.
Tabernacle
Eleph & Cas Th.
Elephant & Castle
OLD PARADISE ST.
HIGH ST.
LAMBETH WALK
LOLLARD ST.
KENNINGTON ROAD
St. Philip's Ch.
Clock Tower
DANTE RD.
NEWINGTON BUTTS
WALWORTH
BROAD ST.
ALBERT EMBANKMENT
PRINCES RD.
CHESTER ST.
LOWER KENNINGTON LA.
HAMPTON ST.
CRAMPTON ST.
PENTON ST.
VAUXHALL WALK
VAUXHALL ST.
WHITE HART ST.
NEWINGTON ROAD
KENNINGTON PARK ROAD
St. Mary's Ch.
Kennington
NEW ST.
MANOR PLA.
PENROSE ST.
UPR. KENNINGTON LANE
Vauxhall
R.C. Ch.
Kennington Thea.
St. Paul's Ch.
HARLEYFORD RD.
SOUTH PL.
Walworth Rd.
KENNINGTON OVAL
KENNINGTON PARK
ST. AGNES PL.
ROYAL RD.
LORRIMORE RD.
VAUXHALL PARK
Oval
LUCAS RD.
WARHAM ST.
BERESFORD ST.
All Saints' Ch.
FENTIMAN ROAD
St. Marks Ch.
ST. MARKS RD.
CAMBERWELL
AVENUE RD.
KENNINGTON RD.

London 1885



Agniniroy

By

Kaushik Majumdar

ISBN: 978-93-92722-30-1

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২৩

প্রচ্ছদ: কামিল দাস

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: কৌশিক মজুমদার

অলংকরণ: গৌতম কর্মকার

মূল্য: ৩৭৫ টাকা

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ: ৯০৫১০১১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক: এস পি কমিউনিকেশনস প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

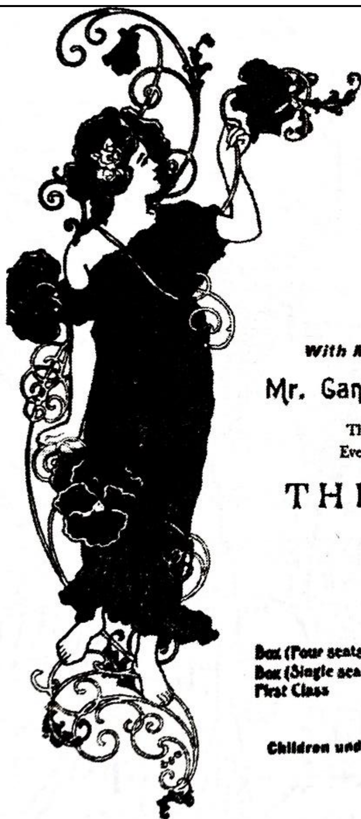




কৃতজ্ঞতা

অরুন্ধতী মজুমদার, কামিল দাস, গৌতম কর্মকার

জীবনানন্দ দাশ, প্রদীপ গড়াই, রণিতা চট্টোপাধ্যায়



GRAND OPENING NIGHT

OF

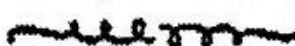
WORLD'S GREATEST WONDER

With Manacles and Fetters by the great GANAPATI.

Mr. Ganapati's Illusions prove the Supernatural.

The Question—"Is he a Man or a Devil? Is continually asked.
Every Man, Woman, and Child should see this Wonderful Man—

THE GREAT GANAPATI



Rates of Admission.

Box (Four seats)	... Rs.	10	0	Second Class	... Re. 1	0
Box (Single seat)	... "	3	0	Parquet or Carpeted Gallery	" 0	8
First Class	... "	2	0	Gallery	" 0	4

Zenana seat Rc. 1 and Annas 8 only

Children under ten years, half Price to all parts of the Circus except on the Gallery.

এখানে পৃথিবী আর নেই

বলে তারা মানবকল্যাণেই

হিংসা-ক্লান্তির পানে

বিদায় নিয়েছে;

কল্যাণ-কল্যাণ; এই রাত্রির গভীরতম মানে।

কৃষ্ণাদশমীর রাতে: তোমাকে। জীবনানন্দ দাশ



অন্তিমকথন

১৯ জুন, ২০১৮, চন্দননগর, রাত্রি ১১.১৫

দেবাশিস গুহর জবানি

বহুদুর থেকে একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলা বারবার ফিসফিস করে কী যেন বলে চলেছে। একবার। দুবার। বারবার। জ্ঞান ফিরতেই গলা জ্বালানো একটা টক অনুভূতি টাকরা, জিভ, মাড়িতে ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। বুঝতে পারছি আর বেশিক্ষণ এইভাবে থাকতে পারব না। চোখ খোলার চেষ্টা করলাম। চারিদিকে ক্লোরোফর্মের বোবা গন্ধ। কিছু বোঝার আগেই বাসু আমাকে কাবু করেছে। একটা কাপড় দিয়ে আমার দুই চোখ চেপে বাঁধা। সেই চাপে চোখের মণি দুটো টনটন করছে। চোখের পাতার কিছু অংশে ঘষা খেয়ে জ্বালা ভাব। চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকার। একটু যদি বাঁধনটা হালকা করে দিত.....

অনেকক্ষণ বাঁধা থাকায় আমার দুই হাতে, কাঁধে টনটনে ব্যথা। নাড়াতে পারছি না। একটু নড়লেই নাইলনের সরু দড়ি কেটে চামড়ার মধ্যে বসে যাচ্ছে। পা দুটোও একইভাবে গোড়ালির কাছে বাঁধা। বুকের ভিতরটাতে প্রচণ্ড জোরে ধুকপুক করছে। গাড়ির ইঞ্জিনের মতো। যেন এখুনি ফেটে বেরিয়ে যাবে। খেয়াল করলাম আমার গোটা দেহে এক টুকরো সুতো অবধি নেই। বেতের চেয়ারের টুকরোটাকরা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা অংশ সরু সরু ছুঁচের মতো খোঁচা দিচ্ছে থাইয়ের কোনায়, কুঁচকির গোপন ফাঁকে। জোরে নিঃশ্বাস নিতে গেলাম। ভুল করলাম। ও জেনে গেল আমি জেগে গেছি। সঙ্গে সঙ্গে উরুর পাশে গরম লোহা বেঁধার মতো তীব্র যন্ত্রণা। তীক্ষ্ণ ধাতব এক ফলা ঢুকে যাচ্ছে মাংস চিরে। সর্বনাশ! এ যে ক্লাসিক লিং-চি! চোখ বেঁধে একের পর এক আঘাতে শত্রুকে চিরে ফেলা। আমিই শিখিয়েছিলাম ওকে!

প্রবল ব্যথার মধ্যে ডুবে যেতে যেতেও আমার মাথা কাজ করছে। করছে স্বাভাবিকের থেকে অনেক দ্রুত। তবে না করলেই ভালো হত যেন। আমি

চিৎকার করে বলতে চাইলাম, *"লিবেরা অক্সিলিয়াম অ্যাডিউভেরেট টুবাল-কেন।"* মুখ দিয়ে কোনও আওয়াজ বেরোল না। নিজের অস্পষ্ট গোঙানি শুনে নিজেই চমকে উঠলাম।

একে একে সব ছবির মতো ভেসে উঠছে। আজকের রাতের জন্যই এত আয়োজন। আজকেই এমন হতে হল! আর কয়েক ঘন্টা মাত্র। যদি ঈশ্বর বলে কেউ থেকে থাকেন, তাঁর কাছে ভিক্ষা করছিলাম অনন্ত থেকে কেড়ে নিয়ে আসা ঘড়ির পদচারণা। যদি এভাবেও কাটিয়ে দিতে পারি, তবে বিপদ কেটে যাবে আপাতত। মুছে যাবে গত চব্বিশ ঘণ্টার ইতিহাস। তারপর... তারপর সবকিছু আবার নতুনভাবে ভাবতে হবে। একেবারে শূন্য থেকে। যে লম্বা, প্রায় অভঙ্গুর বিশ্বাসের শিকল তৈরি করেছিলাম গত কয়েক বছরে, তার সবচেয়ে জরুরি জোড় আমার অজান্তেই দুর্বল হয়ে গেছে। আমি বুঝতেও পারিনি। নাকি এটাই ভূতের সবচেয়ে বড়ো শয়তানি! সেই অবস্থাতেই বারবার ভাবার চেষ্টা করলাম, কেন এমন হল? একেবারে অযাচিতভাবে যে অসামান্য সুযোগ ঈশ্বর আমার সামনে এনে দিয়েছিলেন, কীভাবে তিনি নিজেই তা কেড়ে নিতে পারেন!

ঘরে অস্থির নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি। একের পর এক বই, আলমারি থেকে টেনে নামানো হচ্ছে। ফেলা হচ্ছে মাটিতে। আমি বুঝতে পারছি। আমি জানি ও কী খুঁজছে। আমি জানি এমনিতে ও সেটা পাবে না। অত্যন্ত সংগোপনে আমি জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দিয়েছি। আমি নিশ্চিত, এই একবিংশ শতাব্দীতে আমি ছাড়া আর কারও পক্ষে ভূতের সন্ধান করা সম্ভব ছিল না। সত্যি বলতে আমিও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। আজ থেকে একশো বছর আগে যাঁরা ভূতকে বশ মানিয়েছিলেন, সংগত কারণেই তাঁরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তাকে এক কাল্পনিক রূপকথার গল্প, এক আজগুবি ধারণা হিসেবে খাড়া করেছিলেন। আর আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা বিশ্বাস করেও গেছিলাম। বিশ্বাস করে যেতাম। যদি ...

অতি ধীরে একটার পর একটা ছোটো ছোটো আঘাতে ছুরির ফলা ঢুকে যাচ্ছে আমার বুকে, পেটে, বাইসেপ বরাবর। আর তার সঙ্গে একটাই প্রশ্ন।

"কোথায়? কোথায়?"

আমি জানি এর শেষ কীভাবে হতে চলেছে। আবার আমারই মনের একটা অংশ তা বিশ্বাস করতে চাইছে না। এভাবে সবকিছু শেষ হতে পারে না। মাথাটা ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার শক্তি হারাচ্ছি। হয়তো তীব্র রাখার জন্যে। কিংবা অত্যধিক রক্তপাতের ফলে। রমণপাষ্টির খেলা শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যেতে চলেছে। সান্ত্বনা একটাই- আমার মৃত্যুর পরে পৃথিবীর এই আদিমতম রহস্যের সমাধানের নাগাল আর কেউ কোনও দিন পাবে না। শতাব্দীপ্রাচীন এই জ্ঞান আমার সঙ্গেই লোপ পাবে একেবারে। এর কথা আর কেউ জানে না।

জানবে না।

আচমকা তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রথমে কিচ্ছু দেখতে পেলাম না। চোখের শাঙ্কব কোশেরা এতক্ষণ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়েছিল। আচমকা উজ্জ্বল এলইডি-র আলোতে মানিয়ে নিতে ওদেরও সমস্যা হচ্ছে। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সারা মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। আর ডান চোখ যে জায়গায় থাকা উচিত, মুখোশের সেখানে হলুদ সুতোতে সেলাই করা একটা চোখ। Omnes videntes oculum. কিন্তু আমি জানি ও আসলে কে। ওকে এই মুখোশ আমিই পরিয়েছিলাম। পরম যত্নে। যেমন করে এক স্নেহশীল বাবা শীতের রাতে পুত্রকে মাঙ্কি ক্যাপ পরিয়ে দেয়।

"কোথায়?"

আবার বলে উঠল সেই একই ঘড়ঘড়ে গলা। সে আমার থেকে যা জানতে চায়, তার সন্ধান ইহজগতে কেবল আমিই জানি। শুধু জানি না, ওকে সেটার সন্ধান দেওয়া ঠিক হবে কি না। অবশ্য না দিলে মুক্তির অন্য উপায়ও তো কিছু মাথায় আসছে না। যন্ত্রমানবের মতো বারবার সেই কণ্ঠ ক্রমাগত একই প্রশ্ন

করে চলেছে আর প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমার দেহের কিছু কিছু চামড়া মাংস উঠে আসছে ধারালো ছুরির ডগায়। ছুরির হাতলে ড্রাগনের মুখ খোদাই করা। গ্র্যান্ড হোটেলের কিউরিও শপ থেকে কিনেছিলাম।

আমার আত্মা অবশেষে আত্মসমর্পণ করল। আমি বুকশেলফের সেই ফলস তাকটার কথা বলে দিতে বাধ্য হলাম যেখানে একদিন, এত সন্তর্পণে বাক্সটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। বাক্স হাতে নিয়ে কালো মুখোশ খুলে ফেলল বাসু। খুব যত্ন নিয়ে দেখতে লাগল সেটাকে। যেন ছোটো ছেলে তার প্রিয় খেলনা পেয়েছে। এই মুখ, এই চোখ, এই অলীক ভাব আমার অনেকদিনের চেনা। তারপর সোজা আয়নার দিকে চেয়ে রইল ফ্যালফ্যাল করে। আমি অস্ফুটে ডাকার চেষ্টা করলাম, "বাসু... বাসুকি..."

সে সাড়া দিল না।

এবার তার দৃষ্টি গেল টেবিলের ওপরে লাল প্যাডের দিকে। দ্রুত হাতে পাতা উলটে কয়েক মুহূর্তে বার করে ফেলল অভীষ্ট পৃষ্ঠা। আর তখনই ওর হাতে খসে পড়ল চার ভাঁজ করে রাখা হলদে কাগজটা। আমার সব প্ল্যানের ব্লুপ্রিন্ট। আমি চিৎকার করে বাধা দিতে চাইলাম। পারলাম না। গলা শুকিয়ে কাঠ। আর মাত্র কয়েক মিনিট। চোখের সামনে ঘড়ির কাঁটা যেন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীরে চলছে। আমি মনে মনে হিসেব করে চলেছি। আর বড়োজোর আধঘন্টা... পঁচিশ মিনিট.....কুড়ি। বাসু আমার চোখে চোখ রাখল। সে চোখে ঘৃণা, রাগ আর কষ্ট মিলেমিশে আছে। বাসু সব কিছু জেনে গেছে।

এই প্রথমবার আমি ভয় পেলাম।

বাসু কাগজটা পকেটে ঢোকাল। পকেট থেকে একটা ডট পেন নিয়ে কী যেন লিখতে লাগল তাতে। তারপর মেলে ধরল আমার চোখের সামনে। ব্যথায় চোখ বুজে আসছে, তবু অত কষ্টের মধ্যেও না তাকিয়ে পারলাম না। অবাক বিস্ময় আর আতঙ্ক নিয়ে দেখতে পেলাম, যেন আমাকে দেখানোর জন্যেই, আমার চোখের সামনে অবিকল আমার হাতের লেখা নকল করে বাসু লিখেছে-

তুর্বসু জানে।

তারপর ড্রাগনমুখো ছোরার ডগাটা ঘরের ধবধবে সাদা আলোতে ঝিকিয়ে উঠল শেষবারের মতো।

পূর্বখণ্ড— সংলিপ্ত

প্রথম পরিচ্ছেদ— বেডলামের গোপন অধিবেশন

১৫ আগস্ট, ১৮৮৫, লন্ডন

১।

গত চারদিন অবিশ্রান্ত ধারার বৃষ্টিতে গোটা লন্ডন শহর জুড়ে বিচ্ছিরি প্যাচপ্যাচে কাদা। সঙ্গে একটানা ঠান্ডা হাওয়ার দাপট। গতকালই লন্ডন টাইমসে খবর করেছিল, এ শহরে নাকি প্রতি আট মিনিটে মারা যাচ্ছে একজন মানুষ। কিন্তু কারও তাতে কিচ্ছু আসে যায় না। প্রতি পাঁচ মিনিটে জন্ম হচ্ছে একজন নবজাতকের। মহারানি ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে বসার চল্লিশ বছর যেতে না যেতে শহরের জনসংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে বেড়ে প্রায় ৪০ লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছত্রাকের মতো চারিদিকে গজিয়ে উঠছে নিত্যনতুন বাসস্থান, কলকারখানা। শহর জুড়ে অজস্র রাস্তা আর গলিঘুঁজির গোলকধাঁধা। গোটা শহরটাই যেন বিরাট এক কনস্ট্রাকশন সাইট। শহরে নিকাশি ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। গোটা টেমস নদী বদ্ধ ডোবার মতো ঘন মলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে নদী থেকে বয়ে আসে পূতিগন্ধযুক্ত হাওয়া। কলেরা, প্লেগ, গুটিবসন্ত এই শহরের অতি পরিচিত তিন সঙ্গী। তবে এসব কিছুই ভাবছিলেন না লুই। তিনি ভাবছিলেন গতকাল রাতে আসা বেনামি চিঠিটার কথা। তাঁর স্ত্রী অসুস্থ। অন্য ঘরে ঘুমান। লুই বাইরের ঘরে একটা বিছানায় ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। কাল অনেক রাতে দরজায় মৃদু টোকা পড়ে। লুইয়ের রাতে ভালো ঘুম হয় না। তিনি উঠে দরজা খুলতেই চাকর জানায় একজন অচেনা লোক এসে এইমাত্র চিঠিটা দিয়ে গেল। বলেছে এখুনি মালিককে দিতে। জরুরি।

সাদা খামে ভরা মামুলি চিঠির মতো দেখতে হলেও গালায় যে মোহরটা আঁকা ছিল, সেটা দেখেই লুই বুঝলেন, এ কোনও সাধারণ চিঠি না। আগামী

কাল, সকাল ঠিক এগারোটায় বেথলেহেমে প্রভু যিশুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে বলা হয়েছে সেই চিঠিতে। সঙ্গে দুটো মরচে পড়া চাবি। চিঠিতে যদি বা কিছু সন্দেহ থেকে থাকত, দেখা করার সময়কাল আর এই চাবিতে তা দূর হল একেবারে। শমন এসেছে। এই ডাক অগ্রাহ্য করার সাধ্য নেই তাঁর।

পরদিন সকালে বৃষ্টিটা ধরল একটু। কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হল বেশি। দম বন্ধ করা গাঢ় হলুদ কুয়াশা ঢেকে দিয়েছে গোটা লন্ডন শহরকে। কারখানা থেকে বেরোনো গন্ধকে ভরা এই কুয়াশায় বেশিক্ষণ শ্বাস নেওয়া যায় না, কাপড় চ্যাটচ্যাটে হয়ে যায়। অন্য কোনও দিন হলে লুই বাড়ির বাইরে পা দিতেন না। কিন্তু আজ উপায় নেই। আধখানা ডিম আর এক গেলাস ক্ল্যারেট পেটে ঢেলেই টুপি, ছাতা নিয়ে ধরাচূড়া পরে হাঁটা দিলেন বেড়লাম হাসপাতালের দিকে। অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক কোনও ঘটনা ঘটেছে। তা না হলে গত দশ বছর তিনি এই সংঘের সঙ্গে যুক্ত। এমন জরুরি তলব আসেনি কোনও দিন।

কুয়াশার উপদ্রবে দিনের বেলাতেও রাস্তায় গ্যাসলাইট জ্বালানো। গোটা শহর এক অদ্ভুত রহস্যময় রূপ ধারণ করেছে। মানুষ চলছে অশরীরী প্রেতাত্মার মতো। খটখট শব্দ করে পাথুরে রাস্তায় এগিয়ে চলেছে ঘোড়ায় টানা বগি আর হ্যানসম ক্যাব। চাইলেই একটা ক্যাব নিয়ে নেওয়া যেত। কিন্তু সংঘের মাস্টারের কড়া নিষেধ। কোনও সাক্ষী রাখা যাবে না। আরও মিনিট পনেরো হেঁটে নদী পেরিয়ে লুই চলে এলেন সাউথওয়ার্কে। তাঁর অভীষ্ট স্থানে। প্রায় ছশো বছরের প্রাচীন এই বেডলাম হাসপাতালের আসল নাম বেথলেহেম হসপিটাল। প্রথমে সবরকম চিকিৎসাই চলত এখানে। মূলত শহরের দরিদ্র, অনাথরাই এদের রোগী। পরে রাজা অষ্টম হেনরির আদেশে এই হাসপাতালকে শুধুমাত্র উন্মাদ আর মানসিক রোগীদেরই চিকিৎসায় নিয়োজিত করা হল। লোকমুখে বেথলেহেম হল বেডলাম। মূল ফটকের পাশের চত্বরের দুপাশে দুটো বিরাট পুরুষ মূর্তি। একজনের নাম মনখারাপ, অন্যজনের নাম পাগলামো। লোকে ঠাট্টা করে এঁদের নাম রেখেছে "ব্রেইনলেস ব্রাদার্স।" তবে লুই মূল ফটকের দিকে গেলেনই না।

তিনি মাথার টপহ্যাটটাকে একটু নামিয়ে দিয়ে মুখের কিছুটা ঢেকে পা চালালেন হাসপাতালের বাগানের দিকে। সেখান থেকে সোজা চলে যাওয়া যায় পিছনের ছোটো খিড়কি দরজায়। এই কুয়াশায় সুবিধেই হয়েছে একরকম। তা না হলে তাঁকে কেউ না কেউ চিনে ফেলতই। বিশেষ করে তাঁর লেখা শেষ বইটা বাচ্চাদের জন্য লেখা হলেও বড়োরাও পড়ে খুব সুখ্যাতি করেছেন। স্বল্পপরিচিত কবি থেকে তিনি একজন কেউকেটা হয়ে উঠেছেন রাতারাতি। খিড়কির সামনে এসে খানিক অপেক্ষা করলেন লুই। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন। কেউ অনুসরণ করছে না তো? নাহ, কেউ নেই।

কালো খিড়কির দরজাটা দেওয়ালের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে খেয়াল না করলে এর অস্তিত্ব বোঝা মুশকিল। লুই সাবধানে সিঁড়ির তিনটে ধাপ উঠে দরজায় খটখট করলেন। প্রথমে তিনবার। একটু থেমে আবার তিনবার। দরজার উপরে ছোটো একটা ঘুলঘুলি খুলে গেল। একটা হলুদ লণ্ঠনের আলো। ভিতরের লোকটি নিশ্চিত হতে চাইছে কে এসেছে। শুধু দরজা খোলার সংকেত জানলেই হবে না। এরপর ভিতর থেকে নির্দেশ এল *“ক্ল্যাভিস।”* পকেট হাতড়ে সেই চিঠির সঙ্গে পাওয়া চাবিটা ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন লুই। একটু বাদেই সামান্য আওয়াজ করে দরজা খুলে গেল। ছোটোখাটো চেহারার এক কিশোর লুইকে দেখে হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। লুই জানেন কোন পদ্ধতিতে হাত ধরতে হবে। এই গোপন করমর্দনের ভঙ্গি সংঘের সদস্য বাদে কেউ জানে না। কিন্তু লুই হাত ধরতেই ছেলেটি তাঁর হাতের তেলোতে চারটে আঙুল রেখে মাঝের দুটো আঙুল খুলে দিল। ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, *“মাহাবোন।”* চমকে উঠলেন লুই। এই সংকেত, এই গোপন শব্দের অর্থ তিনি জানেন।



"লজের দরজা খোলা।" সংঘের গোপনতম কোনও সভায় আমন্ত্রণ পেলেই এই শব্দ উচ্চারিত হয়। কী হবে আজ?

লুইয়ের দুর্বল হৃৎপিণ্ড জোরে জোরে ধুকপুক করতে লাগল। মুখে সে ভাব দেখালেন না তিনি। সামনে ছেলেটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই পথ গোলকধাঁধা। তাঁকে একা ছেড়ে দিলে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবেন না। লুইয়ের নাকে আসছে রোগীদের মলমূত্রের কটু গন্ধ। কাকে যেন চাবুক মারা হচ্ছে। তার চিৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠছে হাসপাতালের নিস্তব্ধতা। আরও একটু এগোতেই কানে এল দোতলার উন্মাদদের হাসির শব্দ, শিকলের ঝনঝন। আর দুই একটা মোড় ঘুরে সিঁড়ি চলে গেছে নিচের দিকে। এখানে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আলো বলতে শুধু সেই হলুদ লণ্ঠনের মিটমিটে আভা। এখানে কোনও শব্দ নেই। যেন সবাই মরে গেছে। এতক্ষণ তাও লুইয়ের মনে হচ্ছিল তিনি ইহজগতে আছেন। এখন পাতালপুরীর এই নিস্তব্ধতায় তাঁর দম বন্ধ হয়ে এল। অবস্থা একটু স্বাভাবিক করতে গলা খাঁকরে তিনি সামনের ছেলেটিকে শুধালেন, "তোমার নাম কী বাছা? কী করা হয়?"

ছেলেটি স্বভাবে গম্ভীর। একটু থেমে পিছন ফিরে জানাল, "আমি মাস্টারের সেবা করি। আমার নাম রিচার্ড হ্যালিডে।"

২।

লুই ভেবেছিলেন ছেলেটা তাঁকে কোনও সভাঘরে নিয়ে যাবে। কিন্তু ভারী ওক কাঠের দরজার পিছনের নিভুনিভু গ্যাসলাইটের আলোয় যে অপার্থিব ঘরটা লুইয়ের চোখের সামনে খুলে গেল, সেটা দেখবেন বলে লুই আশা করেননি। ঘরের লম্বা করিডরের দুইপাশে কাঠের চেম্বার, তাতে লাইন ধরে নানা অদ্ভুত

লেবেল মারা সব রাসায়নিকের বোতল, রিটর্ট, টেস্টটিউবের সারি আর বকযন্ত্র শোভা পাচ্ছে। অন্যদিকের টেবিলের ঠিক মাঝখানে ধিকিধিকি জ্বলছে বুনসেন বার্নার। তাতে কিছু একটা ফুটে বগবগ শব্দ হচ্ছে। প্রথমে খানিক সময় লাগল বুঝে উঠতে। তারপর ঘরে উপস্থিত সবাইকে দেখতে পেলেন লুই। এ যে চাঁদের হাট বসেছে! সংঘের সব মাথারা বসে আছেন গোল টেবিল ঘিরে। মাঝে মাস্টার ম্যাসন এলি হেনকি (জুনিয়র) স্বয়ং। তাঁকে ঘিরে অভিনেতা হেনরি আরভিং, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বাঘাবাঘা গোয়েন্দারা। এঁদের মধ্যে মেকলিজনের মতো কুখ্যাত অফিসার থেকে জর্জ ক্লার্ক, উইলিয়াম পামার, নাথানিয়েল ডুস্কভিচ কে নেই! লুই গুনে দেখলেন মোট সাতজন। উইলিয়াম পামার সর্বজনশ্রদ্ধেয় হলেও ইদানীং কোনও কারণে সরকারের রোষে পড়েছেন। কিন্তু এরা সবাই মিলে একসঙ্গে এখানে কী করছে! লুই এসব ভাবার আগেই পামার অনুচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "চিহ্ন।" লুই জানেন তাঁকে কী করতে হবে। তিনি একটা হাত বুকের ওপরে রেখে অন্য হাত দিয়ে নিজের গলা কাটার ভঙ্গি করলেন। মৃদু হেসে হেনকি হাত বাড়িয়ে বললেন, "গ্রিপ।" আবার করমর্দন। কিন্তু এই পদ্ধতি আরও গোপন। সংঘের একেবারে উপরের ডিগ্রির কেউ না হলে, এটা জানা অসম্ভব। লুই জানেন। হাত মিলিয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে মাস্টারের হাতের গিঁটে স্পর্শ করতে হয়। এর মানে সম্পূর্ণ বশ্যতা।



এবার আরভিং-এর পালা। লাইসেনিয়াম থিয়েটারের এই নামজাদা অভিনেতা লন্ডনের প্রথম ম্যাসনিক লজের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। গম্ভীর গলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওয়ার্ড।" লুই এর উত্তর জানেন। একটুও না ভেবে বললেন, "বোয়াজ।" আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন এমন হাই ম্যাসন মিটে তাঁর মতো অভাজনের ডাক পড়ল কেন?

প্রথম কথা বললেন উইলিয়াম পামার। হেনকির দিকে তাকিয়ে বললেন, “তবে সভা শুরু করা যাক?”

হেনকি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ইশারায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রিচার্ড হ্যালিডেকে কী যেন ইঙ্গিত করলেন। হ্যালিডে চকিতে বাইরে বেরিয়ে পাশের ঘর থেকে ধরে আনল একেবারে ছোটোখাটো একটা মানুষকে। লোকটা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু। কোনওক্রমে তাকে ধরে এনে চেয়ারে বসাতেই সে ধপ করে বসেই আবার ঢুলতে লাগল। হেনকি উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর স্বরে বলা শুরু করলেন, “ব্রাদার্স, আপনারা হয়তো জানেন, আমাদের ম্যাসনিক লজের একেবারে শুরুর দিন থেকে সদস্যদের খোঁজ ছিল এমন এক সত্যের, যে সত্য মানুষের মনের গহিনতম রূপকে ধরতে পারে। আমাদের কাছে নিশ্চিত খবর আছে, শুধু আমরাই না, সুদূর এশিয়ার পীত চিনদেশীয়রাও বহু আগে থেকে এই খোঁজ চালাচ্ছেন। মানবমনের নেতিবাচক শক্তিকে তাঁরা ইন এবং ইতিবাচক শক্তিকে ইয়ান বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের সুপ্রাচীন বর্ণমালা ই-চিং-এ এই ইন ও ইয়ান মিলিয়ে মোট চৌষট্টিটি চিহ্ন বা হেক্সাগ্রাম আছে। কিন্তু যা আজ অবধি সবার অধরাই থেকে গেছে, তা হল এমন কিছু, যা এই শুভ আর অশুভ, ইন আর ইয়ান-কে আলাদা করতে পারে। ধূসরকে ভেঙে ফেলতে পারে সাদা কালোয়। আদিম যুগ থেকে চিনা গং-সি আর টং, জার্মানির ইলুমিনাটি, আমেরিকার স্কাল অ্যান্ড বোন, সবাই অতি সংগোপনে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিল এই নিয়ে। নিজেদের মতো। কিন্তু কেউ সফলকাম হয়নি।”

এলি হেনকি বলে যাচ্ছিলেন, লুই বুঝবার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন, এসব ইতিহাস বলার জন্য এত গোপন মিটিং-এর কী দরকার? আর এই অর্ধঘুমন্ত মানুষটিই বা কে?

যেন তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেই হেনকি বলে উঠলেন, “ইতিহাসের কথা বলে আর আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেব না। যে কারণে আজকের এই

জরুরি মিটিং, আমি এমন কিছু একটা আবিষ্কার করেছি, যা মানবমনের ইন আর ইয়ান-কে আলাদা করতে পারে।”

ঘোষণাটা এতই অস্বাভাবিক আর অকল্পনীয় যে কেউ এর জন্য তৈরি ছিল না। ঘরে গুনগুন শব্দ শুরু হল। সবাই অবাক। এ যে অবিশ্বাস্য! হেনকি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেন সবাইকে সুযোগ দিলেন খবরটা হজম করার। তারপর চেয়ারে বসে ঢুলতে থাকা মানুষটির দিকে তর্জনী দিয়ে দেখিয়ে বললেন, “আপনারা অনেকেই হয়তো এই হতভাগ্য মানুষটিকে চেনেন না। কিন্তু নাম শুনেছেন। এই বেচারা মানুষটির নাম জেমস লংলি।”

নামটা উচ্চারণ করতেই ঘরের অনেকেই সচকিত হয়ে লোকটির দিকে তাকালেন। পামার আর মেকলিজন বাদে। খুব সম্ভব পুলিশে কাজ করার দরুন তাঁরা একে আগে থেকেই চেনেন। মেকলিজন একটা রুপোর খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল। পামার নিরুত্তাপ। লুই সবিস্ময়ে দেখছিলেন লংলিকে। দুই মাস আগেই লন্ডনের সব পত্রিকার প্রথম পাতা জুড়ে দিনের পর দিন লংলির কীর্তিকাহিনি ছাপা হয়েছে। নেহাত ছাপোষা স্কুলমাস্টার লংলি মানসিক সমস্যার জন্য বেডলামে ভরতি ছিলেন। একদিন সবার নজর এড়িয়ে তিনি পালিয়ে যান। যাবার সময় এলি হেনকির কোটের পকেট থেকে কোল্ট প্যাটারসন রিভলভারটাও গোপনে হাতিয়ে নেন। বেডলাম থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমেই তাঁর স্কুলে গেলেন। কাউকে কিছু বুঝতে দেবার আগেই ক্লাসরুমে ঢুকে এক গুলিতে চার বছরের ছোট্ট মেয়ে মিয়া ইভান্সের মাথা উড়িয়ে দেন তিনি। বিচার চলে। বিচারে লংলির প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ডাক্তার এলি হেনকি অনেক বলেকয়ে, মুচলেকা দিয়ে তাঁকে আবার বেডলামে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। সে লোক এখানে কী করছে?

“আপনারা ভয় পাবেন না। জেমস লংলি এখন একটা গাছের চেয়েও শান্ত। আমার কথায় রোজ ওকে পনেরো গ্রেইন করে ক্লোরাল হাইড্রেট দেওয়া হচ্ছে। এতে হৃৎস্পন্দন কমে যায়। রোগী আপনাআপনি শান্ত হয়ে পড়ে। এবার আমি

আপনাদের সামনেই ওকে কিছু প্রশ্ন করব। আপনারা শুধু শুনে যান। কিছু বলবেন না।”

লংলির একেবারে সামনে একটা চেয়ার নিয়ে বসে তিনি খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নাম কী বাছা?”

প্রথমে সে শুনতে পায়নি। পরে আবার একই কথা জিজ্ঞাসা করায় ইঁদুরের মতো চিঁচিঁ শব্দে উত্তর দিল, “জেমস লংলি।”

“ঠিকানা?”

“৩৯, চ্যারিংক্রশ, লন্ডন।”

“তুমি এলি প্যাটারসনকে খুন করেছ?”

এলির নাম শুনতেই লংলির দুই চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। পাশাপাশি মাথা নাড়ল সে।

“কখনোই না। মিয়া আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রী ছিল। সবচেয়ে মিষ্টি আর আদুরে। আমার অঙ্ক ক্লাসে শুধু আমার জন্যেই রোজ একটা না একটা উপহার নিয়ে আসত।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এলি হেনকি।

“ব্রাদারস! এই হল জেমস লংলি। এবার অন্য একজনের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করাই।”

এলি আবার ইশারা করতেই রিচার্ড কোথা থেকে এসে লংলির হাত পা চেয়ারের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে দিল। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল লংলির মুখ। হেনকি এগিয়ে গেলেন কেমিক্যালের টেবিলের দিকে। সেখানে একটা কাঠের ছোটো স্ট্যান্ডে তিন-চারটে বোতল রাখা। পাশেই বেশ কয়েকটা টেস্টটিউব। তাদের একটা হাতে নিয়ে এলি হেনকি এবার সরাসরি তাকালেন লুইয়ের দিকে। হালকা একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটের কোনায়। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, “দেখুন ব্রাদার, ভালো করে দেখুন এবার কী হতে চলেছে। আর কেউ না দেখলেও আপনি দেখুন। আপনার দেখা দরকার।”

"কিন্তু কেন? আমিই কেন?" অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন লুই।

"কারণ, আমরা কেউই লেখক না। আপনি লেখক। জনপ্রিয় লেখক। শব্দের জাদু আপনার হাতে। আপনি চাইলেই সত্যিকে মিথ্যা বানাতে পারেন আর মিথ্যাকে সত্যি।"

"কিন্তু এক্ষেত্রে..."

"এক্ষেত্রে আপনি যা যা দেখবেন, তা যত অসম্ভবই মনে হোক না কেন, আপনি সেটা লিখবেন। লিখবেন কল্পকাহিনির ঢং-এ, অলীক রূপকথার মতো। যাতে সবাই একে বানানো গল্প বলে বিশ্বাস করে। বইয়ের প্রচারের ভার আমাদের ব্রাদাররা নেবেন। সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। আপনি শুধু কাহিনিটা লিখে দেবেন। জানেন তো আমরা, ব্রাদাররা একটা কথায় বিশ্বাস করি। যেদিন ঈশ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল শয়তানেরও। তবে শয়তানের শয়তানি কোথায় জানেন? শয়তান মানুষকে বিশ্বাস করিয়েছে সে অলীক, অবাস্তব। তার কোনও অস্তিত্ব নেই। আর এই বিশ্বাসের সুযোগেই সে ছোবল মারে। আমরাও সে পন্থাই নেব।"

এলি হেনকি তাঁর টেস্টটিউবে প্রথমে ঢেলে নিলেন রক্তের মতো লাল রঙের এক তরল। বার্গান্ডি রেড। দ্রুত হাতে তাতে মিশিয়ে দিলেন কয়েক ফোঁটা প্রবণ আর সাদা পাউডার। বার্নারে গরম করতেই মিশ্রণটা টগবগ করে ফুটতে লাগল। রং বদলে প্রথমে লাল থেকে বেগুনি, পরে অদ্ভুত সবুজ বর্ণ নিল। ঠান্ডা হতেই হেনকির নির্দেশে লংলির মুখ হাঁ করিয়ে সেই তরল ঢেলে দিল তাঁর সহকারী হ্যালিডে।

প্রথমে কিছু না বোঝা গেলেও খুব ধীরে ধীরে লংলির মধ্যে একটা পরিবর্তন খেয়াল করলেন লুই। সারা দেহ অল্প অল্প কাঁপছে। মাথা নড়ছে। কাঁপুনি বাড়তে শুরু করল। সঙ্গে মুখ দিয়ে অদ্ভুত পাশবিক ঘড়ঘড় আওয়াজ। তারপর গোটা দেহ জুড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। লুই ভয় পেলেন। মনে হল এই শিকলও দুর্বল হয়ে পড়বে। ভারী ওক কাঠের চেয়ার দুলতে লাগল সামনে পিছনে। মিনিটখানেক

এমন চলল। তারপর সব শান্ত। শুধু লংলির গলার অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে গোটা ঘর জুড়ে। হেনকি লংলির সামনে গিয়ে বসলেন। আবার আগের মতো জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি মিয়া ইভান্সকে খুন করেছ?"

আবার মাথা নাড়ল লংলি। তবে এবারে উপরে নিচে।

"মুখে বলো", একটু ধমকের সুরে বললেন ডাক্তার।

"হ্যাঁ" ঘড়ঘড়ে গলায় উত্তর এল।

"কেন?"

"এমনি..... কোনও কারণ নেই। মজা পেলাম। তাই। সুযোগ পেলে আরও মানুষ মারব। মানুষ মারতে মজা লাগে।"

"তোমার নাম কি জেমস লংলি?"

পাশাপাশি নাড়ল লংলি। না।

"তবে? তবে তোমার নাম কী?"

লুইকে চমকে দিয়ে চাপা গলায় লংলি বলে উঠল, "আমার নাম হিউড রাডি। ঠিকানা ৩৯, ক্রশ, লন্ডন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— পাপের সোপান

প্রায় বৃদ্ধ, টাকমাথা এক গার্ড হেলেদুলে আমার কাছে এসে জানালেন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এবার আমায় উঠতে হবে। রাস্তার সব আলো জ্বলে গেছে। খেয়াল করিনি। চুঁচুড়া কবরখানার বিরাট বিরাট সব ওবেলিস্ক আর ভার্নেতের কবর যেন দূরাগত কোন জটিল ধাঁধার সাক্ষী হয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। একা বসে ভাবছিলাম, যদি এরা কথা বলে উঠতে পারত, তবে হয়তো শতাব্দীপ্রাচীন এক রহস্যে কিছু হলেও আলো পড়ার সুযোগ ছিল। একটু আগেই যা দেখলাম, যা আমার হাতে এই মুহূর্তে ধরা আছে, তা যদি সত্যি হয়, তবে এতদিনে, এই প্রথম, ভাগ্য কিছুটা হলেও প্রসন্ন হয়েছে। ইতিহাস কথা বলে উঠেছে। মুশকিল

হল, কী বলছে তা বোঝার সাধ্যি আমার নেই। আমার যাদবপুর মেকানিক্যালের বিদ্যায় এই সংকেত পাঠ অসম্ভব। তবু যতটা যা বুঝেছি, তাও কম না। এই যে তদন্তের শুরু থেকেই ভূতের নাম বারবার ফিরে ফিরে আসছে, যে ভূতকে নেহাত অলীক, নেহাত অসম্ভব ভেবে বারবার অবজ্ঞা করেছি, সেই ভূতের এমন পাথুরে প্রমাণ হাতেনাতে পাব, কোনও দিন ভাবতে পারিনি।

মোটা বাদামি কাগজের উপরে জড়ানো প্যাঁচানো হাতের লেখায় B.H.U.T. নামে একটা প্রস্তুতের প্রণালী লেখা। খুব বেশি ভুল না হলে, এই ভূতের প্রতিটা অক্ষরের আলাদা মানে আছে। না হলে মাঝে এই ডট থাকত না। গোটা লেখাটা একজনেরই হাতে, কিন্তু দুটো ব্যাপার অদ্ভুত। একেবারে মাথায় একটা গোল চিহ্ন আছে। অনেকটা সিলের মতো। কিন্তু সিল না। তার ভিতরে খুব ছোটো আকারে নানা অদ্ভুত মূর্তি আঁকা। খালি চোখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। আতশ কাঁচটা দিয়ে দেখতে হবে। শুধু দুটো অক্ষর বোঝা যাচ্ছে সিলের মধ্যে। A আর G। এ বস্তুর রহস্য উদ্ধার আমার একার কম্মো না। দেবাশিসদা বেঁচে থাকলে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারতেন। কিন্তু এখন উপায় বলতে অমিতাভ মুখার্জি। তিনিও পারবেন কি না সন্দেহ। আর একজন আছেন বটে, ঊর্ণার সেই অধীশদা। কেমিস্ট্রি খুব ভালো না বুঝলেও ভদ্রলোক হিস্ট্রিটা বেজায় ভালো জানেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গার্ড যখন আমায় ডাকতে এল তখন আমি ঠিক করে নিয়েছি, আগে অধীশদার কাছে যাব। কিছু ব্যাক আপ ইনফরমেশন না নিয়ে এগোনো যাবে না। তারও আগে একজনের সঙ্গে কথা বলা খুব দরকার। জটের অনেকটাই তাঁর হাতে।

নিশীথ দত্ত। ঊর্ণার বাবা। নীবার নামের সেই এনজিও-র সদস্য।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত নটা হয়ে গেল। ফিরেই কেমন একটা অস্বাভাবিক ঠেকছিল গোটা বাড়িটা। পুরো বাড়ি অন্ধকার। পাড়াটা এমনিতেই খালি থাকে এই সময়। পোর্টিকোতে আলো জ্বলছে না। অন্যদিন ঊর্ণার ঘর থেকে খুব ধীরে গানের আওয়াজ ভেসে আসে। আজ সে ঘর নিস্তব্ধ। সবাই

গেল কোথায়? কিন্তু তাহলে তো সদর দরজায় তালা থাকত। তাও নেই। ঠিক সেই সময় একটা জিনিস দেখে আমার বুকের ধুকধুকানি বেড়ে গেল। দরজা ভেজিয়ে রাখা। এত বছরে এই প্রথমবার দেখলাম। উর্ণাদের বাড়ি রাস্তার উপরেই। তাই দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকে সর্বদা। আমি বেল বাজালে কেউ খুলে দেয়। ওরা বাইরে গেলে আমার কাছে স্পেয়ার চাবি থাকে। সেটা খুলেই ঢুকি। বাইকটা একপাশে সিঙ্গল স্ট্যান্ডে রেখে খুব ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে কোনও সাড়াশব্দ নেই। খুব ধীরে, যাতে আওয়াজ না হয়, এমন করে দরজা সামান্য ফাঁক করে বোঝার চেষ্টা করলাম ভিতরে কী চলছে? লবিতে একটা হলদে আলো জ্বলে। সেটা যথারীতি জ্বলছে। সিঁড়ির তলায় জুতো খুলে পা টিপে টিপে উপরে উঠতে লাগলাম। মেজানাইন ফ্লোরের ঘরটার সামনে আসতেই উপর থেকে খুব চাপা গলায় কথা শোনা গেল। কান পেতে শোনার চেষ্টা চালালাম। বোঝা যাচ্ছে না। একটা গলা কাকুর। মানে ঊর্ণার বাবার। কাকু চলে এসেছেন তবে? অন্যটা পুরুষ কণ্ঠ। মনে হচ্ছে কেউ মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কথা বলছে। উর্ণারা কেউ নেই ঘরে? নাকি আছে? কতজন ভিতরে ঢুকেছে? এক না একাধিক? আমার কি পুলিশে ফোন করা উচিত? ভাবতে ভাবতে উপরে উঠে দেখি কাকুর ঘরের থেকেই আওয়াজ আসছে। দরজা সামান্য খোলা। উঁকি মারলে ভিতরে দেখা যাবে। আগুপিছু না ভেবে উঁকি মেরে যা দেখলাম তাতে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। ঘরের মাঝে একটা চেয়ারে বসে আছেন নিশীথ দত্ত। তাঁর দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। পরনে ছোটো একটা আন্ডারপ্যান্ট বাদে এক টুকরো সুতলি অবধি নেই। ওঁর চোখে মুখে বিস্ময়। উনি মাথা নাড়ছেন বারবার। আর ওঁর সামনে....

আমার দিকে পিছন ফিরে উলটো দিকের চেয়ারে বসে আছে একটা সা-জোয়ান লোক। দরজার ফাঁক দিয়ে লোকটার পিঠের একটা অংশ দেখা যাচ্ছে শুধু, আর মাথার কিছুটা। লোকটা কালো রঙের মাথাঢাকা একটা মুখোশ পরে আছে। এবার বুঝলাম কেন গলার আওয়াজ অমন শোনাচ্ছিল। কথা হচ্ছে

একেবারে নিচু পর্দায়। প্রায় ফিসফিস করে। লোকটা কিছু জানতে চাইছে। কিছুর খবর। আমি মন দিয়ে শুনতে চেষ্টা করলাম। সব কথা পরিষ্কার না। তবু তার মধ্যেই "দেবাশিস গুহ" আর "খুন" শব্দ দুটো কানে এল। একবার শুনলাম "লাস্টচান্স", আর-একবার "আমরা শিওর।"

আমি না। আমরা।

এই আমরা মানে কারা?

হঠাৎ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরেই একটা প্রশ্ন করল লোকটা। আর সেটা শুনেই কেঁপে উঠলাম।

"তুর্বসু জানে?"

জানি না শ্বাস চাপার আওয়াজ হয়েছিল কি না, নাকি দরজায় ভুলে ভর দিয়ে ফেলেছিলাম। চেয়ারে বসা লোকটা চকিতে দরজার দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, "কে?"

তারপর আমাকে বিন্দুমাত্র সময় না দিয়ে এক ঠেলায় দরজা খুলে ফেলল। লোকটার মুখে মাথাজোড়া একটা কালো স্কিমাস্ক। অনেকটা স্পাইডারম্যানের মতো। ফলে চোখ, নাক, মুখ, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। লোকটার হাতে চকচকে যে যন্ত্রটা, সেটা এবার আমার দিকে তাগ করা। অজান্তেই আমার হাত দুটো উপরে উঠে গেল।

আর ঠিক তখনই আমাকে অবাক করে লোকটা স্কিমাস্ক খুলে ফেলল।

"এসে গেছ? ভেবেছিলাম তার আগেই ভয় দেখিয়ে কনফেশন আদায় করব। কিন্তু এ মাল হার্ড নাট টু ক্র্যাক।"

আমার ঘোর তখনও কাটেনি। আমতা আমতা করে বললাম "মানে? কী ব্যাপার?"

"দেবাশিস গুহকে খুনের দায়ে তোমার বাড়ির মালিক নিশীথ দত্তকে আমরা গ্রেপ্তার করছি", বলে আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন অফিসার অমিতাভ মুখার্জি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— নকল মনুষ্য

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জার্নাল থেকে

পুলিশ কর্মচারীগণকে কীরূপে মোকদ্দমার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, অজ্ঞাত বিষয়ে অনুসন্ধানে কীরূপে লিপ্ত হইতে হয়, অজ্ঞাতনামা অপরাধীকে কীরূপে ধৃত করিতে হয় তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ আমি এ যাবৎ আমার 'দারোগার দপ্তরে' লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই লোকজগতে দিন দিন যত প্রকারের অপরাধের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে একটি অপরাধের সহিত অপরটির যে কোনও রূপ সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু গভীর অনুসন্ধানে নানা অপরাধের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য থাকিলেও বেশ কিছু মিল নজরে আসে। গোয়েন্দাদের কর্ম সেই মিল খুঁজিয়া বাহির করা। এই সূর্যের তলায় নূতন কিছু ঘটে না, যাহা ঘটে তাহা পুরাতনের অনুবর্তন মাত্র, ইহাই আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। বহুলাংশে তাহা সঠিকও বটে। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ কর্মজীবনে এই একটিই মোকদ্দমা পাইয়াছি, যাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার মুহূর্তে যে বিষয় একবারের নিমিত্তও ভাবা যায় নাই, বা অনুসন্ধান করিতে করিতে যে সকল সামান্য বিষয়ের দিকে একবারের নিমিত্ত নয়ন আকৃষ্ট হয় নাই, সেই সকল সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া মোকদ্দমার গূঢ় রহস্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমার জার্নালের এই অন্তিম অংশে আমি যাহা লিপিবদ্ধ করিতে যাইতেছি, তাহা যতই অলৌকিক, অসম্ভব বা অবাস্তব মনে হউক না কেন, ঈশ্বর শপথ, ইহার প্রতিটি শব্দ বর্ণে বর্ণে সত্য। যে ভয়ানক ষড়যন্ত্রের জাল গোটা ইংরাজ শাসনের ভিত্তিমূল টলাইয়া দিতে প্রায় সক্ষম হইয়াছিল, আমি এক্ষণে তাহা পূর্বাপর বর্ণনা করিব। এই জার্নাল কেহ পাঠ করিবে বলিয়া আশা রাখি না, কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে যদি এই পাণ্ডুলিপি ভবিষ্যতের কোনও পাঠকের হস্তে পতিত হয়, তাঁহাকে বলিব, হে পাঠক, যাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধির বাহিরে হইলেও সত্য, সম্পূর্ণ সত্য, সত্য বই কিছু নয়।

মেডিক্যাল কলেজে তারিণীর কেবিনে যে নাটকের উন্মোচন হইতেছিল, তাহার বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সাইগারসন সাহেব বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখপানে চাহিয়াছিলেন। শৈলর রচিত নাটকের শুরুর বিজ্ঞাপনেই বিপরীত সম্পাতিতে সে যাহা বলিতে চাহিয়াছে, তাহার তিলমাত্র যদি সত্য হয়, তবে এতবড় বিপদের সম্মুখীন ইংরাজ সরকার আজ পর্যন্ত হয় নাই। আমার জিহবা ভারী হইয়া উঠিয়াছিল, মুখে কথা জোগাইতে ছিল না। এতবড় একখানি খবর সাহেবকে কীভাবে বলিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। সাহেব আমায় পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কিছু বলিতেছেন না কেন? কী লিখিত আছে উহাতে?"

আমি ক্ষীণ কম্পিত কণ্ঠে জানাইলাম, "সাহেব, কোন মুখে এই পাপ বাক্য উচ্চারণ করি? তবু আপনি জোর করিতেছেন, তাই বলি, ইহাতে লিখিত আছে, আগামী বৎসর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি অনুষ্ঠানে তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হইতেছে।"

ভাবিয়াছিলাম সাইগারসন সাহেব চটিয়া উঠিবেন, অথবা চমকাইবেন, অথবা এ সম্ভাবনাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। তিনি এই সমস্ত কিছুই করিলেন না, বরং তাঁহার ঘন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইয়া প্রায় মিশিয়া গেল। অতি ধীর পদক্ষেপে একখানি কেদারায় উপবেশন করিয়া হস্তের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পরের সহিত স্পর্শ করাইয়া ঘাড় গুঁজিয়া তিনি কী যেন ভাবিতে লাগিলেন। মুখমণ্ডল গম্ভীর, যেন বর্ষণের পূর্বে অম্বুবাহী জলদ আসিয়া জমা হইয়াছে। কেবিনে উপস্থিত কেহ কিছু বলিতেছে না কিংবা বলা যায়, বলিবার সাহস জোগাইতেছে না। খানিক বাদে সাহেব নিজেই অতি ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "সিউডোম্যান তবে সত্য!"

আমরা কেহই কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তিনজনে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। সাহেবের ব্রায়াররুট পাইপখানি নিভিয়া গিয়াছিল। আবার তাহা জ্বালাইয়া সাহেব বলিতে শুরু করিলেন-

"হয়তো আপনাদের জ্ঞাত নাই, অদ্য অবধি আততায়ীরা মোট আটবার মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে হত্যার প্রচেষ্টা পাইয়াছে। প্রথমবার, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, মহারাণীর বিবাহের চতুর্থ মাসে, প্রিন্স এডওয়ার্ড ও মহারাণী বৈকালে বায়ু সেবনে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। এডওয়ার্ড অক্সফোর্ড নাম্নী অষ্টাদশবর্ষীয় এক যুবক মহারাণীকে উদ্দেশ্য করিয়া বন্দুকের গুলি ক্ষেপণ করে। সে গুলি মহারাণীকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইহার পরবর্তীতে জন ফ্রান্সিস, উইলিয়াম বিন, উইলিয়াম হ্যামিলটন সহ মোট সাতজন আটবার মহারাণীকে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। অবশ্য প্রতিবারই তারা ব্যর্থ হয়।"

-সাতজন ব্যক্তি আটবার প্রচেষ্টা করিল কেমন করিয়া?

অবাক হইয়া দেখিলাম অসুস্থ তারিণীর দুই চোখ জ্বলজ্বল করিতেছে। প্রশ্নটি সে-ই করিল।

সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "জন ফ্রান্সিস ১৮৪২ সালের পরপর দুইদিন ২৯ শে ও ৩০ শে মে মহারাণীকে হত্যার চেষ্টা চালায়। প্রতিবারই বিফলকাম হয়। প্রথমদিন তাহার বন্দুক চলে নাই, দ্বিতীয়দিন আবার প্রচেষ্টা চালাইতে যাইবার পূর্বেই সে মহারাণীর প্রহরীদের হাতে ধৃত হয়। শেষ প্রচেষ্টা হয় ১৮৮২ সালে। ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কিন্তু এই আটটি প্রচেষ্টায় অদ্ভুত কিছু মিল লক্ষ করা গিয়াছিল, যাহাতে লন্ডনের স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাগণ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনকে সমস্ত ঘটনা এক গোপন চিঠিতে জানাইতে বাধ্য হন।"

"কী সেই মিল? জানিতে পারি কি?" আবার তারিণী।

"এখন আর লুকাইবার কিছুই অবশিষ্ট নাই। প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের সহিত মহারাণীর বিশেষ সুসম্পর্ক ছিল না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমাদের গুপ্তচর বিভাগ তদন্ত করিয়া দেখিয়াছে, এই দীর্ঘ শাসনকালে যতবার মহারাণীর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে, তাহার কিয়মাসের মধ্যেই তাঁহাকে হত্যার প্রচেষ্টা চালানো হয়। প্রতিবার হত্যার চেষ্টার পর ইংলন্ডে মহারাণীর জনপ্রিয়তা পুনরায় বৃদ্ধি পায়। ইহাতে প্রাথমিক সন্দেহ ছিল না, সন্দেহ দেখা দিল যখন গোয়েন্দারা

তদন্ত করিয়া দেখিলেন প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার মোডাস অপারেন্ডি বা হত্যা পদ্ধতি একই প্রকার এবং প্রতি ক্ষেত্রেই মহারাণী ক্ষমার দেবী হইয়া দোষীদের মৃত্যুদণ্ড মুকুব করিতেছেন”

“এক্ষণে সেই দোষীদের কি কারাবাস হইয়াছে?” আমি আর না থাকিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলাম।

মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল সাইগারসনের ওষ্ঠে।

“ইহাদের প্রায় সকলকেই মানসিক রোগগ্রস্ত আখ্যা প্রদান করিয়া বেডলাম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁহার পরে তাঁহাদের কী হইল, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে খোঁজ আমরা পাই নাই।”

“তবে জুবিলিতে....”

“জুবিলি লইয়া আমরা সকলেই খুব চিন্তিত। ১৮৮২ হইতে আজ অবধি চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মহারাণী বৃদ্ধা হইয়াছেন। রাজপরিবারে সিংহাসনের দখল লইয়া এমন কিছু সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা ঠিক এই মুহূর্তে প্রকাশযোগ্য নহে। প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের শেষ সময়কাল হইতে প্রধানমন্ত্রী ও মহারাণীর সম্পর্ক ক্রমাগত নিম্নমুখী হইতে থাকে। মহারাণী প্রায়শই নানা ছলে প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করিবার কৌশল খুঁজিতে থাকেন। আমাদের বিশ্বাস মহারাণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত সেই সময়কালেই ঘটে।”

“গ্ল্যাডস্টোনের এই সময়কাল কবে হইতে কবে?” তারিণী এক্ষণে শায়িত অবস্থা হইতে উঠিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়াছে।

“১৮৯২ সনের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৮৯৪ সনের ২রা মার্চ।”

কেবিনে উপস্থিত সকলে স্তব্ধবাক, চিত্রার্পিত নিঃস্পন্দ হইয়া রহিয়া গেলাম। এই সময়কাল আমাদের সকলের অতি পরিচিত। যে ভয়ানক, অলীক, বীভৎস নাট্যের ক্রীড়নক আমরা সকলে, তাহারও সূত্রপাত হইয়াছিল ওই কালসন্দর্ভেই, তাহা কি কেউ ভুলিতে পারে? ভোলা সম্ভব?

সাহেব যেন আমাদিগের হৃদয়ের কথা বুঝিয়াই বলিলেন, "তদন্তকালে যে সকল তথ্য আমাদিগের হাতে আসিয়াছে, তাহাতে আমরা নিশ্চিত, মহারাণীর রাজত্বকালের ষষ্ঠদশ বর্ষপূর্তি উৎসবকালেই তাঁহার উপরে অন্তিম আঘাত হানা হইবে। এ আঘাত এড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। তবে তাহা কোন পথে, কীরূপে, কাহার বেশে আসিবে তা আজও আমাদিগের অজানা। আগামী বৎসর জুবিলি উপলক্ষ্যে মহারাণীর ভারতে আসিবার পরিকল্পনা। আমাদের ধারণা আঘাত তখনই আসিবে। গুপ্তঘাতকেরা খোদ ইংলন্ডে মহারাণীকে হত্যার সাহস আর দেখাইবে না। ইহার জন্যেই ভারতকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। ইংলন্ড অপেক্ষা ভারতে মহারাণীর বিরোধীর সংখ্যা প্রবল। দিকে দিকে ইংরাজ শাসন বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিতেছে। এইস্থলে তাই ষড়যন্ত্রকে বাস্তব রূপ দান অধিকতর সহজ।"

"মহারাণীকে এদেশে আসিতে বারণ করা কি নিতান্ত অসম্ভব?"

"উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া অসম্ভবই বটে। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে মহারাণী এই দেশের শাসনভার নিজ হস্তে লইবার পরই বিভিন্ন স্তর হইতে দাবি আসিতেছে, যে উপনিবেশ ব্রিটিশরাজের সর্বাপেক্ষা অধিক কর নিষ্কাশনের ক্ষেত্র, সেই উপনিবেশে কেন মহারাণী স্বয়ং যাইবেন না? মহারাণী ভিক্টোরিয়া আপন ভাবমূর্ত্তি সচেতন। একবার যখন স্থির করিয়াছেন ভারতে আসিবেন, তাঁহাকে নিবারণ করে কার সাধ্য! আর আমাদের হস্তেও কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নাই। আছে শুধু এই অদ্ভুত সাংকেতিক নাটিকাটি আর আততায়ীর নাম।"

"আততায়ীর নাম?"

আমার প্রশ্নেই যে বিস্ময় লুকাইয়া ছিল তাহা বুঝিয়া সাহেব মাথা নাড়িয়ে বলিলেন, "ঠিক নাম নয়। ছদ্মনাম। এই ঘৃণ্য কার্য যাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তাঁহার ছদ্মনাম সিউডোম্যান বা নকল মনুষ্য। কিন্তু তিনি কে বা তাঁহার পরিকল্পনা কী, সে বিষয়ে আমরা আজও গভীর তমসায় নিমগ্ন।"

"কিন্তু তাঁহার ছদ্মনামই বা জানা গেল কীরূপে? কে এই গুপ্তকথা ফাঁস করিল?"

"হিলি। আসল হিলি। যাহাকে আমারই পরামর্শে গুম করা হইয়াছিল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— বলিদান

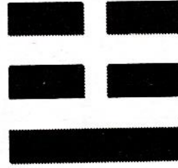
১০ এপ্রিল, ১৮৯১, লন্ডন, রাত ৮-৩৫

"তাহলে এখন বলুন প্রফেসর, এই প্রস্তাবে আপনি রাজি কি না।" এপ্রিলের লন্ডনে এবার অদ্ভুত এক শুকনো হাওয়া বইছে। রেস্তোরাঁর ভিতরের এই গোপন ঘরে কোনও জানলা নেই, তবু ফিনফিনে রোগা, তালঢ্যাঙা প্রফেসরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। ভদ্রলোকের বয়স সবে পঞ্চাশের কোঠায়। কিন্তু বিলীয়মান কাঁচাপাকা চুল, চওড়া কপাল দেখে তাঁকে আরও অনেক বেশি বয়স্ক লাগে। এক অর্থে সুবিধাই। চেহারা দেখে তাঁর বয়স আন্দাজ করা যায় না। আর তিনি সেটাই চান।

প্রশ্ন শুনে প্রফেসরের গর্তে বসা চোখ দুটো যেন রাগে জ্বলে উঠল। কিছুদিন আগে হলেও হয়তো লোকটার সাহস হত না তাঁকে এই প্রস্তাব দেবার। তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে সোজা তাকিয়ে রইলেন প্রশ্নকর্তার দিকে। বিরাট চেহারার মানুষটার সারা মুখ দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ভরা। খাদ্যরসিক। যখন কথা বলেন ঠোঁটের কোনায় একটা হালকা হাসির রেশ লেগে থাকে, যেন কোনও মজার জোকস শোনাচ্ছেন। খবর আছে, স্বয়ং মহারানি তাঁর ঘনিষ্ঠতম বৃত্তে এঁকে স্থান দিয়েছেন।

প্রফেসরের আজ ক্লাস ছিল বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের উপরে। মাত্র একুশ বছরেই এই নিয়ে একটা পেপার লিখে সবাইকে এমন চমকে দেন যে তার জোরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ তিন হাজার পাউন্ডের গণিতের অধ্যাপকের পদটি তাঁর দখলে। ক্লাস চলছিলও খুব সুন্দরভাবে। দারুণ কথা বলতে পারেন তিনি।

গোটা ক্লাস মুগ্ধ হয়ে শোনে। ক্লাস শেষ হতেই ছাত্ররা একে একে এসে তাদের ভালোলাগা জানায়। কেউ কেউ প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে। আজ ছাত্রদের মধ্যে থেকেই একজন এগিয়ে এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে করমর্দন করে চলে যেতেই প্রফেসর বুঝতে পারলেন তাঁর হাতের তালুতে ছোটো একটা কাগজের টুকরো চলে এসেছে। সেখানেই হলবর্ন রেস্তোরাঁর কথা আর সময়ের উল্লেখ ছিল। অন্য সময় হলে প্রফেসর হয়তো ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতেন না, কিন্তু সবকিছু গুলিয়ে দিল একটা ছবি। চিহ্ন। মোটা পালক কলমের দাগে কাগজের নিচে আঁকা ছিল এই চিহ্নটা।



এই চিহ্নকে অস্বীকার করার সাহস প্রফেসরের অন্তত নেই। ক্লাস শেষে একটা ছ্যাকরাগাড়িতে উঠে বসলেন। টপ হ্যাট পরে ছপটি হাতে চালক বসে আছে গাড়ির ছাদে। তিনি গাড়িতে উঠে কিছু বলার আগেই চালক ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে বেশ জোরেই "হলবর্ন" বলে রওনা হল। প্রফেসর অবাক হলেন। আবার হলেন না। এদের কাজকর্ম অনেক আঁটঘাট বাঁধা। নিজেও এই ধরনের গোছানো কাজ পছন্দ করেন। অন্ধকার রাস্তায় টিমটিমে গ্যাসলাইট। গাড়ির দুপাশে তেলের বাতি জ্বলছে। ঘোড়া চলার সময় পায়ে পায়ে শিকল ঠেকে ঝমঝম শব্দ হচ্ছে। মাথার দুইদিক টিপে ধরে প্রফেসর বসে রইলেন অনাগত কালের প্রতীক্ষায়। তিনি বুঝতে পারছিলেন জাল গুটিয়ে আসছে। কিন্তু সে জালের কেন্দ্রে তিনি নেই, থাকতে পারেন না। তিনি একাই একটা ইন্ডাস্ট্রি, তবু তিনি সর্বদাই ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকেছেন। আইনি পথে তাঁকে পাকড়াও দূরে থাক, ছোঁয়া অসম্ভব। এই সবকিছু তিনি জানেন। তবু এই ছোট্ট চিরকুটের মধ্যে অশুভ কিছু একটা ছিল, যা তাঁকে কিছুতেই শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। বহু

অলিগলি এদিক ওদিকের পথ পেরিয়ে গাড়ি কিংসওয়ে আর হাই হলবর্নের পশ্চিম পাড়ে হলবর্ন রেস্তোরাঁর সামনে থামল। কেউ পিছু ধাওয়া করছে কি না নিশ্চিত হবার জন্য এই ঘুরে ঘুরে গন্তব্যস্থানে আসার পাঠ। নতুন অপরাধীদের একেবারে শুরুতেই শেখানো হয়। গাড়ির ছোকরা তবে নিতান্তই নভিস। গাড়ি মূল গেটে না দাঁড়িয়ে পাশের এক ছোটো খিড়কির সামনে দাঁড়িয়েছে। নেমে বটুয়া বার করতেই ক্যাবের ছোকরাটি "লাগবে না স্যার। পেমেন্ট করা আছে", বলে ঝনঝনিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। দরজার সামনেই খাটোমতো, টাকমাথা একজন দাঁড়িয়ে। সে সসম্মানে প্রফেসরকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলল। দোতলায় নাচঘর থেকে ভেসে আসছে বাজনার টুংটাং, হাসির শব্দ। কিন্তু প্রফেসরকে নিয়ে যাওয়া হল একতলার বড়ো হলের পাশ দিয়ে। এককালে এখানে বসত লন্ডনের সবচেয়ে বড়ো জুয়ার আসর। হলবর্ন ক্যাসিনো। সরাসরি না হলেও প্রফেসরের আয়ের একটা বড়ো অংশ আসত এখান থেকে। এখন রানির আদেশে ক্যাসিনো বন্ধ। ক্যাসিনোর ঠিক পাশেই লবি শেষ। টাকমাথা লোকটি সেই দেওয়ালের সামনে গিয়ে একবার পিছনে তাকিয়ে দেখে নিল। তারপর এক অজানা বোতামে চাপ দিতেই দেওয়ালের গা থেকে একটা পাল্লা খুলে এল। ভিতরে দারুণ সুসজ্জিত একটা ঘর। আলো জ্বলছে। মনে মনে একটু হাসলেন প্রফেসর। এই বুদ্ধি নরওয়ের সেই স্থপতি জোনাস ওল্ডএকর ছাড়া কারও হতেই পারে না। একেবারে সিগনেচার কাজ। প্রফেসরের চেনা। ছোট্ট ঘরে ডিনার টেবিল সাজানো। একেবারে ফুল কোর্স ডিনার। দুরকম স্যুপ, মাছের দুরকম পদ, স্টেক, চিপস, স্যালাড, চিজ আর ডেজার্ট। এক কোণে দুটো বোতল ভরা রিসবার্গের ভিন্টেজ মদ। দরজার দিকে পিছনে ফিরে বসে যে মোটা ভদ্রলোকটি একটা বইয়ের পাতা আনমনে ওলটাচ্ছিলেন, তাঁর পরিচয় আলাদাভাবে দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়েই তিনি পিছন ফিরে "কাম ইন" বলে প্রফেসরকে ডেকে নিলেন। দরজা আবার আগের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এই গোপন ঘরে এখন তাঁরা। দুজন। প্রফেসর

আড়চোখে ভদ্রলোকের হাতের বইয়ের দিকে তাকালেন। এ বই তাঁরই লেখা। যেন প্রফেসরের মনের কথা বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক দাড়ির ফাঁকে হেসে বললেন, "একা বসে বসে কী আর করব? আপনার লেখা বইটাই পড়ার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু এ তো ভয়ানক কঠিন বই মশাই। দুপাতা এগোতে পারলাম না। শীতালি পাখির মতো সব সংকেত আর ইক্যুয়েশনে ভর্তি!"

প্রফেসর মৃদু হাসলেন। মুখে কিছু বললেন না। এদের আসলে মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন তিনি। এরা ভাবে ক্ষমতা হাতে আছে বলে সব কিছু বোঝার অধিকার এরা পেয়ে গেছে। কিন্তু তা বলে এদের মাথায় তাঁর লেখা 'ডাইনামিক্স অফ অ্যান অ্যাস্টেরয়েড'-এর মতো কঠিন গণিতের বই ঢুকবে, তা আশা করাই বাতুলতা।

অনুমতি নিয়ে সামনের চেয়ারে বসতেই সরাসরি কাজের কথায় চলে এলেন ভদ্রলোক।

"দেশ চালানো তো ক্রমে মুশকিল হয়ে যাচ্ছে প্রফেসর। বুঝছেন তো? বিশেষ করে আমাদের মহারানির শত্রু এখন চারিদিকে। সবাই ষড়যন্ত্র করছে রানিকে হেয় করার, তাঁর ব্যর্থতাগুলো বড়ো করে দেখানোর, এমনকি বিরোধীরা তোরানির একটা নামও দিয়েছে। ফ্যামিন কুইন। দুর্ভিক্ষের রানি। এসব কি রানির ভাবমূর্তির পক্ষে ভালো? আপনিই বলুন প্রফেসর?"

প্রফেসর উত্তর দিলেন না। এইসব ছেঁদো কথা বলতে যে তাঁকে ডাকা হয়নি, তা তিনি জানেন। শুধু তিনি অপেক্ষা করছিলেন আলোচনাটা কোনদিকে গড়ায় সেটা দেখার জন্য।

"রাজকুমার এডির ঘটনাটা আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই?"

আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু প্রফেসর ভেবেছিলেন চিরকালের মতো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে গেছে। তিন বছর বাদে আবার সেই ঘটনা মাথাচাড়া দেবে, এ তাঁর চিন্তার বাইরে। এবারও উত্তর না দিয়ে শুধু উপরে নিচে মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

“রাজকুমার এডি একটা ভুল করে ফেলেছিল। অল্প বয়স, অমন অনেকেই করে। বোঝেনি, সেই ভুলে শুধু রানি ভিক্টোরিয়া না, গোটা ইংরেজ সাম্রাজ্য বিপদে পড়তে পারে। ফ্রেঞ্চ আর জার্মানরা আমাদের দিকে তাক করে বসে আছে। তাদের গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের অলিতে গলিতে। একবার ভাবুন তো, যদি এই খবর প্রকাশ পায়, তবে কত বড়ো বিপদ হতে পারে! যে আন্তর্জাতিক চাপ আসবে, এই মুহূর্তে সেটা সামলানোর ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের নেই। তাও আমরা চালিয়ে নিচ্ছিলাম কোনওক্রমে, কিন্তু গত সপ্তাহে আমাদের সমিতির কাছে যে খবর এসেছে তা ভয়ানক। যতই অবাক লাগুক, খবরটা সত্যি।”

“কী খবর?”

“আমাদের অজান্তেই ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স আবার কেসটা রি-ওপেন করেছে। খুব সম্ভব ওরা অ্যালিস মার্গারেটকে খুঁজছে।” খুসখুসে একটা কাশি গলার কাছে পাক দিচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই। এবার দমকে দমকে কাশি শুরু হল প্রফেসরের। মুখে সাদা রুমাল চাপা দিলেন তিনি। সামনের ভদ্রলোক গেলাসের জল এগিয়ে দিলেন। দুই ঢোঁক জল খেয়ে শান্ত হলেন প্রফেসর।

“কিন্তু অ্যালিসের আসল সন্ধান তো...”

“আমাদের সমিতির বাইরে মোট সাতজন জানে। সেই পাঁচ মহিলা, আপনি আর মহারানি স্বয়ং।”

“কিন্তু সেই পাঁচজন মহিলাকে তো...”

“জানি জানি প্রফেসর। আপনার সাহায্য ছাড়া এই নিখুঁত পরিকল্পনায় সেই পাঁচজনকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হত না। সাধে কি আপনাকে অপরাধ জগতের নেপোলিয়ান বলে? এমনকি জ্যাক দ্য রিপার নামটাও তো আপনারই মাথা থেকে এসেছিল! আমরা কিছুই ভুলি না। স্বয়ং মহারানি আমাকে জনান্তিকে জানিয়েছেন তিনি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুশকিল হল আপনাকে আর সামান্য একটু পরিশ্রম করতে হবে প্রফেসর।”

“কীরকম?”

“এবার আপনাকে মরতে হবে। আমি দুঃখিত, এইভাবে আপনাকে অনুরোধ করতে হচ্ছে বলে। কিন্তু আমি নিরুপায়।”

স্তম্ভিত বললেও বুঝি কম বলা হয়। প্রফেসর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যে সমিতির জন্য তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধের পরিকল্পনা করেছেন, আজ তাঁরাই তাঁকে মারতে চাইছে? কিন্তু কেন?

আবার স্মিত হাসি ফুটে উঠল সামনের লোকটির মুখে।

“জীবন তো অনেক উপভোগ করলেন প্রফেসর। আর কত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনে কতটুকু কী হয় আমাদের জানা। আমার কাছে নিশ্চিত খবর আছে, আপনার বৈঠকখানা ঘরে নাকি একখানা চার হাজার পাউন্ড দামের জঁ ব্যাপ্তিস্তে গ্রুজের অরিজিনাল ছবি আছে! আমরা সব জানি। জেনেও এতদিন কিছু বলিনি, প্রয়োজন হয়নি বলে। এখন প্রয়োজন হয়েছে, তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি।”

“কী প্রয়োজন?”

“আপনি মাইক্রফট হোমসের নাম শুনেছেন?”

মাথা নাড়লেন প্রফেসর। শুনেছেন।

“এই লোকটি অদ্ভুত চরিত্রের। আমাদের গুপ্তচর বিভাগের প্রধান, আর তাই আমি কেন, স্বয়ং রানিও ওকে দমিয়ে রাখতে মাঝে মাঝে অসমর্থ হন। জ্যাক দ্য রিপারের কেসের সমাধানকে ও একেবারে নিজের মিশন ভেবে নিয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম পাঁচ মহিলার হত্যার পরে আর নতুন হত্যা না হলে একসময় সব ধামাচাপা পড়ে যাবে। ওইসব দেহোপজীবিনী মেয়েদের হত্যা নিয়ে কার মাথাব্যথা থাকতে পারে?”

“পাঁচজনের কেউ দেহোপজীবিনী ছিল না”, শুধরে দেবার চেষ্টা করলেন প্রফেসর, “সেটা আমরাই রটিয়েছিলাম।”

"সে যাই হোক। কিন্তু মাইক্রফট তলে তলে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। এমনকি আঁচ পেয়ে ওকে এই তদন্ত থেকে সরিয়ে দেবার পরও মাইক্রফট অন্য একজনকে দিয়ে তদন্ত চালিয়ে গেছে।"

"কাকে দিয়ে?"

"ওর নিজের ছোটো ভাই। যেহেতু সে প্রাইভেট কনসালটিং ডিটেকটিভ, তাই তার ওপরে সরকারের কোনও হাত নেই। সে স্বাধীনভাবে তদন্ত করে, আর ডায়োজেনিস ক্লাবে গিয়ে দাদাকে নিয়মিত খবর দেয়।"

"সে খবর আপনারা পেলেন কী করে?"

"ডায়োজেনিসেও আমাদের লোক আছে। সেটা বড়ো কথা না, বড়ো কথা হল, ওঁর ভাই খুঁজতে খুঁজতে এবার আপনার সন্ধান পেয়েছে। রিপারের কেসে আপনি যে একটা বড়ো খুঁটি, সে আন্দাজও সে করেছে। আপনি জানেন কি না জানি না, সে এখন হন্যে হয়ে আপনাকে খুঁজছে।"

"এখন আমার কর্তব্য?"

"গতকাল আমরা সমিতির বৈঠকে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেটা জানাতেই আপনাকে এখানে ডাকা। আগেই বলে দিই, এটা কিন্তু কোনও আলোচনা নয়। আমাদের সিদ্ধান্ত, আর সেটা আপনাকে মানতেই হবে। এ এমন প্রস্তাব, যা আপনি কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না।"

"কী সেই প্রস্তাব?" প্রফেসর বুঝতে পারছিলেন তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে। তিনি আবার জলের গেলাসের দিকে হাত বাড়ালেন। গেলাসটা সরিয়ে নিয়ে কঠিন গলায় লোকটা বলল, "মাইক্রফটের ভাইকে ওর প্যাঁচেই জব্দ করব। ও আপনার পিছু ধাওয়া করেছে। এমনকি আমি খুব ভুল না হলে আপনি এখানে ওর চালানো ছ্যাকরাগাড়িতেই এসেছেন। আমাদের প্রস্তাব, আপনি ওকে লোভ দেখিয়ে রাইখেনবার্গ জলপ্রপাতের ধারে নিয়ে যাবেন।"

"তারপর?"

"তারপর টুক করে লাফ মারবেন সেই বিপুল জলরাশির মধ্যে। খুব কষ্ট পাবেন না, এটুকু বলতে পারি।"

"আর সেই ডিটেকটিভ? তার কী হবে?"

"ওর ব্যবস্থা করবে আপনারই সহকারী কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান। সে চিন্তা আপনাকে করতে হবে না। আমরা খবরের কাগজে রটিয়ে দেব আপনাকে খুন করে ডিটেকটিভ ফেরার। তাতে এক কাজে দুই কাজ হবে। মাইক্রফটের শেষ সূত্র আপনি। আপনার সঙ্গেই রিপারের মামলা শেষ হবে। আর সেই ব্যাটা টিকটিকির একটা বদনাম রটিয়ে দেওয়া যাবে। কিংবা ডাক্তার ডয়েল, তাঁকেই বলব বিরাট করে একটা অবিচুয়ারি গল্প লিখে স্ট্যান্ডে প্রকাশ করতে। মরেও হিরো হয়ে যাবে ব্যাটা।"

"ডয়েল আপনাদের কথা শুনবে?"

"অবশ্যই। ও নিজেও ব্রাদারহুডের সদস্য। আমাদের কথাতেই ও নিজের প্রিয়তম বন্ধু অস্কার ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে সমকামিতা আর পায়ুমন্থনের অভিযোগে সাক্ষী দিয়েছিল। ভুলে গেছেন?"

"তাহলে তো সব ছকেই নিয়েছেন। কিন্তু আমি যদি রাজি না হই?"

"ভালো কথা। আপনি যদি রাজি না হন! এটাও আমরা গুরুত্ব সহকারে ভেবেছি। প্রথমেই আপনাকে বলে রাখি রিপারের কেসে আপনি শুধু প্ল্যান করেছেন, বাকি কাজে আপনার চেয়ে ভূতের গুরুত্ব বেশি ছিল। তাই ডাক্তার এলি হেনকিকে একেবারে অবহেলা করবেন না। দ্বিতীয়ত ডাক্তার হেনকিই জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন হল আপনার যক্ষ্মা ধরা পড়েছে। কাশির সঙ্গে রক্ত বার হয়। খুব বেশি হলে আর ছয় মাস। এবার ভেবে দেখুন, আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে আপনার দলের সবাইকে আমরা জেলে পুরব, আপনার সম্মাননীয় চাকরিটা যাবে, সবচেয়ে বড়ো কথা এই হলবর্ন থেকে বেরবার আগেই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হবে। বাকি জীবন নিউগেটের নোংরা জেলে কাটাবেন? না ডাক্তার

হেনকির হাতে আপনাকে ছেড়ে দেব? তিনি আবার নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করেন রোগীদের নিয়ে...”

“কিন্তু... কিন্তু আমার দলের দায়িত্ব?”

“সে চিন্তা করবেন না। কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরান বহু যুদ্ধের সফল সৈনিক। রানি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দও করেন। আপনার পরে তিনিই দলের দায়িত্ব পাবেন।”

এইটুকু বলে রিসবার্গের মদের গেলাসে আয়েশে চুমুক দিলেন ভদ্রলোক। খানিক সময় দিলেন প্রফেসরকে। তারপর একটু সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে এখন বলুন প্রফেসর, এই প্রস্তাবে আপনি রাজি কি না?”

আবার উপরে নিচে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। এরা তাঁকে এমনভাবে জড়িয়েছে, পরিত্রাণের উপায় নেই।

“এর মানে কী ধরব? হ্যাঁ?”

“হ্যাঁ”, প্রফেসরের গলা আরও ক্ষীণ।

“ভেরি গুড”, উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। এখন তাঁকে ওভারকোটে আরও বড়ো লাগছে। “ইংল্যান্ড আপনার এই বলিদান মনে রাখবে। রানিকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার কথা জানাব। আজ তাহলে আপনি বাড়ি যান। পরের পদক্ষেপের প্রতিটি ধাপ আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ধন্যবাদ প্রফেসর জেমস মরিয়াটি।” হাত এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক।

করমর্দন করে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রফেসর উত্তর দিলেন, “ধন্যবাদ প্রাইম মিনিস্টার লর্ড স্যালিসব্যারি।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ- ঘটনা-চক্র

অফিসার মুখার্জির কথা শুনে এক লহমায় বিশ্বাস করতে পারিনি। বলে কী লোকটা? এই সাতে নেই, পাঁচে নেই, আধবুড়ো, খোঁড়া নিশীথ দত্ত নাকি এত নৃশংস খুনটা করেছে। ধরলাম করেছে। তাহলে কাপড়ের দোকানের বিশ্বজিৎকে খুন করল কে? আমি নিশ্চিত, সেদিন নিশীথ দত্ত বাড়িতেই ছিলেন। কোথাও একটা কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে। এদিকে নিশীথ দত্তের মুখের দিকে চেয়ে আরও অবাক হয়ে গেলাম। বিস্ময়, আতঙ্ক, বেদনা- কোনও কিছুর চিহ্নমাত্র নেই তাঁর মুখে, বরং অদ্ভুত এক প্রশান্তি ছড়িয়ে আছে।

নিশীথ দত্ত হাসলেন। প্রথমে মুচকি হাসি। তারপর হাসির দমক বাড়তে বাড়তে তাঁর গোটা দেহকে গ্রাস করে ফেলল। এক অদ্ভুত উন্মাদ হাসির নেশায় ওই পিছমোড়া অবস্থাতেই দুলে দুলে হেসে চলেছেন তিনি। হাসতে হাসতে দুচোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। তবু হাসি থামছে না। আমরা দুজন স্থির তাকিয়ে তাঁর দিকে। গোটা ঘরে সেই হাসির আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনও আওয়াজ নেই। হাসির শেষে যেমন হয়, কাশতে শুরু করলেন নিশীথ দত্ত। আমি অফিসারের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই দৌড়ে গিয়ে খুলে দিলাম তাঁর হাতের বাঁধন। টেবিল থেকে নিয়ে এগিয়ে দিলাম বোতল ভরা জল। দুই এক ঢোঁক জল খেয়ে একটু শান্ত হলেন ভদ্রলোক।

অমিতাভ মুখার্জি অস্বস্তিতে। তিনি ঠিক এই রি-অ্যাকশান আশা করেননি। তিনিও দেখলাম কিচ্ছুটি না বলে অপেক্ষা করছেন, কখন নিশীথবাবু স্বাভাবিক হন। আরও মিনিট দু-এক পর চেয়ারে বসেই হাত পা ঝেড়ে নিশীথ দত্ত বললেন, "দেবাশিসকে খুন করব আমি? এও সম্ভব! আপনার বিন্দুমাত্র আইডিয়া আছে দেবাশিস কে ছিল? কী ছিল?"

“আইডিয়া একেবারে নেই তা না। অবশ্যই আছে কিছু। কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে পাথুরে প্রমাণ আছে। আপনি ছাড়া অন্য কেউ দেবাশিস গুহকে খুন করতেই পারেন না।”

“তাই বুঝি? কী সেই প্রমাণ?”

অফিসার এবার সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি তো এই বাড়িতে বহুকাল আছ। এঁর কাজকম্মো নিয়ে জানতে না? দেবাশিস গুহ কোনও দিন এঁর কথা বলেননি?”

নিজেকে ভয়ানক বোকা বলে মনে হচ্ছিল। এমনকি এই ঝামেলা চুকেবুকে গেলে ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিসে পার্মানেন্ট তালা মেরে চেনা অচেনা সব আইটি কোম্পানিতে সিভি জমা দেব, সেটাও ঠিক করে ফেললাম মনে মনে। যতবারই মনে হয় সমাধানের সামনে এসেছি, গোটা ব্যাপারস্যাপার কেমন জট পাকিয়ে যায়। চেনা মানুষগুলোকেও তেমনভাবে চেনা যায় না। এই যেমন এখন হচ্ছে।

“তুমি কিছু জানতে না তুর্বসু?” এবার ভদ্রলোক সরাসরি আমায় প্রশ্ন করলেন।

আমি থতোমতো। আমি দেবাশিসদাকে চিনতাম। মানে ভাবতাম যে চিনি। কিন্তু তাঁর খুনের পরে যে সমস্ত অদ্ভুত বিষয় উঠে আসছে, তাতে চিনতাম না বলাই বরং সমীচীন হবে।

পাশাপাশি মাথা নাড়লাম, “কিচ্ছু জানতাম না আমি।”

এবার নিশীথ দত্তের মুখে অদ্ভুত এক বেদনা ফুটে উঠল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে একটা মানুষের মধ্যে এতটা পরিবর্তন আসতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খেয়াল করে দেখলাম তাঁর দুচোখে জল। আমার দিকে চেয়ে বললেন, “তোমার বাবা বিরূপাক্ষকে আমি কথা দিয়েছিলাম, এই জীবনে তোমায় কিচ্ছু জানাব না। যে অভিশাপ আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি এতকাল ধরে, তা আমাদের জেনারেশনের সঙ্গেই শেষ হবে, এটাই ঠিক ছিল। হয়তো তা হতও। কিন্তু দেবাশিস... ও কারও কথা শুনলে তো!”

অফিসার মুখার্জি এবার একটু বিরক্ত হচ্ছিলেন। বেশ কড়াভাবেই বললেন, "এতক্ষণ তো মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলেন। এবার যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন। তারপর থানায় যেতে হবে। আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। আমি ফোর্সকে ফোন করেছি। ফোর্স আসছে। এই ফাঁকে নিজের সপক্ষে সত্যিমিথ্যে যা বলার বলে ফেলুন।"

"নিজের সপক্ষে আমার কিচ্ছু বলার নেই। প্রমাণ যখন পেয়েছেন, তদন্ত করবেন। সে আপনাদের কাজ। তদন্তে আমি সহায়তাও করব। কিন্তু কিছু জিনিস বলে যাই, যেটা তুর্বসুর জানা উচিত। হয়তো আগেই বলতাম, কিন্তু বিরূপাক্ষের মুখে চেয়ে..."

"কী কথা?" আমিই প্রশ্ন করলাম।

"তুমি তো জানো, তোমার প্রপিতামহ তারিণীচরণ রায় ছিলেন কলকাতার প্রথম বাঙালি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তাঁর অফিসেই এখন তুমি বসো। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে কলকাতার বুকে ভয়ানক কোনও অপরাধের ষড়যন্ত্র হয়েছিল। অপরাধের ধরন ঠিক কী, তা একমাত্র তোমার পরিবার ছাড়া কেউ জানে না। তোমার প্রপিতামহ তাঁর ডায়রির পাতায় সে খবর বিস্তারিত লিখে গেছিলেন। সঙ্গে এটাও লিখেছিলেন, তোমাদের পরিবার বাদে কেউ যেন সেই ঘটনা না জানতে পারে।"

"এই গোপনীয়তার কারণ?"

"বিস্তারিত আমাকে বিরূপাক্ষও জানায়নি। তবে এটুকু বলেছিল, সব ইতিহাসে একটা ভূত থাকে। সেই ভূত কখনও জেগে থাকে, কখনও ঘুমায়। এখন সে ভূত ঘুমাচ্ছে। ভুল লোকের হাতে পড়লে ভূত জাগতে পারে। আর তাহলেই সর্বনাশ হবে।"

"আপনার সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক কীভাবে?"

"তোমার প্রপিতামহ ছিলেন কলকাতার প্রথম ম্যাসনিক লজের সদস্য। সত্যি বলতে সেসময় তিনি বাদে অন্য কোনও হিন্দু এই লজের সদস্য ছিল না।

বাকি সবাই সাহেব, আধা সাহেব বা দেশীয় খ্রিস্টান। সেই থেকে তোমাদের পরিবারের সঙ্গে ম্যাসনদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এর অন্য একটা কারণও আছে। তোমাদের সেই পারিবারিক গোপন তথ্য। যেটা প্রকাশ পেলে ম্যাসনিক ব্রাদারহুড ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।"

"সেটা কী?"

"কী করে বলব? গোপন জিনিসের মজাটাই এখানে। সেটা গোপন। আমাদের ব্রাদারহুডে এটা আমরা সবাই মেন্টেন করি। করতাম। যতদিন না দেবাশিস যুক্ত হল।"

"দেবাশিসদার সঙ্গে আপনাদের পরিচয়?"

"ম্যাসনিক ব্রাদারদের নানারকম নিয়মকানুনের বেড়াজাল থাকে। সব কাজ ইচ্ছেমতো করা যায় না। তাই আমরা একটা এনজিও খুলেছিলাম। নাম নীবার। ম্যাসনিক ব্রাদাররাই সেটা চালাতাম। সদস্য অনেকেই ছিল। সবাই সব কিছু জানত না। সবাই ব্রাদারহুডের ছিলও না। একদিন সেখানেই দেবাশিস বলল হিজড়া আর বেশ্যাদের নিয়ে কাজ করতে চায়। উৎসাহী ছেলে। পড়াশুনো করা। আমরাও রাজি হলাম। তখন বুঝিনি...." বলে একটু থামলেন নিশীথ দত্ত।

আমরা কেউ কিছু বলছিলাম না। অপেক্ষায় ছিলাম উনি কী বলেন।

"দেবাশিস ছুঁচ হয়ে ঢুকেছিল। কিছুদিন পরেই বোঝা গেল ওর হাত অনেক দূর অবধি ছড়ানো। লন্ডন, পারি, এডিনবরা, এমনকি আমাদের এলাহাবাদের ফ্রিম্যাসন হাউসদের সঙ্গে ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। প্রথমে আমরা খুশিই হয়েছিলাম। এমন একটা উদ্যোগী ছেলেই তো চাই! কিন্তু যতদিন যেতে লাগল, বুঝলাম ওর আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু।"

"সেটা কী?"

"ও কিছু একটার সন্ধানে ছিল। খুব সম্ভবত সেই গোপন তথ্য, যা তোমাদের পরিবারে লুকোনো আছে। তোমাদের বাড়িটা এখন চুঁচুড়ার যেখানে, সেখানে আজ থেকে চারশো বছর আগে কী ছিল জানো?"

মাথা নাড়লাম। জানি না।

“হুগলি জেলার প্রথম ফ্রিম্যাসন লজ। ডাচদের স্থাপন করা। নাম ছিল কনকর্ডিয়া। পরে ডাচরা চলে যায়। লজ উঠে যায়। তারিণীর পাঠানো টাকায় এক ওলন্দাজ সাহেবের থেকে বাড়িটা কিনে নেন তাঁর বাবা। এমনিতে হয়তো হত না, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট রডনি সাহেব খুব সাহায্য করেছিলেন। এ সবই তোমার বাবার থেকে শোনা।”

আমিও শুনেছি। শুধু কনকর্ডিয়া নামের মানেটা বুঝতে পারিনি।

“পরে তারিণী সপরিবারে চুঁচুড়া গিয়ে ওঠে। তারপর বহুকাল তোমাদের খোঁজ কেউ জানত না। আমি নীবার তৈরির সময় পুরোনো দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে তোমাদের ঠিকানা উদ্ধার করি। খবর পাই তোমার জেঠু ওই বাড়িতেই থাকেন। তিনিই তোমার বাবার কথা আমায় জানান। বলেন পারিবারিক ইতিহাসে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। ওসব যা দেখার তোমার বাবা দেখেন। তখন তোমরা অন্য বাড়িতে ভাড়া থাকতে। জানি না তোমার মনে আছে কি না।“

“আছে। আহিরীটোলায়। গঙ্গার ধারে।”

“এগজ্যাক্টলি। তাহলে এটাও নিশ্চয়ই মনে আছে সেই বাড়ি কেন ছাড়তে হল?”

“ওই এলাকা ভালো ছিল না। একদিন অফিসফেরতা লোডশেডিং-এ একদল গুন্ডা বাবার উপরে চড়াও হয়। বাবার মানিব্যাগ ছিনতাই করে।“

“আচ্ছা!” সামান্য হাসি ফুটল নিশীথ বাবুর মুখে। “তোমাদের তাই বলেছিল? সত্যিটা অন্য। চুঁচুড়া থেকে কলকাতা আসার সময় বিরূপাক্ষ দুটো ডায়রি গোপনে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।”

“তারিণীর ডায়রি?”

“একদমই তাই। লুকিয়ে রেখে দেয় আমাদের নীবারের অফিসে। নিজের পার্সোনাল লকারে। ভেবেছিল সেফ থাকবে। ভুল ভেবেছিল। একদিন রাতে সেই লকার ভাঙার চেষ্টা হল। চোর প্রায় সফল হয়েই গেছিল, শেষ মুহূর্তে দারোয়ান

টের পাওয়ায় চোর পালায়। শুধু বিরূপাক্ষই নয়, আমিও নিশ্চিত, চোর জানত এই লকারে যা আছে তার গুরুত্ব কী। লকারে ওই দুটো ভাষার ছাড়া আর কিচ্ছু ছিল না।”

“তারপর?” এবার প্রশ্ন করলেন অফিসার মুখার্জি। তিনি যে এই ঘরে আছেন, তা ভুলেই গেছিলাম।

“আমিই বিরূপাক্ষকে বলি ডায়রি সরিয়ে ফেলতে। পুরোনো বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে উঠে আসতে। বিরূপাক্ষ তাই করে। কিন্তু সেদিন রাতেই ওর উপরে হামলা হয়। যারা হামলা করেছিল তারা ভেবেছিল ডায়রি ওর কাছে আছে।”

“কিন্তু ছিল না?”

“না। বিরূপাক্ষ প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। ডায়রি এমন জায়গায় সরিয়ে দেয়, যেখানে চাইলেও কোনও ফ্রিম্যাসন ঢুকতেই পারবে না।”

“সেটা কোথায়?”

“১৭৩৮ সাল অবধি বহু ম্যাসন ব্রাদাররা ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তারপরেই আচমকা একদিন পোপ ফ্রিম্যাসনদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এমনকি যদি চার্চের কোনও ক্যাথলিককে ম্যাসনদের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা যেত তবে *Latae sententiae* আইনে চার্চ তাঁকে বহিষ্কার করত। ফলে একটা জায়গা যা এখনও ম্যাসনদের নাগালের বাইরে, তা হল ক্যাথলিক চার্চ। চার্চেও অনেকে আছেন, যাঁরা আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু কেউই সরাসরি ব্রাদারহুডে যোগ দিতে পারেন না।”

“তার মানে, বাবা সেই ডায়রি কোনও ক্যাথলিক চার্চে লুকিয়ে রেখেছেন?”

“কোনও ক্যাথলিক চার্চ না। বাংলার প্রাচীনতম ক্যাথলিক গির্জাদের মধ্যে একেবারে সেরা যেটা, সেখানে।”

“ব্যান্ডেল চার্চ?”

“ইয়েস! ব্যাসিলিকা অফ দি হোলি রোসারি।”

লজ্জায় আমার দেওয়ালে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সব খবর ছিল দেবাশিসদার কাছে। শুধু আমিই কিছু জানতাম না। শুধুমাত্র আমার রিঅ্যাকশন দেখার জন্যেই একদম প্রথম দিন ব্যাসিলিকা অফ দি হোলি রোজারির নাম করেছিলেন। হয়তো দেখতে চাইছিলেন আমি কিছু জানি কি না। আর আমি ভাবছিলাম উনি আমায় ইমপ্রেস করতে এসব বলছেন!

"তবে কীভাবে আর কোথায় সে ডায়রি লুকানো, তা বিরূপাক্ষ আমায় বলেনি। আমিও জানতে চাইনি।"

আমি আর কোনও কথা বলার অবস্থায় ছিলাম না। কথা বললেন অফিসার মুখার্জিই।

"সেসব ইতিহাস তো হল, কিন্তু গত উনিশে জুন, রাতের বেলা আপনি দেবাশিস গুহকে আচমকা খুন করতে গেলেন কেন? সেটা বলবেন কি?"

আমার অবাক মুখের দিকে চেয়ে অফিসার মোবাইল এগিয়ে দিলেন।

"এই দ্যাখো। প্রমাণ ছাড়া কথা বলছি না। দেবাশিস গুহর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে গলির মুখে একটা গুদাম আছে। খেয়াল করেছ?"

"হ্যাঁ। সেই তুলো-টুলো কীসব যেন পাওয়া যায়।"

"সেই গুদামের বাইরে একটা সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। শুরুর দিন থেকেই আমরা চেষ্টা চালাচ্ছিলাম ফুটেজের। কিন্তু মালিক নাকি সপরিবারে বিদেশ ঘুরতে গেছে। কন্ট্যাক্ট করা যাচ্ছিল না। আজ চুঁচুড়া গোরস্থানে তোমার সঙ্গে কথা বলার পরেই অফিস থেকে কল এল। সেই মালিক ফিরেছে। ফুটেজ জোগাড় করা গেছে। ওরা আমায় হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাল। এবার নিজেই দ্যাখো।"

দেখলাম একটা ভিডিও ক্লিপ। তলায় ডিজিটাল সময় আর তারিখ।

১৯ জুন, রাত **১১.৫৫** । একটা কালো লম্বাটে গাড়ি এসে দাঁড়াল গলির মুখে। গাড়ির নম্বর প্লেট পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ছবি বেশ ঝাপসা। কিন্তু এই গাড়ি আমার চেনা। নিচের গ্যারাজে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে। আজ নেই। উর্ণাদের নিয়ে বেরিয়েছে। গাড়ি থামতে সেখান থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। মুখ দেখা

যাচ্ছে না। পিছন থেকে মনে হল ইনি নিশীথ দত্ত। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। সামান্য ঘুড়িয়ে চলেন। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে সোজা চলে গেলেন দেবাশিসদার বাড়ির দিকে।

"এবার একটু টেনে দিচ্ছি", বলে মুখার্জি ভিডিওটা এগিয়ে দিলেন খানিকটা। ২০ জুন, ১.০৫ । আবার ফিরে এসেছেন নিশীথ বাবু। তবে এবার চালচলনে বেশ একটা সন্ত্রস্ত ভাব। দ্রুতগতিতে গাড়িতে ঢুকেই গাড়ি ঘুরিয়ে বেরিয়ে গেলেন।"

"দেখলে?"

"আর কেউ আসেনি সেদিন?"

"রাত দশটার পর অন্তত আসেনি। আর খুন হয়েছে রাত এগারোটার পরে। অবশ্য এখানে একটা সমস্যা আছে। দোকানের ক্যামেরাটা খারাপ হয়ে গেছিল। লোক সারিয়ে দিয়ে যখন যায়, তখন সন্ধে সাড়ে সাতটা। তাও ছবি খুব একটা পরিষ্কার না। ফলে এর আগে কী হয়েছে বলা মুশকিল। এমনকি দেবাশিসদা কখন ঢুকেছেন সেটাও আমরা জানি না।"

"কাজের লোক ঘরে ঢুকল কেমন করে?"

"তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, যাতে দেবাশিসদা না থাকলেও সে কাজ করে চলে যেতে পারে। সে তো পরের দিন সকালে এসেছিল।"

"তাহলে সেদিন রাতে ঠিক কী হয়েছিল?"

অদ্ভুত উদাসীনভাবে অফিসার বললেন, "এই সময়ের মধ্যে শুধু ওঁকেই ওই বাড়ির দিকে যেতে দেখা গেছে। সুতরাং উনিই জানেন।"

আবার হাসলেন নিশীথ দত্ত, "অফিসার, আর ইউ শিওর? আমি যে দেবাশিসের বাড়িতেই গেছি তার প্রমাণ কোথায়? এই ঝাপসা ছবি দিয়ে আমাকে ধরে রাখতে পারবেন তো?"

নিচে কতগুলো গাড়ি থামার আওয়াজ পেলাম। পুলিশ ফোর্স এল বোধহয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— মহাপতন

৪ জুন, ১৮৯১, রাইখেনবার্গ জলপ্রপাত, সুইজারল্যান্ড

"গুড আফটারনুন, ডিটেকটিভ।"

শুনে গোয়েন্দা ভদ্রলোকটি সোজা সামনের দিকে তাকালেন। তাঁর দুই হাত পিছনে, দুই পা দুপাশে ছড়িয়ে রাখা। যেন কোনও অদৃশ্য কমান্ডারের নির্দেশে এখন বিশ্রামে আছেন। আদেশ পেলেই চকিতে অ্যাটেনশান হয়ে যাবেন। যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার একদিকে খাড়া পাথুরে পাহাড়, অন্যদিকে অতল খাদ। সামনে ভিজে, পিচ্ছিল সরু রাস্তা। শতাব্দীপ্রাচীন শৈবালদাম ঘিরে রয়েছে চারদিকে। বিন্দু বিন্দু জলকণায় গোটা পথ জুড়ে এক অদ্ভুত জলজ সোঁদা গন্ধ। একটু এগোলে এই পথই সোজা চলে গেছে রাইখেনবার্গের বিরাট প্রপাতের দিকে। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে জলের একটানা শব্দ, মাঝে মাঝে গাছের পাতার মর্মর। কিন্তু কোথাও কোনও পাখি ডাকছে না আজ।

"বড্ড মনখারাপ করা জায়গা", বিষন্ন, উৎকণ্ঠিত এক হাসি হেসে বললেন সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অধ্যাপক। তাঁর প্রায় হাড় জিরজিরে রোগা দেহখানা আর উড়ন্ত ফ্রককোট মিলেমিশে বিরাট এক বাদুড়ের মতো দেখাচ্ছে। গোটা পথ জুড়ে তবুও তিনিই দাঁড়িয়ে। একা। যেন কোন অশুভ ভবিতব্যের আশায়।

"এত জায়গা থাকতে এখানে কেন?" অবশেষে মুখ খুললেন ডিটেকটিভ।

"লন্ডনে কোনওরকম আলোচনার পরিস্থিতি নেই। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার উপরে নজর রাখা হচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা।"

"কার গুপ্তচর?"

"সেটা আপনি খুব ভালো করেই জানেন।"

"আলেকজান্দ্রিনার?"

"সে কী মিস্টার! এ নাম আপনি মুখে নিলেন কেমন করে? আমি তো ভাবতেও ..."

“কাজের কথায় আসুন প্রফেসর”, এবার একটু রুক্ষভাবেই বললেন ডিটেকটিভ। “অ্যালিস মার্গারেট কোথায়?”

“কোথায় মানে? এই মুহূর্তে কোথায়?”

“হ্যাঁ।”

“আমার জানা নেই। তবে যে জানে, আমি তার খবর দিতে পারি।”

“কে সে?”

“এখানে দাঁড়িয়েই সব আলোচনা শেষ করবেন ডিটেকটিভ মশাই? চলুন না, একটু এগিয়ে রাইখেনবার্গের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে আলোচনা করা যাক। আমার একটা প্রস্তাব আছে আপনার কাছে। সেটা বলতেই মূলত আপনাকে এখানে ডাকা।”

ডিটেকটিভ এমনই কিছু একটা আশা করছিলেন। তিনিও গররাজি হলেন না। শুধু বললেন, “আমি আমার এক বন্ধুর জন্য ছোটো একটা চিঠি লিখে যেতে পারি?”

“অবশ্যই, তবে দেখবেন যেন ছোটো হয়। আমার হাতে সময়বেশি নেই।”

পকেট নোটবুক থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে ডিটেকটিভ লিখলেন,

“প্রিয় দাদা মাইক্রফট,

এই চিঠি যদি তোমার হাতে পৌঁছায়, তবে তার একটাই মানে। আমি আর বেঁচে নেই। তবে শান্তি এটুকুই, অপরাধ জগতের নেপোলিয়ান জেমস মরিয়াটি আর তার দলবলকে শেষ করে তবেই আমি শেষ হয়েছি। কাল থেকে ইংল্যান্ড নতুন করে বাঁচতে পারবে, যেখানে মরিয়াটি বা তার কালো ছায়া সমাজে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারবে না।

আমার দেহ খুঁজে না পেলে এই চিঠিকেই আমার এপিটাফ বলে ধরে নিয়ো।

তোমার ছোটো ভাই”

চিঠি লিখে পাতাটা মুড়ে নিজের রুপোর সিগারেট কেসের তলায় চাপা দিয়ে রেখে দিলেন ডিটেকটিভ। তারপর প্রফেসরের দিকে তাকিয়ে একপেশে একটা হাসি হেসে বললেন, "বলুন, কোথায় যেতে হবে।"

সরু পাকদণ্ডির মতো পথ। পা হড়কে যাচ্ছে থেকে থেকে। কিছুটা একসঙ্গে গিয়ে আচমকা পিছন ফিরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। ডিটেকটিভ অবাক হয়ে খেয়াল করলেন, প্রফেসরের দুচোখের কোণে জল। ঠোঁট দুটো অল্প কাঁপছে। এই ব্যাপারটা একেবারেই ডিটেকটিভের অনুমানের বাইরে ছিল। এমন তো হবার কথা না!

"কী হয়েছে প্রফেসর?"

"আমি বাঁচতে চাই মিস্টার হোমস। আমি চাই না এই সাক্ষাৎকার আমাদের শেষ সাক্ষাৎকার হোক।"

"বলুন, আমি শুনছি।"

"ভয়ানক এক খেলা চলছে। তাতে আমরা নিতান্ত বোড়ে মাত্র। রাজা উজির আমাদের নিয়ে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে, দরকারে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমার যক্ষ্মা হয়েছে। জানি বেশিদিন বাঁচব না। তবু আজ আমাকে এখানে ডেকে আনা হল কেন? আপনার মোকাবিলা করতে না, আপনাকে বুদ্ধির খেলায় হারাতে না, শুধু... শুধু একটা টোপ হিসেবে। আমাকে বাধ্য করা হচ্ছে আত্মহত্যা করতে। এতদিন ব্রাদারহুডের জন্য এত কিছু করে এই অসম্মান, এই হেনস্থা কি আমার প্রাপ্য ছিল? বলুন তো?"

"আপনি ব্রাদারহুডের সদস্য?"

"না। ভাড়াটে গুন্ডা বলতে পারেন, কিংবা কনসালটেন্ট ক্রিমিনাল।"

"জাবুলনদের বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?"

এই নামটা শুনেই প্রফেসরের চোখমুখে ভয়ংকর এক আতঙ্কের ছায়া দেখলেন ডিটেকটিভ। পৃথিবীর সেরা অপরাধীও তবে কাউকে ভয় পায়?

সেটা বলতেই বারবার জোরে জোরে মাথা নাড়লেন প্রফেসর।



“আপনি কিচ্ছু জানেন না মিস্টার। কিচ্ছু না। এদের হাতে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো আছে। আর রাষ্ট্র যদি অপরাধপ্রবণ হয়, তবে তার সঙ্গে কে মোকাবিলা করতে পারে?”

“আপনি কার কথা বলছেন?”

“সব বলব। আমি যা জানি সব। তবে তার আগে আমার সম্পূর্ণ ইমিউনিটি চাই। আপনার থেকে না। আরও বড়ো কোনও অথরিটির থেকে। আমি জানি আপনার দাদা মিস্টার মাইক্রফট ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের সর্বেসর্বা। এক কথায় সে নিজেই ব্রিটিশ সরকার। সরকারের সমান্তরালে তার বাহিনী কাজ চালায়। আমি যা জানি, সব খুলে বলার বদলে আপনাকে আমার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। আমাকে নতুন নামে নতুন পরিচয়ে অন্য দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাজি?”

হাত বাড়িয়ে দিলেন ডিটেকটিভ, “রাজি। আমি অবশ্যই দাদাকে বলব। কিন্তু একটা প্রশ্নের জবাব এখুনি চাই। অ্যালিস মার্গারেটের খবর কে জানে?”

“বেডলামের এক ডাক্তার। রিচার্ড হ্যালিডে।”

“কোন হ্যালিডে? ডাক্তার হেনকির শিষ্য?”

“একেবারেই ঠিক। খুব সম্ভবত ভারতবর্ষে...”

কথাটা শেষ করতে পারলেন না প্রফেসর। বিরাট এক পাথরের চাঁই ডিটেকটিভের ঠিক কান ঘেঁষে রাস্তায় আঘাত খেয়ে প্রফেসরকে নিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল সেই ভয়ানক গহ্বরের মধ্যে। প্রফেসর আর্তনাদের সময়টুকু পেলেন না। কয়েক সেকেন্ড বাদেই আরও একটা। তারপর আরও এক। এ জিনিস আর যাই হোক, দুর্ঘটনা নয়। ডিটেকটিভ জানেন প্রথমবার সাক্ষাৎ, দ্বিতীয়বার দৈবাৎ হতে পারে, কিন্তু তৃতীয়বার তা সংঘাত। কেউ বা কারা সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে সংঘাতে নেমেছে। কে হতে পারে? ভাবতে ভাবতেই উপরের দিকে তাকালেন ডিটেকটিভ। দেখতে পেলেন ভয়াবহ এক মুখ। মরিয়ার্টির সেকেন্ড ইন কমান্ড, যার নীল দুই চোখে প্রতিশোধের আগুন।

ওহহ! মরিয়ার্টি তবে একা আসেননি! তাঁর পিছনে তাঁকেই খুন করতে তাঁরই ডান হাত কর্নেল সেবাস্টিয়ান মোরানকে লাগানো হয়েছে! কিন্তু এইসবের পিছনে তবে কি...

ভাবার আগেই এবার দৈত্যাকার এক পাথর মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্য দিকভ্রষ্ট হল। ডিটেকটিভ কোনওমতে পাহাড়ের একটা খাঁজ বেয়ে উঠতে লাগলেন। অতি কষ্টে। বুঝতে পারলেন উপরের লোকটা দেখতে চেষ্টা করছে তার পাথর অভীষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধ করল কি না। প্রতি মুহূর্তে খাদে তলিয়ে যাবার ভয়। উপর থেকে পাথর এসে পড়ার আতঙ্ক। প্রতিবার জলজ উদ্ভিদ, শ্যাওলাধরা পাথরে হাত পিছলে গেলেই মনে হচ্ছে এই বুঝি সব শেষ। অদ্ভুত এক ঘোর লাগল ডিটেকটিভের মনে। যেন তিনি শুনতে পেলেন রাইখেনবার্গের তলার সেই মহাপঙ্ক থেকে মরিয়াটি তাঁর নাম ধরে ডাকছে।

অবশেষে এমন একটা চ্যাটালো পাথরের ফাঁকে ছোট্ট গুহা পাওয়া গেল, যেখানে লুকিয়ে থাকা যায়। আরও কয়েকটা পাথর এসে পড়ল রাস্তায়। গড়িয়ে গেল খাদে। পাহাড়ের উপরের হত্যাকারী বুঝি ভাবল সে ডিটেকটিভকে অবশেষে সাবাড় করে দিয়েছে। এক অর্থে ভালোই। মনে মনে হাসলেন ডিটেকটিভ। গোটা পৃথিবীর কাছে এখন তিনি মৃত। মাইক্রফটকে বলতে হবে ভালো করে যেন তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে দেয়। ওই সিগারের কেসে ঢাকা চিঠিই হবে তাঁর মৃত্যুর প্রমাণপত্র। স্ট্র্যান্ডে যেন আলাদা অবিচুয়ারি কলাম হয়। না মরলে জাবুলনরা তাঁর পিছু ছাড়বে না।

আরও খানিক বাদে যখন বিকেলের রোদ চলে এসেছে, পকেট থেকে একটা সিগার বার করে সাবধানে ধরাতে গেলেন ডিটেকটিভ। জোলো হাওয়ায় বারুদের কাঠিগুলো ভিজে একশা। অগত্যা তামাকের আশা ছেড়ে আধশোয়া হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি। যা করার খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। খেলা শুরু হয়ে গেছে। মারা যাবার আগে মরিয়াটি অদ্ভুত ভালো একটা প্ল্যান দিয়ে গেছেন। যদিও তাঁর নিজের জন্য, কিন্তু ডিটেকটিভ সেটাকেই এবার কাজে লাগাবেন।

প্রথমেই লাগবে একটা ছদ্মনাম আর ছদ্মপরিচয়। তারপর পালিয়ে যেতে হবে এমন এক দেশে যেখানে জাবুলনরা তাঁকে ধরতে পারবে না। কিন্তু অ্যালিস? তার কী হবে? ভাবতেই বিদ্যুৎচমকের মতো একটা আইডিয়া এল মাথায়। এতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। মরিয়ার্টি খাদে পড়ার ঠিক আগে কী বলেছিল, এখনও কানে ভাসছে ডিটেকটিভের। দাদাকে বলতে হবে সব ব্যবস্থা করতে।

এবার ছদ্মনাম নিয়ে ভাবা যাক বরং। কী নাম.... কী নাম... ডিটেকটিভ ভাবতে থাকেন... তাঁর বাবার নাম ছিল সাইগার হোমস। সেখান থেকে যদি কিছু...

সপ্তম পরিচ্ছেদ- সম্পর্ক

সেদিন রাতে আমরা কেউ ঘুমাইনি।

পুলিশ ফোর্স আসার খানিক বাদে উর্ণারাও চলে এসেছিল শপিং সেরে। কেমন একটা অদ্ভুত হতভম্ব দশা। উর্ণার মা, কাকিমা, একটানা কাঁদছিলেন আর মাঝে মাঝেই বলছিলেন, "আমার কপাল, আমার কপাল।" অদ্ভুতভাবে উর্ণার বাবা অনেক বেশি শক্ত, অবিচল। উনি অমিতাভ মুখার্জির থেকে অনুমতি নিয়ে ওঁর উকিলকে ফোন করলেন। শান্ত গলায় তাঁকে সোজা থানায় গিয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন। তারপর স্ত্রী-কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, "চিন্তা কোরো না। আমাকে ওরা ধরে রাখতে পারবে না। আমি কিছু করিনি।" আমি সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম। উনিই বারণ করলেন।

"তুমি বরং বাড়িতে থাকো। ওদের খেয়াল রাখো। এই অবস্থায় বাড়িতে একজন পুরুষমানুষের খুব দরকার।"

উর্ণা বা কাকিমা কেউই রাতে খাবার মতো অবস্থায় ছিল না। একের পর এক প্রশ্ন জাগছিল আমার মনে। কিন্তু সেসবের সময় এখন না। বাইরে

দোকানপাট বন্ধ। ঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে ম্যাগি বানিয়ে খেয়ে নিলাম। উপরের তলা থেকে মৃদু কথার আওয়াজ আসছে। ঊর্ণা আর ওর মায়ের। বিছানায় শুয়ে আমি ভাবতে শুরু করলাম। যত সময় যাচ্ছে গোটা ব্যাপারটায় তত জট পাকাচ্ছে। টেবিল ল্যাম্পের তলাতেই সেই খাতাটা রাখা, যাতে কিছুদিন আগে পয়েন্ট ধরে ধরে দশটা প্রশ্নের এক লিস্ট বানিয়েছিলাম। কিছু প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর পেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হল তার চেয়েও কঠিন কিছু প্রশ্ন এই কয়েকদিনে সামনে এসেছে। তড়াক করে উঠে আবার সেই খাতা খুলে বসলাম।

দেবাশিস গুহ খুব সম্ভবত খুন হলেন ভূতের জন্য। আততায়ী হয়তো সন্দেহ করেছিল ভূতের ফর্মুলা তাঁর কাছেই আছে। কিন্তু ছিল না। তবে কার কাছে থাকতে পারে? চমকে উঠলাম। আমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। অন্য কালিতে লেখা, "তুর্বসু জানে।" মানে দেবাশিসদা মরার আগে আততায়ীকে আমার নাম বলে গেছেন। শুধু বলেননি, লিখে গেছেন। কিন্তু দেবাশিসদা সেটা জানলেন কীভাবে? একটাই উত্তর। প্রিয়নাথের কাগজের মধ্যে নিশ্চয়ই উল্লেখ ছিল ভূতের ফর্মুলার কথা, পো-র বইয়ের কথা, ডিরেক্টরের কথা। এই ডিরেক্টর কী, সেটা খুব সম্ভবত দেবাশিসদাও জানতেন না (প্রিয়নাথ তাঁর শেষ হাড়ে স্পষ্ট করে লেখেননি হয়তো), তাই অমিতাভ মুখার্জিকেও বলতে পারেননি। দেবাশিসদা মারা গেলে অমিতাভবাবু ডিরেক্টরের খোঁজে হন্যে হয়ে ওঠেন। আমায় বলেন তাঁর পিছনে লোক লেগেছে, যাদের ধারণা গণপতির ভূতের বাক্সের সন্ধান তাঁর কাছে আছে। এরা কারা? আমাকে অত রাতে হোয়াটসঅ্যাপ পাঠাল কে? এবং কেন? এখন যা মনে হচ্ছে আততায়ীই ওটা পাঠিয়েছে। দেবাশিসদা না। আর এখানেই কোনও লজিক কাজ করছে না।

এবার আসি বিশ্বজিতের কথায়। প্রায় একই সময়ে তিনটে ঘটনা ঘটল। কাছে দেবাশিসদা চিঠি দিলেন, দেবাশিসদা খুন হবার ঠিক পরের দিন বিশ্বজিতের কাছে কেউ এল, যাতে সে ভয় পেয়ে দোকান থেকে পালাল, আর নিজেও খুন হল। তাঁর মুখে অণ্ডকোশ পুরে দেওয়া, পেটে ছুরি দিয়ে চিরে এক

ত্রিভুজ আর ইংরাজিতে JAHBOULON লেখা। অনেকটা একইভাবে খুন হয়েছিলেন একশো বছর আগের সেই নাট্যকার শৈলচরণ। আর রামানুজ? সেও কি সব সত্যি বলছে? খিদিরপুরের ঘটনার পরপরই তার সঙ্গে বিশ্বজিতের দেখা। নেহাতই কাকতালীয়? এই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে মুখার্জিকে নেওয়া যাবে না। যেতে হবে একা।

বাকি থাকল নাটকের আর দুই প্রধান চরিত্র। নিশীথ দত্ত আর অমিতাভ মুখার্জি। নিশীথ দত্ত গভীর জলের মাছ। বাইরে নীবার নামের সাধাসিধে এক এনজিও-র সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এঁদের আসল উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য বলতেই প্যাডে ছাপানো সেই প্রাচীন চিনা চিহ্নের কথা মনে পড়ল। প্যাডের পাতাটা এখনও আমার টেবিলেই রাখা। এ চিহ্ন ওখানে কেন? আর ল্যাটিনেও চারটে শব্দ লেখা। *Dissimulo, Fraternitati, Unio. Oblitus.* কী মনে হল, গুগলে সার্চ করতেই মানেগুলো পেয়ে গেলাম। চারটেই ল্যাটিন শব্দ। গোপনীয়তা, ভ্রাতৃত্ব, একতা, বিস্মৃতি। সঙ্গে টীকায় এটাও লেখা আছে, এই বিস্মৃতি মানে ভুলে যাওয়া না। চোখের আড়ালে থাকা। আরও একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখতেই যা পেলাম তাতে চোখ কপালে উঠল। এর প্রতিটাই ছিল আদি ম্যাসনদের উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতকে ম্যাসনিক লজের উদ্দেশ্য নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক বাধে। ম্যাসনদের অনেকে এই বিস্মৃতির বিপক্ষে ছিলেন। অন্য দল আবার এই গোপনীয়তা পছন্দ করতেন। এই নিয়ে ম্যাসনিক লজ দুইভাগ হয়ে যায়। এর বেশি কিছু গুগলে জানা গেল না। নিশীথ দত্ত কোনওভাবে এই গুপ্ত ম্যাসনদের সঙ্গে যুক্ত। শুধু যুক্তই না, সবকটা সুতো, দেবাশিসদা, আমার বাবা থেকে তারিণী, প্রিয়নাথ-ও হয়তো তাঁর কাছে এসেই মিশেছে। তবে তিনি দেবাশিসদাকে খুন করেছেন বলে মনে হয় না। আর কিছু না, ভদ্রলোকের যা বয়েস, আর যা শরীরের অবস্থা, তাতে দেবাশিসদার মতো জোয়ান মানুষকে কাবু করাই তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাকি তো ছেড়েই দিলাম। কিন্তু অফিসার মুখার্জি সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখালেন। তা তো মিথ্যে হতে পারে না। খুনের দিন, খুনের সময়

নিশীথ দত্ত খুব সম্ভব ওই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। আর কেউ ঢোকেনি, বা বেরোয়নি। যদি না... যদি না বাড়ির পিছনের খিড়কি দিয়ে কেউ ঢোকে। কিন্তু সেটা তো বেশিরভাগ সময় বন্ধই থাকে! অফিসার মুখার্জিকে ওটার কথা বলতে হবে। লিখে রাখলাম।

বাকি থাকেন অমিতাভ মুখার্জি নিজে। এই লোকটাকে যত দেখছি, তত কনফিউজড হচ্ছি। প্রথমে মনে হল ইনিই আসল ভিলেন, পরে খানিক ভিক্টিম প্লে করলেন, তারপর এমন সব তথ্য দিলেন, মনে হয় অনেক কিছু জানেন, আবার তারপরেই হয়তো একেবারে বোকা সাজছেন। সোজা কথা এই লোকটা আমায় ল্যাজে খেলাচ্ছে। কিন্তু কেন? আমার ধারণা সত্যি হলে ইনি প্রিয়নাথের বংশধর। দেবাশিসদা আমার মতো এঁকেও খুঁজে বার করেছিলেন। আমাদের দুজনকে নিয়ে ঠিক কী করতে চেয়েছিলেন তিনি? তাঁর খুনের পর যা যা হচ্ছে, সেসব যদি ঠিক হয়, তবে আমি আর অমিতাভবাবু এখন টার্গেটে। লোকটা নিজে পুলিশ, কিন্তু প্রায়ই আইন হাতে তুলে নেয়। সর্বদাই যেন কিছুর অপেক্ষায় আছে। একটা অস্থির ভাব। কিছু লোককে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে মন চায় না। ইনি সেই গোত্রের। এঁর মুখ হাসলেও চোখ হাসে না কখনোই।

খাতাভরা আঁকিবুকি। মাথা যন্ত্রণায় দপদপ করছে। টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে খাটে টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু ঘুমের লেশমাত্র নেই। সাড়ে চারটে বেজে গেছে। একটু বাদেই আলো ফুটবে। এমন সময় বাইরে গাড়ির শব্দ। কে এল এত সকালে? মাথার কাছে জানলাটা খুলে উকি মারলাম। সাদা রঙের একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। ছোটো প্রাইভেট কার। সেখান থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা। টপ শটে দেখছি বলে কাউকেই চেনা সম্ভব না। মহিলা দরজার বেল বাজালেন। দরজা খুলে গেল। দুজনে ঢুকে গেলেন ভিতরে। তারপর প্রায় আধঘণ্টা কোনও সাড়াশব্দ নেই। শুধু উপরের ঘর থেকে মৃদু কথার আওয়াজ ভেসে আসছে।

চোখটা বুঝি একটু লেগে এসেছিল। চটকা ভাঙল দরজার খুটখুট আওয়াজে। কেউ দরজায় টোকা দিচ্ছে। লাফিয়ে উঠে দরজা খুলতেই দেখি উর্ণা। ঘড়িতে চোখ পড়ল। পাঁচটা চল্লিশ। উর্ণার চোখ কেঁদেকেঁদে ফুলে গেছে। ধরা গলায় আমায় বলল, "তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম। সরি।"

"আরে না, না। কী হয়েছে বলো।"

"আমার সঙ্গে একটু উপরে আসতে পারবে? জরুরি দরকার।"

"আরে হ্যাঁ। পারব না কেন? কিন্তু কী হল?"

"না না, তেমন কিছু না। আসলে দিদি তোমাকে ডাকছেন।"

"দিদি?" উর্ণার যে একটা দিদিও আছে তা আমার জানা ছিল না।

"তোমার দিদি আছে? কোনও দিন দেখিনি তো! তুমিও বলোনি!"

বড়ো কষ্টের এক হাসি হাসল ঊর্ণা, "জানলে তো বলব। এত বছর বাদে, আজ এক ঘণ্টা আগে জানলাম।"

"নিজের দিদি?"

"না। সৎ দিদি। মায়ের আগের পক্ষের। এতকাল আমাকে কেউ কিচ্ছুটি বলেনি। সব চেপে গেছিল। বাবা-মা দুজনেই।" আবার টপ টপ করে জল পড়তে লাগল উর্ণার দুই চোখ বেয়ে।

মনে মনে বললাম *"Dissimulo",* মুখে বললাম, "সেই দিদি এতদিন পরে?"

"মা ডেকেছে। বাবাকে তো পুলিশে নিয়ে গেছে, তাই।"

"কিন্তু তাতে তোমার এই দিদি কী হেল্প করবেন?"

"জানি না। তুমি উপরে তো চলো।"

ঊর্ণাদের ড্রয়িংরুমের বাইরে থেকেই গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। ঊর্ণা ঘরে ঢুকতেই সবাই চুপ মেরে গেল। ঘরে দরজার দিকে মুখ করে উর্ণার মা বসে, আর সামনে সোফায় এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। দরজার দিকে পিছন করে বসায় তাঁদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তবে গাড়ি করে এঁদেরই আসতে দেখেছি।

ঊর্ণা মৃদুস্বরে "তুর্বসু এসেছে" বলায় উর্ণার মা কিছু বললেন না। ভাবলেশহীন ভাবে চেয়ে রইলেন।

সোফায় বসে থাকা ভদ্রমহিলা বেশ কষ্ট করেই উঠে দাঁড়ালেন। ফিরলেন আমার দিকে।

ভদ্রমহিলা সুশ্রী। ভদ্রমহিলা প্রেগন্যান্ট। সবচেয়ে বড়ো কথা, কিছুদিন আগেই এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক কলেজ স্ট্রিটের প্যারামাউন্টে কাটিয়েছি।

"অসময়ে বিরক্ত করলাম", বললেন অপর্ণা গুহ। দেবাশিস গুহের প্রাক্তন স্ত্রী। উর্ণার সৎ দিদি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— দুঃস্বপ্ন

৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫, রাত ১১.৫০

ইংল্যান্ডের বার্নমাউথের ছোট্ট বাগানবাড়িটায় সন্ধে না হতেই খাওয়াদাওয়া শেষ করে সবাই শুয়েপড়ে। ইদানীং বাড়ির মালিক অসুস্থ হয়ে পড়ায় কারও আর রাত জাগা হয় না। মালিক আগেই অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু দিন পনেরো সেটা বেড়েছে। লন্ডন থাকাকালীন এক ভোরে কাউকে না জানিয়ে কোথাও একটা বেরিয়ে গেছিলেন তিনি। ফেরার পরে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। মুখের হাসি মুছে গেছে, একা থাকেন, কী যেন বিড়বিড় করেন সারাক্ষণ। স্ত্রী ফ্যানি বহুবার জিজ্ঞাসা করেছেন, "কী হয়েছে লুই? আমায় খুলে বলো।" উত্তর আসেনি। স্পষ্টতই এড়িয়ে গেছেন নানা অছিলায়। তবে ফ্যানি একটা কথা বুঝেছেন। ভয়ানক কোনও একটা অভিজ্ঞতায় লুইয়ের অন্তরাত্মা অবধি শিহরিত হয়ে গেছে। কথায় কথায় রেগে যাচ্ছেন। জিনিসপত্র ছুড়েছুড়ে ফেলছেন, আবার পরক্ষণেই চাকরদের বলছেন সদরের দরজা ভালো করে আটকে দিতে, যাতে কেউ ঢুকতে না পারে। নিজের হাতে টেনে দিচ্ছেন জানলার ভারী পর্দা। মাঝে

মাঝে সেখান থেকেই উঁকি মেরে কীসব যেন দেখার চেষ্টা করছেন। ফ্যানিকে তো একদিন নিজের ঘর থেকে তাড়িয়েই দিলেন, "চলে যা ডাইনি! তোর জন্যেই আজ আমার এই অবস্থা", আবার পরদিনই হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছেন। এই লুইকে ফ্যানি চেনেন না। সেপ্টেম্বরের শুরু থেকেই ধুম জ্বর এল লুইয়ের। সেই ভয়ানক জ্বরের ঘোরেই কথা বলে চলেছেন, "দিনগুলো সব রাত হয়ে গেছে, রাতগুলো দিন। এ এক অদ্ভুত রাত, যেখানে সব বিড়ালের রং ধূসর আর সব ভালোর রং কালো..." কিছুই বুঝতে পারতেন না ফ্যানি। ভাবতেন সব সেরে যাবে একদিন।

তিন তারিখ প্রায় মাঝরাতে গোটা বাড়ি কেঁপে উঠল লুইয়ের আর্তনাদে। ভয়ংকর বীভৎস কিছু দেখলে মানুষ যেমন মরণ আর্তনাদ করে, তেমনি। পাশের ঘর থেকেই দৌড়ে এলেন ফ্যানি। লুই তখনও অচেতন, কিন্তু কোনও এক দুঃস্বপ্ন দেখে গোঙাচ্ছেন। পাশে ঢাকা লণ্ঠনটা উসকে দিয়ে লুইয়ের দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে লাগলেন তাঁর স্ত্রী। একবার, দুইবার, বারবার।

সারা গায়ে ঠান্ডা ঘাম, মাথার চুল অবধি ভিজে গেছে, ধড়মড়িয়ে লাল চোখে জেগে উঠলেন লুই। উঠেই বেশ চটে গেলেন ফ্যানির উপরে। "ডাকলে কেন আমাকে? আমি অসামান্য একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।" বলেই আবার পাশ ফিরে ঘুমোতে লাগলেন লুই। বোধহয় আবার স্বপ্নটা দেখার জন্য। সারারাত পাশে জেগে বসে রইলেন ফ্যানি।

পরদিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে চলে এলেন। তাঁর স্বামী। এমনটা সচরাচর ঘটে না। কিন্তু এসেও টেবিলে বসে থাকা বাকিদের সঙ্গে একটাও কথা বললেন না। যেন একমনে কী একটা ভাবছেন আর নাটকের সংলাপের মতো একের পর এক সংলাপ বলে চলেছেন। পাশেই ছিল সৎ ছেলে। লয়েড। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে তোমার?" ততক্ষণে লুইয়ের খাওয়া শেষ। তিনি টেবিলের সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি আমার ঘরে যাচ্ছি। একটা লেখা মাথায় এসেছে। যতক্ষণ না দরজা খুলব

কেউ আমায় ডাকবে না, ডিস্টার্ব করবে না, এমনকি বাড়িতে আগুন লেগে গেলেও না।” বলে যেতে যেতে অদ্ভুত একটা কথা বললেন, “ওরা অবাস্তব কাহিনি চায়, তাই তো? আমি এবার ওদের বাস্তবটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব।”

তিন দিন, তিন রাত ঘর থেকে বেরোলেন না লুই। ফ্যানি দরজার সামনে খাবার রেখে আসতেন, লুই সময়মতো খেয়ে নিতেন। চতুর্থ দিনের দিন, ফ্যানির ডাক পড়ল লুইয়ের ঘরে। ফ্যানি জানতেন এই ডাক আসবে। যে-কোনো লেখা লিখে লুই তাঁকে না দেখিয়ে ছাপতে দেন না। ঘরে ঢুকে ফ্যানির চক্ষু চড়কগাছ। গোটা ঘরে দোমড়ানো সাদা পাতা ছড়িয়ে আছে মৃত সৈনিকের মতো। খাটের উপরে মুখের ভিতর থার্মোমিটার আর হাতে প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া পেনসিল নিয়ে বসে আছেন লুই। তাঁর সারা মুখ মড়ারমতো সাদা। সামনে বিরাট মোটা একটা কাগজের পাণ্ডুলিপি।

ম্লান হেসে ফ্যানিকে বললেন, “তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। এই তিনদিনে প্রায় চৌষট্টি হাজার শব্দ লিখেছি। দিনে কুড়ি হাজারের বেশি। বল এবার তোমার কোর্টে।”

পাণ্ডুলিপি ফ্যানির দিকে এগিয়ে দিলেন লুই। বইয়ের নাম দেখেই চমকে উঠলেন ফ্যানি। নামভূমিকায় যিনি, তিনি তো সবার পরিচিত, সম্মাননীয় এক ডাক্তার! প্রথম পাতাতেই বড়োবড়ো করে লেখা, “The Curious Case of Dr Elly Henky Jr. and Hewed Raddy।” এরপর যখন পড়তে শুরু করলেন, ফ্যানির হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল ভয়ে। এ কী শুনছেন তিনি? এও সম্ভব! আর যদি সত্যিই সম্ভব হয়, তবে এই লেখা প্রকাশ পেলে কেউ রেহাই পাবে না। কেউ না। যে ব্রাদারহুডের কথা লুই লিখেছেন, তাঁদের গোপনতম তথ্য, নিগূঢ় ব্রহ্মাস্ত্রের কথা প্রকাশ পাক নিশ্চয়ই তাঁরা চাইবেন না। আর তাই শুধু লুই না, এদের ক্রোধের আগুনে দগ্ধ হবেন ফ্যানি, এমনকি তাঁর আগের পক্ষের ছেলে লয়েড-ও। কিন্তু লয়েডের কী দোষ। ও বেচারা তো কিছুই জানে না এসবের।

ফ্যানির দুই চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। প্রথমে খেয়াল করেননি লুই। চোখ পড়তেই থেমে গেলেন।

"কী হয়েছে ফ্যানি?"

ফ্যানি প্রথমে কিছু বলছিলেন না। শুধু পাশাপাশি মাথা নাড়লেন। কিছু হয়নি।

লুই অত বোকা না যে ফ্যানির কথা সরাসরি বিশ্বাস করে নেবেন। বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকলেন, জোর করলেন। অবশেষে ধরা গলায় ফ্যানি জানালেন, "কী বই লিখছ তুমি? জানো এই বই প্রকাশ পেলে কী হতে পারে? যাদের কথা লিখেছ, তারা কেউ আমাদের ছেড়ে দেবে ভেবেছ? ওদের ক্ষমতা অনেক। বরং তুমিই ছাপোষা লেখক। তোমায় কেউ বিশ্বাস করবে না। মাঝখান থেকে আমরা সবাই বিপদে পড়ব।"

"কিন্তু", গলা কাঁপতে থাকে লুইয়ের, "এত বড়ো একটা ঘটনা জেনেও চুপ করে বসে থাকব? আর ওরাই তো বলেছে আমায় এটা নিয়ে লিখতে।"

"কিন্তু সত্যিটা লিখতে বলেছে কি? তুমিই তো বললে, বলেছে রূপকথার মতো করে লিখতে। তেমন করেই লেখো। আসল নাম ঠিকানা দেবার দরকারটাই বা কী? আর তোমার গোটা লেখা ওই ওষুধটা নিয়ে। তুমি বরং গল্পের অভিমুখ ঘুরিয়ে দাও। মানুষের যে দুটো সত্তা, ভালো আর খারাপ-- সেটাকে নিয়ে লেখো। তাহলে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।"

বলতে বলতে লুইয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই থেমে গেলেন ফ্যানি। সেখানে আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার, হাত কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত লয়ে। বিকৃত ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন লুই, "বেরিয়ে যাও। এখুনি বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।" আর একটাও কথা না বলে ফ্যানি নেমে এলেন নিচে। গুম হয়ে ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে রইলেন খানিক। আধঘণ্টাও গেল না। ঝড়ের বেগে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন লুই। হাতে পাণ্ডুলিপির তাড়া।

"তুমি ঠিক বলেছ। আমাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে", বলে ফ্যানি কিছু বোঝার আগেই গোটা পাণ্ডুলিপি ছুড়ে দিলেন ফায়ারপ্লেসে। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল গোটা পাণ্ডুলিপিটাই। চেষ্টা করেও ফ্যানি একটা টুকরো অবধি বাঁচাতে পারলেন না।



তারপর কয়েকদিন ভূতগ্রস্তের মত কাটল লুইয়ের। কিছু লিখছেন না। শুধু কাগজে হিজিবিজি কাটছেন। নাম লিখছেন। নাম কাটছেন। আবার নতুন নাম লিখছেন। একই নামের অক্ষরকে এদিক ওদিক করে নতুন নাম বানাচ্ছেন। অবশেষে এলি হেনকি জুনিয়ার আর হিউড রাডির নামের পছন্দসই অ্যানাগ্রাম বানানো গেল। ফরাসি ভাষায় পারদর্শী লুইয়ের মনে হল এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না। এই নামের ফরাসি মানে "Jekill" বা "I kill", আমি খুন করি। তারপর এক হপ্তায় মাত্র পঁচিশ হাজার শব্দের যে নভেলাটি তিনি বড়দিনের জন্য লিখলেন, সেটা পড়ে ফ্যানির আপত্তির কিছু রইল না। বড়দিনের পরপরেই বাজারে লংম্যানস, গ্রিনঅ্যান্ড কোং থেকে প্রকাশ পেল নতুন বই, "The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Written by Robert Louis Stevenson।"

নবম পরিচ্ছেদ— গণপতির বাক্স

কাকভোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল। সারা সকাল একভাবে বৃষ্টি হয়ে দুপুরের দিকে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু রাস্তাঘাট জলে জলে একাকার। আকাশে জল ভরা মেঘ মুখ ভার করে রয়েছে। বেলা একটু পড়তেই গণপতি দর্জিপাড়ার দিকে পা বাড়াল। এই পথ তার হাতের তালুর মতোচেনা। কিন্তু আজ তার পা টানছে না। ভেবেছিল কোনও দিন আর এইমুখো হবে না। পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দারোগা প্রিয়নাথের জন্য পালাতে পারল না। তারিণীর জন্য পালাতে পারল না। কাল হাসপাতালে সাইগারসন সাহেব তাদের যা যা বললেন, তা যদি সত্যি হয়, তবে ঘোর বিপদ। এই বিপদে পালানো চলে না। কিন্তু জেনেশুনে সাপের গর্তে হাত ঢোকানোর ফল কী হতে পারে সেটাও হাড়েহাড়ে

জানা আছে তার। একটু সন্দেহ হলেই এরা শত্রুর শেষ রাখে না। সেখানে গণপতিকে ছেড়ে দেবে, ভাবাটাই হাস্যকর।

তবে গোপন বার্তা দিয়ে তাকে যখন ডাকা হয়েছে, তখন নিশ্চিত তাদের কোনও মতলব আছে, যাতে গণপতিকে কাজে লাগতে পারে। সাহেবও সেটাই বললেন। গতকাল সবকিছু খুলে বলার পরে দারোগাবাবু আর সাহেব তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। এককালে তারিণী নিজে এই কাজ করত। খোচড়ের কাজ। এই কাজ করেই ড্রিসকল সাহেবের নেকনজরে এসেছিল সে। কিন্তু গণপতি মাতাল-দাতাল মানুষ। সে কি পারবে এই কাজ করতে? এমনই নানা চিন্তা করতে করতে আনমনে পথ হেঁটে কখন চৌরাস্তা পেরিয়ে এসেছে মনে নেই। সেখানে এসে দেখল গোটা পঞ্চাশ খোট্টা বেজায় ভিড় করে এক দোতলা বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। তাদের একদল চাতক পাখির মতো ছাদের দিকে, অন্য দল



পাশেই নর্দমার দিকে তাকিয়ে। শহরে এ এক নতুন জুয়াখেলার আমদানি হয়েছে। এদের কেউ কেউ বাজি রাখে, তিন ঘণ্টার মধ্যে এমন বৃষ্টি হবে যে বাড়ির নর্দমা দিয়ে হুহু করে জল পড়বে। অন্যরা এর উলটোটা বলে। বাজির দর দুই আনা থেকে পাঁচশো টাকা অবধি ওঠে। এবার দুই দলই ট্যাঁকঘড়ি হাতে রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে মহা হল্লা করছে। তাদের কোনওমতে এড়িয়ে সোনাগাজির দরগা পাশে রেখে গণপতি মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের ঠিকানায় পা বাড়াল। মেঘ গুড়গুড় করছে। বৃষ্টির আর খুব দেরি নেই। সময়মতো পৌঁছাতে না পারলে ভিজে একশা হতে হবে। গণপতির হাঁফ ধরে গেল। একে দ্রুত হাঁটা, অন্যদিকে চাপা উত্তেজনা। লখনের দল কি কিছু জানতে পেরেছে? যদি পেরে থাকে, আজ তবে তার আর রেহাই নেই।

একশো বছর আগেও সোনাগাজির দরগায় চারদিকে শ্যাওলাধরা দেওয়ালে কাক-শালিকের বাসা ছিল। এ রাস্তায় সন্ধে হতে না হতে কেবল শিয়াল কুকুর ছাড়া কারও আওয়াজ পাওয়া যেত না। এখন সেই রাস্তাতে এই বৃষ্টির দিনেও আতর, গোলাপ, ফুলেল তেল বিক্রি হচ্ছে। দোকানের সামনে ফুলুরি, চিংড়ি, তোপসে মাছ ভাজা, হাঁসের ডিম সিদ্ধ, পেঁয়াজ দিয়ে ছোলাভাজা সাজানো। দুই একটা মিঠাইয়ের দোকান-ও আছে। মিঠাইওয়ালা হাঁক পাড়ছে "মজাদার নকোলদানা, এই বেলা নে আর পাবি না" কিংবা "ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের আঁচ, ক্ষীরপুলি চা-আ-ই।" খানদানি লম্পটরা আজ বিকেল না হতেই বিভিন্ন বাড়িতে ঢোকা শুরু করে দিয়েছে। মোড় ঘুরতেই রামকৃষ্ণ শুঁড়ির দোকান। দোকানের সামনে এক বেশ্যা মদ দিতে বলছে। আরও দুই-তিনজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। শুঁড়িকে দেখেই গা ঢাকা দিয়ে অন্য পথে যাবার ধান্দায় ছিল গণপতি। শুঁড়ি সে সুযোগ দেবে কেন? গণপতিকে দেখেই হাঁক পাড়লে, "ও চক্কোত্তির পো! আজকাল এই পথে দেখি না যে বড়ো?"

"নানা কাজে ব্যস্ত থাকি কিনা..." গণপতি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল।

“অ। তার মানে কাজকম্মো জুটচে। আয় হচ্চে। ভালো ভালো। কিন্তু ভালোমানুষের পো, এই গরিব শুঁড়ির কাচে মদ খেয়ে যে গোটাগুটি সাড়ে সাত টাকা ধার করেচিলে, সেটা দিতে গেলেই বুজি পরাণে ব্যাতা লাগে? বলি টাকাটা কি পাব?”

দোকানের সামনে বেশ্যারা উচ্চস্বরে অশ্লীল হাসি হেসে উঠল। যেন কতই না মজা হয়েছে। একজন আবার ছড়া কাটল-

“কাপ্তেনগিরি কি ঝকমারি।

কেঁদেকেঁদে শেষে চোখে পড়ে বারি”

আবার সবাই একসঙ্গে হেসে ওঠে। গণপতি দ্রুত পা চালায়। দর্জিপাড়া পেরোতেই রাস্তা সরু হয়ে এল। এদিকে বাড়িগুলো আরও কাছাকাছি ঘেঁষা। প্রায় প্রতিটি বাড়ির একতলাতেই নানা অদ্ভূত জড়িবুটি, সারসাপ্যারিলা, আর অদ্ভুত সব পেটেন্ট কেমিক্যালের দোকান। বাইরের বোর্ডে চোখ বুলালে অনায়াসেই “মদনানন্দ মোদক”, “রতিবর্ধক রসায়ন”, “শঙ্কর শক্তি সালসা”-র মতো বিচিত্র সব নাম দেখা যায়। গণপতি যে ঠিকানায় যাবে, বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্ব নেই। ৭ নং মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের পরের বাড়িটিই ৮ নং। ৭/১-এর সন্ধান শুধু বিশেষ কিছু লোক ছাড়া জানে না।

৭ নম্বরের সামনে এসে দাঁড়াতেই গণপতির ভয় করা শুরু হল। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। প্রথমেই যা মনে এল, তা হল গঙ্গার ঘাটে পিণ্ডারী বাবার ছিন্নভিন্ন দেহ, আর শৈলর পরিণতি। কে জানে, এই সন্ধেই তার জীবনের শেষ সন্ধে কি না!

ইষ্টনাম জপ করে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল গণপতি। বাইরে আচমকা ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। দূরে প্রবল চিৎকারে বোঝা গেল বাজিতে জেতা খোট্টারা উল্লাসে ফেটে পড়েছে। ঘরের ভিতর এখনই এত অন্ধকার যে তেমন কিছু ঠাহর করা যায় না। দেওয়াল জুড়ে বড়োবড়ো কাঠের ক্যাবিনেট। কাচ ঢাকা। তাতে সারি সারি অদ্ভুত নামের সব বোতল সাজানো। এক বুড়ো মুসলমান ক্যাবিনেটের

সামনে বড়ো কাঠের টেবিলে লণ্ঠন জ্বালিয়ে খুব নিচু হয়ে কিছু একটা পড়ছিলেন। গণপতি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুড়ো বই থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে খুব নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "জি জনাব?"

গণপতির বুকের ধুকপুকানি যেন বাইরে থেকে শোনা যাবে। তবু সে অম্লানবদনে বলল, "আজ সন্ধেছটায় আমাকে আসতে বলা হয়েছিল।"

বুড়োর চোখে সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

"আজ? কিসনেবুলায়া?"

এবার গণপতি ফ্যাসাদে পড়ল। এর আগে এখানে সে বার দু-এক এসেছে। দুইবারই সঙ্গে শৈল ছিল। তাই ঢুকতে সমস্যা হয়নি। এই বড়োবড়ো ওষুধের আলমারি আসলে পুরোটাই ধোঁকা। পিছনে আর-একটা ঘর আছে। সেটার গোপন নামই ৭/১। গণপতি জানে। খানিক আমতা আমতা করে সোজা সেই আলমারির দিকেই আঙুল দেখিয়ে বলল, "ওই কামরায় আমাকে ডেকেছে।"

বুড়ো মুসলমান এবার উঁচু টুল থেকে নেমে এলেন।

"আপ কেয়া কহ রহে হ্যায়, কুছ সমঝমে নেহি আ রহা।"

গণপতি খেয়াল করে দেখল বুড়ো লম্বায় গণপতির চেয়েও আধা হাতখানেক বড়ো। বইটা সযত্নে মুড়ে রেখে পিছনের টেবিলের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল সে। দাঁড়াল গণপতির ঠিক পাশটাতে। একনজরে বইটার নাম খেয়াল করল গণপতি। বটতলার মুসলমানি বই "মোক্তল হোছেন প্রণীত জঙ্গনামা।" হাজিপাড়া ঝোয়তঝরি প্রেসে ছাপা।

এই দেখাই কাল হল গণপতির। হুল ফোটার মতো তীব্র এক যন্ত্রণায় ঘাড়ের কাছটা জ্বলে যেতে লাগল। তার অন্যমনস্কতার সুযোগে ঘাড়ের কাছে সজোরে কিছু একটা ফুটিয়ে দিয়েছে লোকটা। এত দ্রুত, গণপতি নিজে জাদুকর হয়েও আন্দাজ করতে পারেনি। এখন একটা বিচ্ছিরি জ্বালাধরা ভাব ছড়িয়ে যাচ্ছে ঘাড় থেকে সারা দেহে, সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে যাচ্ছে গোটা দেহ। গণপতির চোখে গোটা ঘর যেন দুলে উঠল, বীরুৎজাতীয় উদ্ভিদের মতো সে টলেপড়ে

যেতে থাকল মাটিতে। পড়েই যেত, যদি না একেবারে শেষ মুহূর্তে সেই বুড়ো তাকে সযত্নে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিত।

এরপর খানিকক্ষণ গণপতির কিচ্ছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরতে শুরু করল, মনে পড়ল ঠিক এমনটাই হয়েছিল তার সঙ্গে। অনেক বছর আগে। যেদিন পিণ্ডারী বাবার খুনের দিন কালঘুমে ধরেছিল। সেদিনের মতো আজকেও কানে আসছে একের পর এক গলার আওয়াজ। সেই ঘোরের মধ্যেও একটা গলা চিনতে পারল সে। নরকে গেলেও সে এই গলা ভুলবে না। লখন। লখন চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল। গণপতি বুঝতে পারল তার হাতের শিরায় আবার একটা কিছু ফুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। তার শিরা উপশিরায় ছড়িয়ে পড়ছে প্রচণ্ড জ্বলুনি। সারা গা দিয়ে ঘাম হচ্ছে। তারপর আচমকা যেন এক ধাক্কায় সম্পূর্ণ চেতনায় ফিরে এল গণপতি।

একটা খালি ঘর। তাতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা চেয়ার। ঘরে এক কোনায় টেবিলে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তারই হলুদ আলোতে ঘরের সবাইকে দেখা যাচ্ছে। মাঝের চেয়ারটাতে লখন নিজে বসে। বাকিগুলোতে আরও তিন-চারজন। এদের দুজন স্পষ্টতই সাহেব কিংবা অ্যাংলো। বাকিরা নেটিভ। গণপতি মাথা উঠানোর চেষ্টা করতেই লখন কেটে কেটে বলল, "কোথায় পালিয়েছিলি?"

গণপতির মাথা ঘোরাচ্ছে। তবুও সে একটু অবাক হবার ভান করে বলল,"পালাব কোথায়? পালাইনি তো।"

"পালাসনি? কাল মঞ্চ থেকে ভ্যানিশ হয়ে কোথায় গেছিলি? মল্লিকবাড়ি কাল সারারাত আমার লোক তোকে খুঁজেছে। পায়নি। এমনকি তুই ম্যাজিক শেষে কার্টেন কলেও আসিসনি। কোথায় গেছিলি?"

গণপতি দেখল তার বুদ্ধি একেবারে ঠিকঠাক কাজ করছে।

"পালাব কেন? কাল স্পেশাল শো ছিল। ওই পালিয়ে যাওয়াটাই চমক। কার্টেন কলে সেটা নষ্ট হয়ে যেত।"

"কাল এলি না কেন? এখানে তো কাল আসার কথা ছিল।"

এবার গণপতি যে অভিনয়টা করল, অমৃতলাল উপস্থিত থাকলে তাকে পরের নাটকে নায়কের পার্ট দিতেন। চোখ বড়োবড়ো করে বলল, "গতকাল? আসার কথা তো ছিল আজকে! সেইরকমই তো হ্যান্ডবিলে ছিল।"

"সেইরকম ছিল? কোথায়, দেখি হ্যান্ডবিল?"

"আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। তুমিই তো বলেছিলে প্রমাণ রাখতে নেই।"

লখন একটু দমে গেল।

"তবুও, কী লেখা ছিল মনে আছে?"

"হ্যাঁ। দুই স্তনে তিনবার করিয়া পাঁচদিন মাত্র..."

"হ্যান্ডবিল কবে পেয়েছিলি?"

গণপতি কড় গুণে কীসব যেন হিসেব করে। তারপর জিভ কেটে বলে, "এ হে! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। অঙ্কে আমি বড়ো কাঁচা। একদিন এদিক ওদিক হয়ে গেছে", হাসার চেষ্টা করল গণপতি। হাসি ফুটল না।

"কাল কোথায় ছিলিস সারারাত?"

"গঙ্গার ঘাটে।"

"কোন ঘাট?"

"আহিরীটোলা।"

"কেন?"

অদ্ভুত বিষন্ন গলায় গণপতি বলল, "কাল মায়ের মৃত্যুদিন ছিল। মাকে পুড়িয়ে অস্থি ওই ঘাটেই ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। তাই মায়ের কথা খুব মনে পড়ছিল....."

লখনের গলা যেন একটু নরম হল, "মা কত বছর হল মারা গেছেন?"

"অনেকদিন। হিসেব নেই।"

"শোন, যে কারণে কালকে তোকে ডাকা হয়েছিল, আগেই বলেছিলাম সংঘের কাজে ডাক পেলেই আসতে হবে। আসবি তো?"

"অবশ্যই। দরকার হলে ম্যাজিক দেখানো ছেড়ে দেব।"

"না না। একেবারেই না। বরং এই ম্যাজিকটাই তোকে দেখিয়ে যেতে হবে। শুনেছি ইদানীং নাকি খুব নামডাক হয়েছে তোর?"

গণপতি মৃদুস্বরেজানায়, "সামান্য।"

"তুই নাকি যে-কোনো বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারিস? মঞ্চে আত্মাকে আহ্বান করতে পারিস?"

"তা অল্প পারি বটে। "

বলতে না বলতে লখন চোখ দিয়ে ইশারা করতেই তিন-চারজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল গণপতির উপরে। দুজন পুলিশি হ্যান্ডকাফ দিয়ে তার দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দিল। তারপর একটা কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল মুখ। বাকি দুজন সে কিছু বোঝার আগেই তার পা দুটো মোটা দড়িতে বেঁধে ভরে দিল কাপড়ের বস্তায়। তারপর গোটা দেহ আগাগোড়া বেঁধে ছুড়ে ফেলে দিল ঘরের একদিকে অন্ধকার কোণে। লখন এতক্ষণ কিচ্ছু বলছিল না। শুধু তাকিয়ে দেখছিল। এবার বাকিদের দিকে ফিরে চোস্ত ইংরেজিতে বলল, "এই ঘরটা তালা দিয়ে বাইরে একজন দাঁড়িয়ে থাক। আমি আধঘণ্টা বাদে ফিরব। দেখি, যতটা শোনা যায়, সেটা সত্যি না মিথ্যে। কে থাকবে পাহারায়?"

একজন রাজি হল। লখন তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বেরোতে যাবে, এমন সময় গণপতির গলার আওয়াজ ভেসে এল, "কোথায় যাচ্ছ হে লখন? আমাকেও নিয়ে যাও।"

ভূত দেখার মতো চমকে সবাই দেখল কোমরে এক হাত দিয়ে হাসিমুখে গণপতি দাঁড়িয়ে আছে। দড়িদড়া বস্তা সব পায়ের কাছে শীতের ঝরা পাতার মতো পড়ে। অন্য হাতের তর্জনীতে দুলছে তালাখোলা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের আসল পুলিসি হ্যান্ডকাফ। বলা হয় এই হ্যান্ডকাফ থেকে স্বয়ং শয়তানও নাকি মুক্ত হতে পারেন না।

এতক্ষণে লখনের মুখে হাসি ফুটল। "জিও বাচ্চা!" পিণ্ডারী বাবা এই কথাটা প্রায়ই বলত, খুব খুশি হলে।

লখন এবার গণপতির দিকে এগিয়ে দিল একটা চেয়ার। স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোকে যে কাজটা দেব, বড়ো কঠিন কাজ। দেবার আগে তাই পরীক্ষা করা দরকার। প্রথম পরীক্ষায় পাশ করেছিস। এবার দ্বিতীয়। তুই নাকি মঞ্চে ভূত নামাতে পারিস? কেমন করে?"

"নামাতে হয় না। আমি নিজেই আসি গণপতির কাছে", সবাইকে চমকে দিয়ে যেন অশরীরী কেউ কথা বলে ওঠে। ঘরের সবাই তাকায় গণপতির দিকে। তার ঠোঁটটুকুও কাঁপছে না। শুধু ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি।

সেই অশরীরী কণ্ঠ আবার বলল, "বল, কী জানতে চাস?"

হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল লখন। "ধুসস! এই ভেন্ট্রিলোকুইজম দিয়ে তুই লোক ভোলাস? এসবে চলবে না। সত্যিকারের ভূত নামাতে পারবি?"

"তাও নামিয়েছি। বন্ধ ক্যাবিনেটে।"

"ওসব নেটিভদের সঙ্গে চলে। সাহেবদের কাছে ওইসব জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। সত্যিকারের ভূত নামবে মঞ্চে চলে ফিরে বেড়াবে, কিন্তু ধরতে গেলে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। পারবি এমন ভূত নামাতে?"

প্রায় মিনিট পাঁচেক চুপ করে বসে রইল গণপতি। কী যেন ভাবছে, তারপর তার চোখ জ্বলে উঠল, "পারব। তবে খরচা হবে।"

"কীসের খরচা।"

"একটা কাচ লাগবে। বিরাট বড়ো কাচ।"

শুনেই লখন নিজেও ভাবতে শুরু করল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমাধান এসে গেল তার মাথায়।

"সাব্বাস", বলে প্রায় লাফিয়ে উঠল লখন।

"তোর হবে। তোকে দিয়েই হবে। শুধু শেষ পরীক্ষা।"

লখনের আদেশে দ্রুত দুই-তিনজন মিলে গণপতির চোখ আবার বেঁধে দিল। তবে এবার টকটকে লাল একটা কাপড়ে। একজন তার ডান পায়ের কাপড় উঠিয়ে গার্টার দিয়ে বেঁধে দিল হাঁটুর কাছে। অন্যজন তার দুই হাত ডুবিয়ে দিল বরফঠাণ্ডা জলে। গণপতি বুঝতে পারল এবার কী হবে। না চাইলেও নীবারসপ্তক তাকে গ্রাস করতে চলেছে। অন্য সময় হলে সে হয়তো আপত্তি করত। কিন্তু সাইগারসন সাহেব যা বললেন, এর পরে সে মানা করা মানে শেষ সূত্র অবধি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া।

গণপতি কানে শুনতে পেল, লখন বাদে বাকি সবাই মৃদু স্বরে মন্ত্রের মতো কী যেন আওড়াচ্ছে। একটু খেয়াল করতেই বুঝল একটানা এক লয়ে সবাই বলে চলেছে, "ওরিজেন ওরিজেন ওরিজেন।" জাবুলনদের উপাস্য সাধু। যে-কোনো কাজ শুরুর আগে এই ওরিজেনের নাম নিয়ে কাজ শুরু হয়। যাতে সবাই টের না পায়, তাই সাঁটে Origen-কে উলটেপালটে লেখে Ignore। "ইগনোর করিবেন না।" এসব গণপতি জানে। শুধু জানে না এবার ঠিক কী হতে চলেছে।

লখনের গলা ভেসে এল। তবে এবার আর তুই না, তুমি।

"আজ থেকে জাবুলনদের এই ভ্রাতৃসংঘ তোমাকে আপন করে নেবে। আমাদের ঈশ্বর জাবুলনের JAH মানে স্বর্গ, আমাদের অভীষ্ট অক্ষর G। এই G থেকেই সব। Geometry, God, Grand Architect of Universe, Grand Master। হিব্রু বর্ণমালা অনুযায়ী আমাদের স্বর্গীয় সংখ্যা তাই ১০+১+৫, অর্থাৎ ১৬। আর ১ ও ৬ থেকে পাই ৭। বুঝতে পারলে হ্যাঁ বলো।"

"হ্যাঁ", গণপতি মাথা নাড়ল।

"আজ থেকে আমি তোমার মাস্টার। তুমি সেটাই করবে আমি যা আদেশ করব। রাজি?"

"রাজি।"

"বলো হ্যাঁ, রাজি মাস্টার।"

“হ্যাঁ, রাজি মাস্টার।”

“তোমার পণ কী?”

“আমার জীবন।”

“তুমি কী দেবে?”

“ভক্তি।”

“যদি তাই হয় আমার কথা শোনো। আমার কাছে এসো। প্রতিবার এক পা, এক পা করে।” গণপতি এক পা এগোল।

“এসো।”

পা বাড়াতেই গণপতির দুই চোখে তীব্র চাপ অনুভূত হল। শক্ত লোহার সরু কিছু ঠিক চোখের পাতার উপরেই ধরা। এক পা কেন, আর এক চুল নড়লেই চোখে বিঁধে যাবে সেই শলাকা। এইসবই কি তবে তাকে ফাঁদে ফেলার উপায়? সাহেবের কথা শুনে সে ভুল করেছে। হয়তো এরা সব জানে। শৈলর মতো আগামী কাল তার দেহও পড়ে থাকবে সোনাগাজির কোনও এক আস্তাকুঁড়ে।

“এসো”, লখনের গলার স্বর আরও কঠিন হল।

গণপতি জানে ফেরার উপায় নেই। যা থাকে কপালে ভেবে পা এগিয়ে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে চোখের উপরের চাপ উধাও হল। চোখ থেকে কাপড় খুলে ফেলা হল। লখন তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

“ব্রাদারহুডে স্বাগত”, হাসিমুখে বলল লখন।

বাকিরা আবার মৃদুস্বরে ওরিজেনের নাম জপ করছে।

এরপর সবাই একে একে বেরিয়ে গেল। ঘরে লখন আর গণপতি। আর কেউ নেই। লখন বলল, “আমরা ব্রাদারহুডের সবাই মিলে এক চরম পরীক্ষার সামনে এসেছি। এত বছর ধরে মুক্তির যে প্রচেষ্টা আমরা চালাচ্ছিলাম, অবশেষে তার একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি সবাই। এখানেই তোমার সাহায্য লাগবে।”

"কিন্তু কীভাবে?"

"সব বুঝিয়ে বলব। একটু অপেক্ষা করো।"

লখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গণপতি বসে রইল। বুঝতে পারছে, আজ থেকে সে-ও ষড়যন্ত্রের অংশীদার। খানিক বাদেই লখন ঢুকল। তবে একা না। লখনের সঙ্গে যে ঢুকল তাকে গণপতি চেনে। লখন তাকে পরিচয় দিয়েছিল নিজের দিদি বলে। লাল চুল, গোলাপি ত্বকের সেই মেয়েটা আজ ইউরোপীয় গাউন পরায় তাকে একেবারে অন্যরকম লাগছে।

ময়নার হাতে অদ্ভুত একটা বাক্স। সিসের লাইনিং দেওয়া। লখন বাক্সটা ময়নার থেকে নিয়ে গণপতির হাতে দিল।

"কী আছে এতে?"

"নিজেই খুলে দ্যাখো, তুমি তো বড়ো ম্যাজিশিয়ান।"

নানাভাবে চেষ্টা করল গণপতি। বাক্সে কোনও তালাচাবি নেই। এমন বাক্স ম্যাজিকের দুনিয়ায় অনেক আছে। গণপতির কোনোটা খুলতেই এক মিনিটের বেশি লাগে না। এদিকে দশ মিনিট হয়ে গেল। ঘেমেনেয়ে গেল গণপতি। কিন্তু এই অদ্ভুত বাক্সটা কিছুতেই খুলতে পারল না।

"পারছি না। অসম্ভব। এমন বাক্স আগে কোনও দিন দেখিনি।"

"আমাকে দাও", হেসে হাত বাড়াল লখন, "এই বাক্সে ভূত আছে। তোমায় দেখাচ্ছি কীভাবে এই ভূতকে পুষতে হবে।"

দশম পরিচ্ছেদ— বার্গান্ডি

ডিসেম্বর ৫, ১৮৯৪, ভাইলিমা, সামোয়া

অষ্টাদশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে ইউরোপীয় জাহাজিরা নতুন নতুন দেশের সন্ধানে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন। তাঁদেরই একজন, এক

ফরাসি, লুই আঁতোয়ান ডি বোগেনভিল, অস্ট্রেলিয়ার থেকে কিছু দুরে একঝাঁক নতুন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন। অবশ্য আবিষ্কার বলতে তথাকথিত সভ্যসমাজের আবিষ্কার। তিনি এই দ্বীপপুঞ্জের নাম রাখলেন নেভিগেটর দ্বীপপুঞ্জ, যা পরে পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ নাম নেয়। তারপর যা হয় আর কি। দলে দলে ইউরোপীয়ান মিশনারি আর ব্যবসায়ীরা এসে ছেয়ে ফেলল এই দ্বীপ। আমেরিকাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? তারাও একটা দিক দখল করে নিজেদের অস্তিত্ব জাহির করল। মাঝখান থেকে দ্বীপের আদিবাসীদের লবেজান দশা। একের পর এক বড়োলোক ইউরোপীয় এসে তাদের জমি কিনে নিচ্ছে, আর তারা প্রান্তিক জনজাতিতে পরিণত হচ্ছে। এমনতর অবস্থায় প্রায় সবার নজর এড়িয়ে ১৮৮৯-তে সামোয়ায় *ইক্যুয়েটর* নামে এক জাহাজ এসে থামল। জাহাজ থেকে অনেকের সঙ্গে নেমে এলেন এক ঢ্যাঙা, অসুস্থ সাহেব। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে তীব্র শারীরিক কিংবা মানসিক উদ্বেগে কেমন যেন পাগলপারা হয়ে গেছেন তিনি। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। হিসেবমতো এই সময় তাঁর লন্ডনেই থাকা উচিত। তাঁর লেখা শেষ নভেলা “দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ ডাক্তার জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড” শুধু বিক্রিতেই আকাশ ছোঁয়নি, সর্বকালের সেরা ভয়ের বইয়ের তালিকায় নাম ঢুকিয়ে ফেলেছে। লন্ডন থেকে আমেরিকার ব্রডওয়ে, সর্বত্র রমরমিয়ে চলছে তাঁর নাটক। সবাই একটিবারের জন্য দেখতে চাইছেন লেখককে। আর সেই লেখক সবার চোখ এড়িয়ে সামোয়ার ভাইলিমাতে ৩১৩ একর জমি কিনে বাড়ি বানিয়ে থাকা শুরু করলেন। এক অর্থে ভাইলিমায় থাকা দ্বীপান্তর হওয়া কয়েদির সামিল। সভ্য জগতের সঙ্গে সংযোগ বলতে একখানা মাত্র জাহাজ, যা মাসে একবার সানফ্রান্সিস্কো থেকে সিডনি যাবার পথে মাসকাবারি খোরাক, ওষুধ ইত্যাদি নামিয়ে দিয়ে যায়। খ্যাতির চরম সীমায় লুইয়ের এইভাবে পালিয়ে আসার কারণ কেউ জানে না। স্ত্রী ফ্যানিও না। তিনি শুধু এটুকুতেই খুশি, এখানে এসে লুই আবার আগের মতো ফুর্তিবাজ হয়ে গেছেন। স্বাস্থ্যও ফিরেছে অনেকটা। কিন্তু এই একলা জীবন ফ্যানির মনে ধীরে ধীরে চেপে বসতে থাকে।

ফ্যানি ভাবেন এবার তিনি নিজেই হয়তো পাগল হয়ে যাবেন। পাঁচ বছর এভাবেই কেটে গেল দুজনের। লুই লম্বা লম্বা চিঠি লেখেন পরিচিতদের, কবিতা লেখেন। কিন্তু যে বইয়ের জন্য আজ তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তার নামটুকুও নেন না। যেন জাদুবলে জীবনের ওই অধ্যায়টাই উপড়ে ফেলেছেন সমূলে।

ডিসেম্বরের প্রথম দিন আপিয়াতে যে মালবাহী জাহাজ থামে, তার সঙ্গে জাহাজ থেকে নেমে এল ছোটোখাটো, গাঁট্টাগোঁট্টা এক মানুষ। মাথায় টপ হ্যাট, হাতে লাঠি, তবুও চলনে বলনে কোথাও একটা গ্রাম্যভাব। ঠিক তিনদিন লাগল তাঁর লুইয়ের এস্টেট খুঁজে বার করতে। ৫ তারিখ, রবিবার, সবে সকালের প্রার্থনা সেরে নিজের ঘরে বসে অর্ধেক লেখা নতুন উপন্যাসটায় হাত দেবেন বলে ভাবছেন লুই, নেটিভ ছোকরা চাকরটা এসে জানাল এক সাহেব নাকি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। এই পরবাসে এমন ঘটনা একেবারেই আকস্মিক। ফ্যানি পাশের ঘরেই ছিলেন। তিনিও অনাহূতের মতোই চললেন লুইয়ের পাশাপাশি, আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করতে।

বসার ঘরের কৌচে বেশ হাত পা ছড়িয়েই পিছন ফিরে বসে ছিল লোকটা। এই বাড়ি যেন কতদিনের চেনা। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। লুই ঘরে ঢুকে "এক্সকিউজমি" বলতেই উঠে ঘুরে দাঁড়াল। হেসে বলল, "আপনি আমায় চিনবেন না। আমার নাম ম্যানুয়েল ডিব্যাসি। আমি লন্ডন থেকে আসছি। হিউড র‍্যাডির ব্যাপারে কথা বলতে।"

ফ্যানি পরিষ্কার দেখতে পেলেন লুইয়ের মুখে তীব্র আতঙ্কের ছায়া। সারা মুখ রক্তশূন্য হয়ে মোমের মতো সাদা। হাত পা কাঁপছে। কোনওমতে ফ্যানিকে নির্দেশ দিলেন, "তুমি যাও। আমি কথা বলছি।" ফ্যানি অনড়। এবার প্রায় চিৎকার করেই লুই ফ্যানিকে বললেন, "কথা শুনছ না কেন? যেতে বলছি, যাও এখান থেকে।" একেবারে অপরিচিত ব্যক্তির সামনে এই অপমান ফ্যানির সহ্যের বাইরে। কোনওমতে কান্না চেপে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দেন ফ্যানি।

আগন্তুক কোনও কথা বলে না। হাসিমুখে গোটা ঘর ঘুরে দেখতে থাকে। লুইও কিছু বলেন না। শুধু তাঁর ভীত দৃষ্টি আগন্তুককে অনুসরণ করে চলে।

"সব মিলিয়ে কতটা জমি নিলেন এখানে?" আগন্তুক প্রশ্ন করে।

"৩১৩ একর", কাঁপা গলায় উত্তর দেন লুই।

"৩+১+৩, মানে ৭। বাহ, খুব ভালো। তা আলোচনাটা এখানেই করব? না অন্য কোনও ঘরে? একান্তে?"

"আমরা নিচের সেলারেগিয়ে কথা বলতে পারি।"

"বেশ। তবে তাই হোক।"

সামোয়াতে ডিসেম্বর মাসে গরমকাল। তবুও মাটির নিচের এই সেলারটা বেশ ঠান্ডা। সেখানেই একটা টুল টেনে বসে পড়ে আগন্তুক। লুই বসেন না। আগন্তুক যেন মদের বোতল দেখতেই এসেছে, এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বোতল দেখতে থাকে। তারপর বলে, "বার্গান্ডি মদের ভালো কালেকশান বানিয়েছেন তো!"

"হ্যাঁ, আমার প্রিয়।"

"তাই বুঝি! তাহলে দেখছি আপনি ব্রাদারহুড ছেড়ে পালালেও ব্রাদারহুড আপনাকে ছাড়েনি।"

"কেন এমন বলছেন?"

"এই যে ৩১৩ একর জমি কেনা, সেলারে বার্গান্ডি মদ রাখা...বার্গান্ডি রং যে মাস্টার ম্যাসনের রং, সাধু ওরিজেনের আলখাল্লার রং, সে কি আপনি জানেন না?"

"আমি এত ভাবিনি।"

"তাই বুঝি? কিন্তু এবারে আপনাকে একটু ভাবতে হবে যে।"

"কী ভাবব?"

"ব্রাদারহুডের একেবারে গোপনতম তথ্য আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। সত্যি বলতে আপনিই সবটা দেখেছিলেন। দেখানোর পিছনে কারণ ছিল। আপনাকে

বলা হয়েছিল গোটা ঘটনাকে রূপকথার মতো লিখতে; যাতে কিছুতেই মানুষ বিশ্বাস না করে আদতে এমনটা হতেও পারে। "

"আমি তো তাই করেছি।"

"না, করেননি", আগন্তকের গলা চড়তে থাকে, "রূপকথা মানে সত্যকে গোপন করা। আসল মানুষদের নাম প্রকাশ করে দেওয়া না।"

"কিন্তু আমি তো তা করিনি", মিনমিনে গলায় বলতে চান লুই।

"করেননি, তাই না?" প্রায় হুংকার দিয়ে বলে আগন্তুক, "এলি হেনকি জুনিয়র আর হেনরি জেকিলের মিল আমরা যখন ধরতে পেরেছি, বাকিরা পারবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এডওয়ার্ড হাইড! মশাই আপনার সাহসের তারিফ করতেই হয়।" পকেট থেকে একটা ছোটো নোটবই আর পেনসিল বার করে লোকটা খসখস করে লিখল,

Elly Henky Jr. — Hewed Raddy

Henry Jekyll — Edward Hyde

"বলুন কী বলবেন?"

উত্তর দেবার মতো কিছু নেই। চুপ করে রইলেন লুই।

"যাই হোক, এসব বাজে কথা বলতে আমি আসিনি। এসেছি যা নিতে, সেটা আমায় দিয়ে দিন। আমি চুপচাপ চলে যাব।"

"কী নিতে এসেছেন আপনি?"

"বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা তবে বুঝিয়েই বলি। গায়েব হবার আগে হিলি আপনাকে যে দুটো জিনিস দিয়ে গেছে, সে দুটো।"

"কে হিলি? আমাকে কী দিয়ে গেছে?"

"আপনি হিলিকে চেনেন না?"

"নাহ। জীবনে নাম শুনিনি।"

"কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে, ইংল্যান্ডে ফিরে সে প্রথম গেছিল বার্নমাউথে। যেখানে আপনার বাড়ি ছিল এককালে। আর মজার ব্যাপার, তার

মাসখানেকের মধ্যে আপনিও কাউকে কিছু না জানিয়ে গা ঢাকা দিলেন এই দ্বীপে। এই দুইয়ে দুইয়ে চার আমরা করতে পারি না ভেবেছেন?”

“শুনুন, প্লিজ মন দিয়ে শুনুন। কোথাও একটা বিরাট ভুল হচ্ছে। আমি এসবের কিচ্ছু জানি না। যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা একান্তই কাকতালীয়।”

“নেহাতই যখন জানেন না, তখন শুনুন। এই হিলি আগে ডাক্তার হেনকির ল্যাবরেটরিতে কাজ করত। একদিন সে আচমকা গায়েব হয়ে যায়। তারপর যখন তার খোঁজ পাই, তখন সে ভারতে। ভারতে তার নানা কার্যকলাপে আমরা নিশ্চিত হই যে আমাদের সন্দেহ সঠিক।”

“কী সন্দেহ?”

“পালাবার আগে ডাক্তার হেনকির সেই আবিষ্কারের ফর্মুলা আর সেই আরক দুটোই চুরি করে পালায় হিলি। গোটা ব্রাদারহুড ও দুটো খুঁজছে।”

“হিলি এখন কোথায়?”

“কেউ জানে না, বললাম তো। শেষ জানা অবধি তাকে বার্নমাউথে দেখা গেছে। এরপরেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। হিলি কিছুদিন ভারতে ছিল। সেখানে হেনকির শিষ্য হ্যালিডে গেছিল আরকের খোঁজে। হ্যালিডে খুন হয়েছে। আর সেই আরক আর তার ফর্মুলা যেন হাওয়ায় উবে গেছে। যদি কারও হাতে সেটা পড়ে, আর সেটার সঠিক ব্যবহার সে না জানে, তবে অনর্থ হয়ে যাবে। এখনও তেমন কিছু হয়নি। এর মানে একটাই। এটা এমন জায়গায় আছে, যার খোঁজ সভ্য সমাজের কাছে নেই। সেটা আপনি ছাড়া কেউ হতে পারে না।”

“বিশ্বাস করুন, আমি এসবের কিছুই জানি না।”

“মনে করুন। মনে করার চেষ্টা করুন। এত বড়ো একটা আবিষ্কার পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে, এমনটা তো হতে পারে না।”

“মুছে যাবে কেন? ডাক্তার হেনকি তো জীবিত। নিশ্চয়ই তাঁর মনে আছে। তিনি আবার বানিয়ে ফেলবেন সেই আরক।”

খানিক চুপ করে বসে থাকল সেই আগন্তুক। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "ডাক্তার হেনকি এখন অসুস্থ। শারীরিক না মানসিক। ভিয়েনার এক ডাক্তার ফ্রয়েড তাঁকে পরীক্ষা করে বলেছেন, অদ্ভুত এক রোগ হয়েছে তাঁর। নাম ডিসোসিয়েটিভ অ্যামনেশিয়া। এতে রোগীর সবকিছু মনে থাকে। শুধু কোনও নির্দিষ্ট ঘটনা বাদে। ডাক্তার হেনকির বেলাতেও তাই হয়েছে। এই আরক তৈরি সম্পর্কে যা কিছু, সব তাঁর মস্তিষ্ক থেকে মুছে গেছে চিরকালের মতো। এখন আমাদের হাতে না আছে সেই আরক, না আছে তা বানানোর কৌশল। সুতরাং বুঝতেই পারছেন মিস্টার স্টিভেনসন, আপনার সাহায্য কতটা দরকার।"

"কিন্তু আমি অপারগ। আমি এর কিচ্ছু জানি না।"

"আমাদের বাঁকা পথ নিতে বাধ্য করবেন না মিস্টার স্টিভেনসন। দরকারে আমরা তাও নিতে পারি। বোস্টনে আপনারই মতো এক লেখক বেশ কয়েক বছর আগে ব্রাদারহুডের সমস্ত তথ্য জানিয়ে দেবার ধমকি দিয়েছিল। তার শেষ পরিণতি জানেন নিশ্চয়ই?"

"পো?" কোনওক্রমে উচ্চারণ করলেন লুই।

"এই তো, জানেন দেখছি। তারপর ছড়িয়ে দেওয়া হল ভূতে পো-কে খুন করেছে। সেই রহস্যের সন্ধান আজও হয়নি। আপনিও সেরকম কিছু চান না নিশ্চয়ই। আগামী কাল সন্ধ্যার পর আমি আবার আসব। যা যা চাই, খুঁজে বার করে রাখবেন। এবার কিন্তু আমি না শুনতে আসব না। আসি তবে।" এই বলে সেলার থেকে একটা ভিন্টেজ বার্গান্ডি মদ বার করে বগলে পুরে চলে গেল লোকটা।

সেদিন সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারেননি লুই। চোখ বন্ধ করলেই ভেসে আসছে কবেকার সেই অন্ধকার ঘরের আসরের ছবি, হেনকির মুখ আর টেস্টটিউবে বার্গান্ডি রঙের লাল আরক। পরদিন সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্ত হতেই অস্থির হয়ে উঠলেন লুই। বারবার তাকাতে লাগলেন সদর দরজার দিকে। সারাদিন কিছু দাঁতে কাটেননি। ডিনারের টেবিল সাজানো হয়েছে। নেটিভ

ছেলেটা বার্গান্ডি মদের বোতল আনার পরে নিজেই কর্ক খুলে এক চুমুক খেয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন লুই, "এ আমার কী হল? এমন অদ্ভুত লাগছে কেন সারা দেহে?" ফ্যানির দিকে চেয়ে বললেন, "দ্যাখো তো আমার মুখটা বদলে যাচ্ছে কেন?" বলেই ঢলে পড়লেন টেবিলে। সেই তাঁর শেষ কথা। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে রহস্যজনক মৃত্যু হল রবার্ট লুই স্টিভেনসনের।

দুইদিন পরে সামোয়াতেই কবর দেওয়া হল তাঁকে। পত্রিকায় ছাপা হল অবিচুয়ারি। তাতে যা লেখা হল না, তা হল একগাদা নেটিভের সঙ্গে লুইয়ের শেষ শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন গুটিকয় ইউরোপিয়ান সাহেব। তাঁদের একজন, বেঁটেখাটো, মাথায় টপ হ্যাট, এই এলাকায় একেবারেই অপরিচিত। তিনি নিজেকে পরিচয় দিলেন লুইয়ের পুরোনো বন্ধু হিসেবে।

সবশেষে ভিজিটার্স ডায়রিতে সই করার সময় 'ম্যানু' লিখেই ঘসঘস করে কেটে লিখলেন, 'পল সিউডোম্যান'।

একাদশ পরিচ্ছেদ— কথোপকথন

"আমি তোমার সঙ্গে একলা কিছু কথা বলতে চাই তুর্বসু", বলল অপর্ণা।

"না। যা বলার আমার সামনেই বলুন।" আমি কিছু বলার আগেই চাপা কিন্তু স্পষ্ট প্রতিবাদ ভেসে এল উর্ণার গলা থেকে। "এতদিন অনেক অন্ধকারে ছিলাম।এবার আমি সব কিছু জানতে চাই।"

"কিন্তু সেই জানা তোমার পক্ষে সহ্য করা মুশকিলও হতে পারে। বুঝতে পারছ তো?"

আবার চোখের জল মুছে প্রায় ইস্পাতকঠিন গলায় উর্ণা বলল, "তা হোক। আমি সহ্য করে নেব। আপনাকে সেটা ভাবতে হবে না।"

উর্ণার গলার শ্লেষকে উপেক্ষা করেই অপর্ণা এবার উর্ণার মায়ের দিকে তাকাল। উনি মাথা নিচু করে বসে আছেন। অপর্ণার বর্তমান স্বামী সুতনু বরং "আমি একটা সিগারেট খেয়ে আসি" বলে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে এখন আমরা চারজন। চারজনই চুপ। অপেক্ষা করছি কে প্রথম কথা বলে।

বলল অপর্ণাই।

"প্যারামাউন্টে তোমার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হবার সময় আমি সজ্ঞানে কিছু মিথ্যে বলেছিলাম। আসলে তুমি যে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত, এই বাড়িতেই থাকো, সেটা আমার জানা ছিল না। কিন্তু এখন যা বুঝতে পারছি, তোমার গোটা ঘটনাটা জানা উচিত। না হলে তুমিও অন্ধকারে থেকে যাবে।"

আমি কিছু বললাম না। বলার কিছু নেইও।

খানিক চুপ থেকে আবার শুরু করল অপর্ণা, "এতদিনে তুমি নিশ্চিতভাবে নীবারের নাম জেনেছ। প্রায় একশো বছর আগে কলকাতার ফ্রিম্যাসনদের মধ্যে একটা ভাঙন ধরে। সেটা ঠিক কী নিয়ে, আমিও জানি না। তবে ম্যাসনদের মধ্যে অনেকেই ব্রাদারহুড ছেড়ে দেয়। কিছু ব্রাদার নীবার নামে এক গোপন সংগঠন তৈরি করে।"

"আপনি এত কিছু জানলেন কী করে?"

"বাবার মুখে শুনেছি। তোমাকে শুরুতেই বললাম না, আগের দিন কিছু মিথ্যে কথা বলেছি....দেবাশিসের সঙ্গে আমার জীবনানন্দ সভাঘরে দেখা হয়নি। হয়েছিল আমার নিজের বাড়িতে। দেবাশিসের বাবা ছোটোবেলাতেই মারা গেছিল। দেবাশিস আর তার মায়ের দায়িত্ব নীবার নিয়েছিল। সেই সূত্রেই..."

"মানে দেবাশিসদাও নীবারের সদস্য ছিলেন?"

"হ্যাঁ। বুদ্ধিমান ছেলে, কথাবার্তায় ভালো। আমার পছন্দ হয়ে যায়। বাবা তখন বেঁচে। আমি বাবাকে বলি। বাবার ইচ্ছে ছিল না।"

"কারণ?"

“জানি না। শুধু বলতেন যতই ছেলে ভালো হোক, ওর রক্তের দোষ আছে।”

“সেটা ঠিক কী বলতে পারেন?”

“না। বাবা বলেননি। আমি গোপনে দেখা করতাম। সম্পর্ক রাখতাম। এমন চলল মাস দুই। তারপর বাবা একদিন আচমকা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। আমার আর দেবাশিসকে বিয়ের পথে কোনও বাধা রইল না।”

“আপনার মা কিছু বলেননি?”

অপর্ণা চুপ থেকে তার মায়ের দিকে তাকাল। ভদ্রমহিলা আমি আসা অবধি একটাও কথা বলেননি। মাটিতে রাখা কার্পেটের দিকে ঠায় তাকিয়ে বসে আছেন।

একটু গলা খাঁকরে আবার শুরু করল অপর্ণা, “মায়ের বিশেষ কিছু বলার ছিল না। আমার তখন দশ বছর বয়স। মা নিশীথ দত্তের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে আসেন। নিশীথ দত্ত আর আমার বাবা বেস্টফ্রেন্ড ছিলেন। ছোটোবেলায় উনি প্রায়ই আমাদের বাড়ি আসতেন নীবারের কাজে। আমাকে ঘুরতে নিয়ে যেতেন। আদর করতেন। তারপর একদিন সকালে শুনি মা চলে গেছে নিশীথ আঙ্কলের কাছে। আর আসবে না। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে দেননি।”

“আপনি চেষ্টা করেননি?” উর্ণার মার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ওঁর চোখেও জল। “করেছিলাম। অনেকবার করেছিলাম। ফার্গাস চাইত না। নিশীথ-ও অপছন্দ করত।”

“ফার্গাস! আপনার বাবা?”

“হ্যাঁ। তোমায় বলা হয়নি। আমরা আদতে খ্রিস্টান। আমার পুরো নাম অ্যালিস অপর্ণা। বাবা ফার্গাস পবিত্র অ্যাভেরি। মা বিয়ের আগে ছিলেন এলিজা সুপর্ণা। মা সুপর্ণা, আমি অপর্ণা আর ও উর্ণা।”

“কিন্তু নিশীথ দত্ত তো হিন্দু।”

"একেবারেই। ম্যাসনিক ব্রাদারহুডে সবাই যোগ দিতে পারত। ধর্ম দেখা হত না। কেন, তোমার পূর্বপুরুষ, তারিণীচরণ রায়, তিনিও তো হিন্দুই ছিলেন।"

চমকে উঠলাম। তারিণীর কথা অপর্ণা জানল কী করে?

হয়তো আমার মনের কথা জেনেই অপর্ণা বলল, "ব্রাদারহুডের সবাই আজও তারিণীচরণ রায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। তিনি ব্রাদারহুডকে নাকি একবার ভয়ানক বিপদের হাত থেকে বাঁচান। কিন্তু সেটা কীভাবে তা আমার জানা নেই। তুমি জানো না তুর্বসু, তুমি কী বিরাট মানুষের বংশধর!"

শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। একেবারে প্রথম দিন অনেকটা ঠিক এমনই কিছু একটা বলেছিলেন না দেবাশিসদা? এদিকে অপর্ণা বলে চলেছে, "বাবার মৃত্যুর পরে মায়ের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করি। নিশীথ দত্ত বাধা দেননি। দেবাশিসকে বিয়ে করার সিদ্ধান্তে ওঁর সায় ছিল বলেই মনে হয়। আমরা কোর্ট ম্যারেজ করি। মা, আমার এক বান্ধবী আর দেবাশিসের পুলিশ বন্ধু অমিতাভ সাক্ষী দিয়েছিল। তারপরেই আমার দুর্দিন শুরু হয়।"

"কেন?"

"মা, তুমি একটু অন্য ঘরে যাও প্লিজ। আমি এই কথাগুলো তোমার সামনে আলোচনা করতে চাইছি না। আর তুমি তো সবই জানো।"

ঊর্ণার মা কিচ্ছু না বলে উঠে চলে গেলেন। অপর্ণা এবার ঊর্ণার দিকে তাকাল।

"আমি থাকব।" কঠিন স্বরে বলল ঊর্ণা।

"বেশ। তবে বলি। বিয়ে ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত জানো। বিয়ের আগে দুইজনেরই মনে নানারকম কল্পনা থাকে, সঙ্গে অবশ্যই যেটা থাকে, সেটা হল শরীরী চাহিদা। বিয়ের প্রথম বছরগুলোতে সেই শরীরের মেলামেশা দুজনের মধ্যে একটা মানসিক বাঁধন তৈরি করে। সেটাই বিয়ে নামের এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠানটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। যদি এই মানসিক বাঁধন কোনও কারণে তৈরি না হয়, তবে একসময় ছেলেটা আর মেয়েটা দুজনেই দ্যাখে তারা আবার বিয়ের

আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। শুধু মাঝখান থেকে বিয়ে নিয়ে তাদের ইলিউশন, তাদের কল্পনাটা ধ্বংস হয়ে যায় একেবারে।"

"আপনাদের বেলাতেও তাই হয়েছিল?"

"আমাদের বেলা যা হয়েছিল, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। আমি ওর কাজকর্ম মেনে নিতে পারিনি। প্রায়ই ঝামেলা হত। ও নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল বেশ্যাপট্টি আর হিজড়াখোলে। আমি উপায় না দেখে আলাদা থাকা শুরু করলাম। আর তখনই ও চরম পথ বেছে নিল।"

"কী পথ?"

"তখন সেপারেশন চলছে। ডিভোর্স হব হব। আমি ওকে ছেড়ে বাবার ফ্ল্যাটে থাকা শুরু করেছি। আমায় ফোন করে আসতে বলল চন্দননগরে। ডিভোর্স নিয়ে না কী সব কথা আছে। আমিও গেলাম। গিয়ে দেখি বিকেলে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। সঙ্গে একগাদা খাবার। মুড ভালো থাকলে ভালো ব্যবহারই করত। বলল একসঙ্গে ডিনার করবে। অনিচ্ছাতেও আমি রাজি হলাম। খাবার মধ্যে কিছু একটা মেশানো ছিল। খেয়ে আমার খুব ঘুম পেতে লাগল। ও আমাকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর আমার আর কিচ্ছু মনে নেই। সকালে যখন উঠলাম, বুঝলাম আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কী সর্বনাশ?"

খানিক চুপ থেকে অপর্ণা বলল, "আমি ঘুম থেকে ওঠার পর দেবাশিস গম্ভীর মুখে মোবাইল খুলে আমাকে দেখাল। আই ওয়াজ রেপড বাই সামওয়ান। নট দেবাশিস। গোটা ব্যাপারটা ও ভিডিও করে রেখেছে।"

"যে করেছে তাকে চিনতে পারলেন?"

"নাহ। ভিডিওটা দেখার প্রবৃত্তি হয়নি। দেড় মাস বাদে বুঝলাম আমি প্রেগন্যান্ট।"

"তবে এই বাচ্চার বাবা..." আমি অপর্ণাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম।

"জানি না। আর দেবাশিস মরে গেছে। এখন আর জানা সম্ভব না।"

“সুতনু জানেন?”

“ও সব জানে।”

“উনি কিছু স্টেপ নিতে বলেননি? এ তো একরকম রেপ।”

“নাহ! তখন অলরেডি উই ওয়্যার ইন রিলেশনশিপ। ও অ্যাডভাইস করল এসব করলে কাদা ছোড়াছুড়িতে আমাদের সম্মান নষ্ট হবে। পরে পেটে বাচ্চা এলে সুতনু বলল, ও নিজেই বাবার পরিচয় দেবে। ওর মতো মনের মানুষ হয় না।”

“বুঝেছি। কিন্তু আমাকে এসব বলার কারণ কী?”

“এই দ্যাখো, আসল কথাটাই বলিনি। যে কারণে তোমাকে ডাকা। সেপারেশন চলাকালীন আমি মাঝেমধ্যে বিভিন্ন দরকারে ওই বাড়িতে যেতাম। একদিন কিছু কাগজপত্র দিতে গিয়ে দেখি বাড়িতে দেবাশিস নেই, কিন্তু দরজা খোলা। আমি দোতলায় উঠে দেখলাম দোতলায় বাথরুমের পাশে ইট বালি সিমেন্ট মেখে কীসব কাজ হচ্ছে। মিস্তিরিদের জিজ্ঞেস করায় ওরা বলল। ঘরের কাজ হচ্ছে। একইরকম কাজ বাড়ির পিছনদিকটাতেও হচ্ছিল। আমি আগ্রহী হয়ে কিছু দেখার আগেই দেবাশিস চলে আসে। প্রথমে বেশ রেগে যায়, কেন আমি ওকে না জানিয়ে এসেছি। তারপর আমাকে নিয়ে বাইরে চলে যায়। একটা কফিশপে বসে মিনিট পাঁচেকের কথা হয়। ও বলে বাথরুম রিপেয়ার হচ্ছে। কিন্তু আমি যতদূর জানি, বাথরুম যথেষ্ট ঠিক ছিল। রিপেয়ারের দরকার নেই। আমার ধারণা ও বাথরুমের পিছন দিকে কোনও ঘর বানিয়েছিল। গোপনে। আজ আমাকে মা ফোন করে জানালেন, পুলিশ নিশীথ আঙ্কলকে ধরে নিয়ে গেছে দেবাশিসকে খুনের অভিযোগে। প্রমাণ বলতে সিসিটিভি ফুটেজ। পুলিশ ওঁকে অকারণে ফাঁসিয়ে দেবে। তুমি ভাই প্লিজ একটু নিজের মতো করে তদন্ত করো।”

"ঠিক আছে, আমি দেখছি। আর একটা প্রশ্ন। আপনি বললেন দেবাশিস গুহরা নীবারের সদস্য ছিলেন। তবে তো নিশীথকাকুর মতো ওঁরাও হিন্দু হয়েও ব্রাদারহুডের সদস্য। "

এবার হেসে ফেললেন অপর্ণা।

"দেবাশিসের শয়তানি তুমি আর কতটা জানবে? এতদিন এত কথা হয়েছে আর নিজের আসল নামটা জানায়নি? আমার মতো ও নিজেও অ্যাংলো। কিন্তু হিন্দু সেজে থাকত। হিন্দু পরিচয় দিত। যাতে অপরিচয়ের বাধা না থাকে। নিজের নামটা জাস্ট উলটে বঙ্গীকরণ করে নিয়েছিল ও।"

আমার মাথা বনবন করে ঘুরছে। "তাহলে দেবাশিস গুহের আসল নাম কী?"

"গুয়াফি ডিবাসি। গুয়াফি নামে আগুন, জানো নিশ্চয়ই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ— হিন্দুস্থানের যাত্রী

২৭ নভেম্বর, ১৮৯৫, কলকাতা

সাদাম্পটন থেকে এক ঝকঝকে ভোরে ছেড়েছিল ছোট্ট যাত্রীবাহী জাহাজ 'হিন্দুস্থান'। পথে ভয়ানক ঝড়। জাহাজ প্রায় ডোবেডোবে। স্বয়ং ক্যাপ্টেন অবধি ভয় পেয়ে গেছিলেন। আর তখনই তিনি দেখেছিলেন লোকটাকে। বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। এই চরম ঝড়ের মধ্যেও ডেকে দাঁড়িয়ে ঝড়ের তাণ্ডব উপভোগ করছে। নেহাত পাগল না হলে কেউ করে না। ক্যাপ্টেন প্রথমে এক খালাসিকে পাঠালেন, লোকটাকে ভিতরে নিয়ে আসতে। সে বেচারা হতোদ্যম হয়ে ফিরে এল। এবার ক্যাপ্টেন নিজে গেলেন। এসব পাগলামোর অর্থ হয় নাকি! লোকটাকে বলতে লোকটা অদ্ভুত ঠান্ডাগলায় উত্তর দিল, "আমি এখানেই থাকব। আমার কিছু হবে না।" লোকটার চোখে, হাবভাবে আর গলার স্বরে

এমন কিছু একটা ছিল যে ক্যাপ্টেন ভয় পেয়ে ফিরে এলেন। সত্যিই ধীরে ধীরে ঝড় কমে এল। লোকটাও ঢুকে পড়ল নিজের কেবিনে। যেন এই ঝড় থামাতেই ওকে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

চাঁদপাল ঘাটে জাহাজ ভিড়তেই একদল ফড়ে ঘিরে ধরল সাহেবদের। এদের কাজই খদ্দের পাকড়াও করা। পুঁজি বলতে ভাঙা ভাঙা ইংরাজি। তাতেই তারা নবাগত সাহেবদের জুগিয়ে দিত প্রাথমিক মাথা গোঁজার ঠাঁই, নিয়ে যেত কাছের পাঞ্চ হাউস আর ট্যাভার্নে। লালবাজার আর বউবাজার এলাকায় ডেরা বাঁধত তারা। ফড়েরা ঘরে এনে উপস্থিত করত "বিউটিফুল ইন্ডিয়ান গার্ল"। মাথায় বুদ্ধি না থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই কপর্দকশূন্য হয়ে ভিখারির দশা হত সাহেবদের। কিন্তু এদের মধ্যেই টপ হ্যাট পরা এক সাহেবকে দেখে একেবারে আনকোরা মনে হলেও তার চোখেমুখে অন্যদের মতো বিস্ময় নেই। সে যেন আগে থেকেই জানে, সে কী করতে এসেছে, কোথায় যাবে। দুই-একজন ফড়ে তার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছিল। লোকটা কাউকে পাত্তা না দিয়ে সোজা হেঁটে চলল স্ট্যান্ড রোডের দিকে, যেন এই পথ কতদিনের চেনা। ঠিক এই সময় এক ফড়ে একটা ভুল করল। উত্তেজনার বশে "ও সাহেব" বলে তাঁর কোর্টের কোনা ধরে দিল টান। সাহেবের হাতের লোহা বাঁধানো লাঠির প্রথম ঘা পড়ল তার পেট বরাবর। সে পেট ধরে নিচু হতেই একের পর এক ঘা। মাথা, পিঠ, থুতনি, কোমরে। লোকটা ব্যথায় শুয়ে পড়ল কাদায়। কেঁদে বলতে লাগল, "রক্কে করো, রক্কে করো সায়েব। আমার ভুল হয়েছে। আর করব না, আর জীবনে এই ভুল করব না।" চারিদিকে ভিড় জমে গেছে। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। আরও দু-চার ঘা মেরে সাহেবের শান্তি হল। লোকটার মুখে একদলা থুতু ফেলে "ব্লাডি নেটিভ" বলে সোজা একটা ব্রুহাম গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সাহেব। তারপর, যেন নিজের গাড়ি, এমনভাবে দরজা খুলে ঢুকে বসে পড়ল। মাথার টপ হ্যাটটা রেখে দিল পাশের গদিতে। কোচোয়ান

এতক্ষণ সব দেখছিল। সেও কিছু বলার সাহস করল না। খানিক বাদে ভিতর থেকে নির্দেশ এল "গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল।"

"ওহ!! উইলসন সাহেবের হোটেল?" মনে মনে বলে ঘোড়াছুটিয়ে দিল কোচয়ান।

মধ্যখণ্ড- সংশপ্তক

লখনের কথা

১।

4 জানুয়ারি, ১৮৯৩, চন্দননগর

কলকাতার তুলনায় চন্দননগরে ঠান্ডাটা প্রতিবার একটু বেশিই পড়ে। বিশেষ করে ভোরের দিকে। রাস্তাঘাট প্রায় নির্জন। খানিক বাদে বাদে দূর থেকে শুধু তোপের আওয়াজ শোনা যায়। এই তোপ শুনেই অনেকে ঘড়ি মেলান। ভারতের অন্য তিন ফরাসি উপনিবেশের মতো চন্দননগরও এখন পন্ডিচেরির অধীন। এক গভর্নর আছেন বটে, তবে তিনি পন্ডিচেরি ছেড়ে বিশেষ আসেন না। এখানে এক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছেন, তিনিই সব দেখাশোনা করেন। ইদানীং এই ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোপ দাগা, নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পরামর্শেই করা হয়েছে।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। চন্দননগরে তাঁর অবদান বড়ো কম নয়। চন্দননগর সেমিনারি স্কুল তাঁর হাতেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেসব যেন কত জন্ম আগেরকার কথা। দশ বছর হল সরকারি শিক্ষাবিভাগের সর্বোচ্চ পদ স্বেচ্ছায় ছেড়ে তিনি চন্দননগরের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন। লোকে জানে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ভূদেব নিশ্চিত, একমাত্র উচ্চ রক্তচাপ বাদে তাঁর শরীরে কোনও সমস্যা নেই। অকালে চাকরি ছাড়ার পিছনে প্রধান কারণ দুটি- এক, সাহিত্যচর্চায় মন দেওয়া, আর দুই, যেটা প্রধান, ব্রাদারহুডের দায়িত্ব পালন।

কলকাতায় ফ্রিম্যাসনরি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বাহাদুরের সন্দেহের তালিকায় চলে আসেন তাঁরা। তাঁদের অগোচরেই খোচড় লাগানো হয় প্রায় প্রত্যেকের পিছনে। সামান্যতম সন্দেহ হলেই অকারণে ধরপাকড়, এমনকি সাজা দিতেও সরকার কসুর করত না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, ইংরেজ রাজপুরুষদের অনেকেই ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন। অথচ তাঁদের সাত খুন

মাফ। কোপ এসে পড়ত দেশি ব্রাদারদের ঘাড়ে। মুখে যতই সবাই সমান বলা হোক না কেন, সাদা চামড়ার ইংরেজদের সমান যে এই দেশের কালা নেটিভরা কখনোই হতে পারবে না, সেটা ভূদেব বুঝেছিলেন। আর বুঝেছিলেন বলেই কলকাতার ইংরেজদের অধীনতা ছেড়ে ফরাসি চন্দননগরে এসে ঠাঁই নিয়েছেন। ফরাসি সরকারের অগোচরে তাঁদের কাজকর্ম চলে। এখানে সরকারও অবশ্য অনেক ঢিলে। তাঁদের উৎসাহ বা আগ্রহ কিছুই নেই। আর থাকবেই বা কেমন করে? তাঁদের অংশীদারি কমতে কমতে এখন মাত্র ষাট বিঘায় এসে ঠেকেছে। বাকি জমির জন্য ইংরেজরা রীতিমতো রাজস্ব নিয়ে থাকে। আর এই রাজস্ব আদায়ের জন্যেই ফরাসি সরকার দেশিমদ, , গুলির আড্ডা, তুরং-এ খোলা ছাড়দিয়ে রেখেছেন। এইরকম জায়গায় ব্রাদারহুডের কাজকর্ম চালানো সহজ। ভূদেব বুদ্ধিমান। তিনি অনেক আগেই সেটা বুঝে এখানে ম্যাসনিক ব্রাদারহুডের এক গোপন সমিতি বানিয়েছেন। তাতে মূলত দেশি, অ্যাংলো আর কিছু ফরাসিদের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজরা এর খবর জানে না।

সেদিন সকালে ভোর ছটার তোপ পড়তে না পড়তে বাড়ির চাকর এসে খবর দিল কয়েকজন নাকি তাঁকে খুঁজছে। এত সকালে? একটু অবাক হয়ে যান ভূদেব। এই সময় তাঁর স্নান আহ্নিকের সময়। এখন তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না। এমনকি খুব প্রয়োজন না থাকলে ঘরের কারও সঙ্গে কথাও বলেন না। তিনি চাকরকে হাত নেড়েইশা রায় জানিয়ে দিলেন, "পরে আসতে বল।" চাকর চলে যেতে গিয়েও কী যেন ভেবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভূদেব বিরক্ত হলেন। এবার আর চুপ করে থাকা গেল না। একটু রেগেই বললেন, "যেতে বললাম তো! দাঁড়িয়ে আছিস কেন?" চাকর একটু আমতা আমতা করে বললে, "আজ্ঞে তিনজন এয়েচেন। এক কালোপানা ভদ্দরনোক। সঙ্গে এক মেয়েছেলে আর এক দুধের শিশু। দেকে মনে হল মেমসায়েবের বাচ্চা। আমি অনেক করে বললুম, বাবু একন দেকা করবেননি। তা শুনলে না। বললে নাকি খুব দরকার। একনদেকা না হলে অনত্থ হবে।"

ভূদেবের ভুরু কুঞ্চিত হল। এত সকালে মেয়েমানুষটিই বা কে? সঙ্গে আবার শিশু কেন?

"ওঁদের বৈঠকখানায় বসিয়ে রাখ। আমি আসছি।" বলে বাসি ধুতি, কাপড়ছেড়ে নতুন কোরা ধুতি পরলেন ভূদেব। মাইকেল মধুসূদনের এই সহপাঠী হিন্দু কলেজে পড়াকালীনই কিছু বাবুয়ানি আয়ত্ত করেছিলেন। এই আটষট্টি বছর বয়সেও সেইসব অভ্যেস তাঁকে ছেড়ে যায়নি।

বসার ঘরে ঢুকে একটু চমকে গেলেন ভূদেব। সাহেবি পোশাক পরে কালো যে যুবকটি বসে আছে, তাকে কোথাও দেখেছেন। কোথায়, তা কিছুতেই মনে করতে পারলেন না। তার এক হাতের আঙুলের ডগাটা নেই। সঙ্গে স্নান মুখের সুন্দরী এক তন্বী। তার পরনেও বিলিতি পোশাক। মেয়েটির ঠিক পাশে কৌচে অপরূপা একটি চার-পাঁচ বছরের ইউরোপীয় শিশু বসে আছে। শিশুটির পোশাক মলিন। কিন্তু লাল চুল আর নীল চোখে অদ্ভুত আভিজাত্যের ছাপ। এমন দেবশিশু যেন ভূদেবের এই জমকালো বৈঠকখানাতেও বেমানান। ভূদেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে দুজনেই উঠে হাতজোড় করে প্রণাম করল। শিশুটি একটি কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলছিল। সে গ্রাহ্য করল না।

ভূদেব হাতের ইশারায় তাদের বসতে বললেন। প্রথম কথা বলল ছেলেটিই, "আমার নাম ল্যানসন। লখন। আর এই আমার দিদি মারিয়ানা। আর ওর মেয়ে জিনা। বড়ো বিপদে পড়ে আমরা আপনার সাহায্যের জন্যে এসেছি।" "বিপদ? কী বিপদ?"

"কলকাতায় ইংরেজ সরকার আমাদের খুঁজছে। আমরা কোনওমতে পালিয়ে আপনার কাছে এসেছি।"

"আমার কাছে? কে তোমাদের আমার কাছে পাঠাল? আর তোমরা কী এমন করেছ যাতে সরকার তোমাদের খুঁজছে?"

"একে একে বলি। আমি কলকাতার ব্রাদারহুডের সদস্য। সেখানে আজও আপনার কথা বলা হয়। কীভাবে ব্রাদারহুডের বিপদের দিনে আপনি....."

“থাক সেসব কথা। আসল কথায় এসো। এতদিন বাদে এই বুড়োর কাছে কেন? সমস্যায় পড়েছ যখন, সরাসরি মাস্টার ম্যাসনের কাছে যাওয়াই তোমার উপযুক্ত ছিল।“

“কলকাতার মাস্টার ম্যাসন এই মুহূর্তে আমাদের সাহায্যে অপারগ। আপনি হয়তো পত্রিকায় ইতোমধ্যে খবরটা পেয়েছেন।”

“কোন খবর?”

“করিস্থিয়ান থিয়েটারে দুই জাদুকরের মৃত্যু।”

“হ্যাঁ, তা দেখেছিলাম বটে। কিন্তু তার সঙ্গে ব্রাদারহুডের কী সম্পর্ক?”

“দুটো খুনের একটা, রিচার্ড হ্যালিডে ওরফে চিন সু লিনের খুনটা আমি করেছিলাম। মাস্টার ম্যাসনের নির্দেশে।” ভূদেবের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে যায়। তাও তিনি বিস্ময় চেপে জিজ্ঞেস করেন,“আর অন্যটা?”

“চিফ ম্যাজিস্ট্রেট টমসন সাহেব নিজে।”

“গোটা ব্যাপারটা খুলে বলো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“আমিও গোটাটা জানি না। জানেন শুধু মাস্টার ম্যাসন। আমি যতটুকু জানি, তা বলছি। বিলাতে ফ্রিম্যাসনদের মধ্যে আমাদের একটি শাখা অনেকদিন পর আবার জেগে উঠেছে।”

“তোমাদর শাখা মানে জাবুলনরা। তাই তো?”

“হ্যাঁ। জানি আমাদের সব কাজকর্ম ম্যাসনিক ব্রাদাররা পছন্দ করেন না, তবুও ভিতরে ভিতরে অনেকেই আমাদের পক্ষে আছেন। যেমন আপনি।”

“আমি বুড়ো হয়েছি বাবা। আর বছরখানেক টিকব কি না সন্দেহ। আমাকে আর এই পক্ষে বিপক্ষে টেনো না।”

“আচ্ছা। বেশ। লন্ডনের বেডলাম হাসপাতালের ডাক্তার এলি হেনকি জুনিয়ার কিছু বছর আগে অদ্ভুত একটা আরক বানান, যেটা খেলে সাময়িকভাবে একটা গোটা মানুষ বদলে যায়।”

“মানুষ বদলে যায়! বলো কী? কীভাবে?”

“চেহারায় খুব বেশি বদলায় না। বদলায় স্বভাবে। যে শান্ত, সে হিংস্র হয়ে ওঠে। যে সৎ, সে নির্বিচারে জঘন্যতম পাপ কাজ করে ফেলে। এক কথায় মানুষের চরিত্রের সবচেয়ে অন্ধকার, খল, কপট দিকটা বার করে আনে এই আরক।”

“এ কি রূপকথার গল্প নাকি হে? বিলেতে স্টিভেনসন নামে এক সাহেব এক গল্পকথা লিখেছিলেন। এ যে দেখছি অনেকটা সেইরকম। এও কি সম্ভব?”

“আজ্ঞে না হলে বলছি কেন? ধরে নিন সেই গল্প আসলে গল্প না, সত্যি কথা। সত্যিটাকে চাপা দিতে গল্পের মোড়কে মোড়ানো। মানুষের মনকে বশ করার অদ্ভুত ক্ষমতা এই আরকের। দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে একটাই শুধু চোখে পড়েছে। এই ওষুধের প্রভাবে থাকাকালীন নাকি হাতের চামড়া খসখসে হয়ে যায়, তালু দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে।”

“প্রভাব থাকে কতক্ষণ?”

“আজ্ঞে সেটা আরকের পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। তবে এর প্রভাব ক্ষণকালের। প্রভাব শেষ হয়ে গেলে প্রভাবিত মানুষের মাঝের সময়ের কথা কিছুই মনে থাকে না।”

“ভালো কথা। আজগুবি মনে হলেও আগ্রহ জন্মাচ্ছে। বলতে থাকো।”

“বেডলামের এক কর্মচারী, নাম হিলি, সে এই ওষুধের বাক্স নিয়ে এ দেশে পালিয়ে আসে। প্রথমে কিছুদিন খোঁজাখুঁজি চলে, তারপর খবর পেয়ে বেডলামের ডাক্তার হ্যালিডেও কার্টারের ম্যাজিক শো-তে চিনা জাদুকরের ছদ্মবেশে তার পিছু ধাওয়া করে ইন্ডিয়াতে আসেন।”

“দাঁড়াও দাঁড়াও। ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই। ছদ্মবেশে কেন?”

“আপনি তো জানেন, মহারানি ব্রাদারহুডের কাজকর্ম একটু সন্দেহের চোখেই দেখেন। বেডলামেও তাঁর চর ঘুরে বেড়ায়। তাই লুকিয়ে ছাড়া উপায় নেই। যদিও ইংরেজ গুপ্তচর বিভাগ কীভাবে যেন খবর পেয়ে এক গোয়েন্দাকে কার্টারের দলে গুঁজে দিয়েছিল।”

“কিন্তু আরকের খোঁজে সাত সমুদ্র পেরিয়ে ইন্ডিয়া আসতে গেল কেন? সেই ডাক্তার, এলি হেনকি না কী যেন বললে, সে চাইলেই তো যত ইচ্ছে আরক বানিয়ে দিতে পারত?”

“সেখানেও সমস্যা। সম্প্রতি সেই ডাক্তারের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। আরক বিষয়ে সব কথা তিনি ভুলে গেছেন।”

“কী মুশকিল! আরকের কোনও লিখিত ফর্মুলা তো আছে, নাকি?”

“সেটাও আমরা জানি না। হেনকির স্মৃতিভ্রংশ হবার পর তাঁর সব গবেষণার কাগজ, বই, নোটস হ্যালিডের হাতে আসে। কোথাও নাকি আরক বিষয়ে এক লাইনও লেখা নেই।”

“বলো কী হে! এমন অদ্ভুত আরক... তার ফর্মুলা নেই?”

“নেই বলেই হ্যালিডেকে ছুটে আসতে হয়েছে। যার তার হাতে এই আরক এলে কী ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে ভেবে দেখেছেন?”

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন ভূদেব। “তা তো বটেই। মানুষের মনের উপরে স্বয়ং ঈশ্বরের দখল নেই। আছে শুধু...”

“শয়তানের”, বাক্য শেষ করে বলল লখন। “তাহলেই বুঝছেন, এই আরক হাতে পাওয়া মানে শয়তানের সমান ক্ষমতা লাভ করা। হিলি এত কিছু জানত না। সে শুধু বুঝেছিল এই বাক্স মহামূল্যবান। হিলি এ দেশে ফিরে প্রথমেই বেডলামের প্রাক্তন ডাক্তার উইলিয়াম পামারের সঙ্গে দেখা করে। হেনকির আগে পামার-ই মনোবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন। সেখান থেকে চেনা।”

“পামার? তিনি তো শেষ বয়েসে এখানেই, মানে গোন্দলপাড়ার দিকে থাকতেন। এই তো, গত বছর মারা গেলেন। আমার সঙ্গে ভালো আলাপ ছিল। উনিও?”

“উনি ব্রাদার ছিলেন না। কিন্তু জাবুলনদের কাজকর্ম জানতেন। চাপা সমর্থনও ছিল। উনিই হিলিকে ভুলিয়েভালিয়ে কিছু টাকা দিয়ে ওষুধের বাক্সটা হাত করেন।”

“বাক্সের কথা এ দেশের ব্রাদারহুডের কানে গেল কীভাবে?”

“হিলি সুবিধের লোক ছিল না। বিভিন্ন কুকর্ম করে হরিণবাড়ি জেলে গিয়ে ঢোকে। সেখানেই তার সঙ্গে আলাপ হয় জেকব ওয়ার্নারের। আপনি চিনবেন।”

“হাড়েহাড়ে চিনি। ধরা না পড়লে কালে কালে মাস্টার ম্যাসন হতে পারত।”

“হিলি জেলে থাকাকালীন এই আরকের কথা ওয়ার্নারকে জানায়। দুজনে ঠিক করে জেল থেকে পালিয়ে আবার এই বাক্স হাতাবে। হিলি বোঝে বড্ড কমে রফা হয়েছে। কিন্তু ভাগ্য খারাপ। পুলিশ তাদের তাড়া করে। ওয়ার্নারকে ধরা গেলেও হিলি ধরা পড়েনি।”

“ধরা পড়েনি? কিন্তু আমি তো জানতাম...”

“ভুল জানতেন। হিলিরমতো একজনকে আদালতে দাঁড় করানো হয়েছিল। আসল হিলিকে কেউ বা কারা সরিয়ে দিয়েছিল। কারা কীভাবে এটা করল, সেটা আমাদেরও জানা নেই।”

“ফলে?”

“ফলে আর কী? খুবসম্ভব হিলির থেকেই ব্রিটিশ গুপ্তচরবিভাগের কাছে খবর পৌঁছে গেল। হ্যালিডে যখন আরকের খোঁজে এই দেশে এল, তখন বড়োলাট অদ্ভুত একটা শর্ত দিলেন তাকে। তিনি এই আরক খুঁজে বার করতে সাহায্য করবেন, বদলে তাঁরও একটা উপকার করতে হবে। তাঁর এক পাগল ভাই আছে। পল। যে ওষুধে স্বাভাবিক মানুষ অস্বাভাবিক হতে পারে, তাতে পাগল আবার সুস্থও হয়ে যেতে পারে। হ্যালিডে রাজি হয়নি। কিন্তু হাজার হোক বড়োলাট, তাঁকে চটিয়ে কাজ হাসিল করা মুশকিল। অন্যদিকে তিনি আর পল দুজনেই কলকাতার ম্যাসনরির সদস্য। মাস্টার ম্যাসন নিজে হ্যালিডেকে অনুরোধ করেন বড়োলাটের কথা মেনে নিতে। নিমরাজি হয়ে মেনেও হ্যালিডে কিছু শর্ত দেয়।”

“কী শর্ত?”

“বেডলামে চব্বিশ ঘণ্টা চরের নজরদারিতে এই আরক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব না। এদেশে সেই সমস্যা নেই। হ্যালিডে জানায় খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো কিছুদিন সে অন্য পশুর উপরে পরীক্ষা চালাবে। সফল হলে সত্যিকারের কিছু পাগলের উপরে। যদি দুটোতেই সাফল্য আসে, তবেই সে বড়োলাটের ভাইয়ের উপরে আরক প্রয়োগ করবে।”

“সফল হয়েছিল?

মাথা নাড়ল ল্যানসন। “নাহ।এই আরক একমুখী।এতে মানুষের খারাপ দিকটাই প্রকট হয়। উলটোটা হয়না। পামার মারা যাবার আগে তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র তিনি কলকাতার ম্যাসন হলে দান করে যান। যারমধ্যে সেই বাক্সটাও ছিল। হ্যালিডেকে বাক্সটা দেখাতেই সে বোঝে, এরখোঁজেই তার এদেশে আসা। আগে এটা কেউ খুলে দেখেনি। সত্যি বলতে দেখতে পারেনি।”

“কেন?”

“এ এক অদ্ভুত বাক্স।এতে কোনও তালাচাবি নেই। বিশেষ একজায়গায় চাপ দিলে বাক্স আপনি খোলে। আর খুললেই সেখান থেকে ভূত বেরিয়ে আসে।”

“ভূত?” এবার সত্যিই চমকে গেলেন ভূদেব। “ভগবান, ভূত, শয়তান, কিছুই ছাড়ছ না যে! এরপরেও বলছ তোমার কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?”

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলছিল ল্যানসন। ভূদেববাবুর চাকর এসে জল মিষ্টি দিতে গেলাস তুলে একটু জল খেয়ে আবার শুরু করল।

“আজ্ঞে, এ ভূত সে ভূতনা। বাক্সের ভিতরে চারটে বোতল আছে। অদ্ভুত চারটে লেবেল চারটে বোতলের গায়ে। B, H, U আর T। কারণ জানিনা।নম্বর হিসেবেও এদের পরপর মেশাতে হয়।”

“তুমি এতসব জানলে কীভাবে?”

মৃদু হাসল লখন, "এই যে আমার দিদিকে দেখছেন, মারিয়ানা, ওর একটা অন্য নাম আছে। ময়না। যেমন আমার লখন। এই দেশের নেটিভদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হলে আমাদের নেটিভ নাম নিতে হয়।"

"দিদি বলছ, কিন্তু..."

"চেহারায় কোনও মিল নেই। তাই তো?" মাথা নিচু করে ল্যানসন বলল, "আমার মা কলিঙ্গবাজারে কাজ করতেন।" নিজেদের ছোটোবেলার কথা বলে গেল লখন। বলল উইলিয়াম সেটনের ময়নাকে অপহরণের কথা। কেমন করে ওয়ার্নার আর ব্রাদারহুডের সাহায্যে ময়নাকে উদ্ধার করল তার আখ্যান। ক্লাইভ স্ট্রিটের গোয়েন্দা ড্রিসকল সাহেবও অনেক সাহায্য করেছেন ময়নাকে ফিরে পেতে। তাঁর তোলা গোপন ছবি সেটনের শ্বশুরকে দেখিয়েই সেটনকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। ভূদেব মানুষটি দেখতে যতই কঠিন হোন না কেন, মন তাঁর একেবারে কোমল। তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠল। অজান্তেই নিজের কেদারা থেকে উঠে তিনি ময়নার মাথায় হাত রাখলেন। ময়নাও কাঁদছে। এইটুকু মেয়ে, কত কী না সইতে হয়েছে তাকে। শিশুটিও অবাক হয়ে মায়ের দিকে চেয়ে।

"আর এই মেয়ে?"

"ধরে নিন ঈশ্বরের দান।" ধরা গলায় বলে ল্যানসন।

ভূদেব বুঝলেন এঁর পিতৃপরিচয় জানতে চাওয়া মানে ময়নাকে আরও কষ্ট দেওয়া। তিনি আর কথা বাড়ালেন না। শিশুটির মুখের দিকে চেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি বুড়ো মানুষ। আমি কেমন করে তোমাদের সাহায্য করতে পারি?"

"সেটা বলতেই এতগুলো কথা বলা। আমার বলা শেষ হয়নি। সাহেবদের পরীক্ষা করার জন্য পাগল নিয়ে আসা হত ডালান্ডা হাউস থেকে। কেউ সে আরক সহ্য করতে পারত, কেউ পারত না। মারা যেত। এ নিয়ে কাগজে বেশ হইচই শুরু হলে ডালান্ডা হাউস থেকে পাগল আনা বন্ধ হয়ে যায়। সোনাগাজির

গলিতে একটা বাড়িতে এই পরীক্ষা চলত। সাহেবদের সাহায্য করত ময়না। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন না, আমি কীভাবে সব জানলাম? ময়নাই সব জানিয়েছে। একদিন বড়োলাট নিজে জানালেন, অনেক হয়েছে, এবার সরাসরি তাঁর ভাইয়ের উপরে আরক প্রয়োগ করতে হবে। হ্যালিডে কিছুতেই রাজি হয়নি। তাকে ভয় দেখানো হয়। বলা হয়রানির এক চর তার দলে তার সঙ্গেই এসেছে, বড়োলটি জানেন। হ্যালিডে কথা না শুনলে মিথ্যে মামলায় তিনি হ্যালিডে সহ সবাইকে ফাঁসিয়ে দেবেন। তিনি বড়োলাট। তাঁর কথাই শেষ কথা। হ্যালিডে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর তারপরেই আসে সেই ভয়ানক সন্ধ্যা।"

"কী হয়েছিল সেদিন?"

"সোনাগাজির সেই বাড়িতে সেদিন আমাদের সবাইকে ডাকা হয়। সকালবেলাতেই গোপনে বড়োলাটের ভাই পলকে নিয়ে আসা হয়েছিল। পলকে ঘুমপাড়ানি ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হল। ঠিক হয় সন্ধের কিছু আগে পলের ঘুম ভাঙাতে হবে। এই আরক গিলে খেতে হয়। অন্য কোনওভাবে দেহে প্রবেশ করালে কাজ হয় না। আমার এখনও মনে আছে। সেই ঘরে আমি ছিলাম, মারিয়ানা ছিল, আর ছিল পল, হ্যালিডে আর কার্টার। আর কেউ না। বড়োলাট ঢুকলেন। তবে সাধারণ ছ্যাকরাগাড়িতে। ছদ্মবেশে। পলকে জাগানো হয়েছে আধঘণ্টা হল। বড়োলাট হ্যালিডেকে নির্দেশ দিলেন আরক দিতে। সিসার লাইনিং দেওয়া বাক্সটা খুলে সব মিশিয়ে একটা সবুজ রঙের মিশ্রণ তৈরি করল হ্যালিডে। একটু জোর করেই ঢেলে দিল পলের মুখে। খানিক বাদেই পরিবর্তন দেখা দিল সারা দেহে। গোটা দেহ কাঁপছে থরথর করে। সেই শীতেও সারা গা ঘামে ভেজা। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল সে। আমরা বসিয়ে দিতে চাইলাম। বড়োলাট চোখের ইশারায় মানা করলেন। আচমকা সবার হাত ছাড়িয়ে তিরের মতো ছিটকে বড়োলাটের টুটি টিপে ধরল পল। তার গায়ে মত্ত হাতির শক্তি। মুখ থেকে বেরোচ্ছে এক জান্তব গর্জন। আমরা তিনজন মিলে শত চেষ্টাতেও ছাড়াতে পারছি না। ময়না একপাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে।

বড়োলাট কোনওমতে কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন। ঘরের মৃদু আলোতে আমি শুধু দেখতে পেলাম একটা ধাতব ঝলকানি। তারপরেই পলের দেহ শিথিল হয়ে গেল। ভারী বস্তার মতো এলিয়ে পড়ল মাটিতে। বুক আর পেটের সংযোগস্থলে একটা খাঁজকাটা ছুরি ঢোকানো...”

লখন চুপ করল। ঘরের কেউ কোনও কথা বলছে না। শুধু ছোটো মেয়েটা গুনগুন করে কী যেন গান গাইছে। সুরটা বিদেশি। ভূদেব শুধু বললেন, “তার মানে আত্মরক্ষা করার জন্য...”

“তাই বলতে পারেন। কিন্তু শুরু থেকেই তাঁকে মানা করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল এ আরক মানুষের শুধু অন্ধকার দিকটা বার করে আনে। উনি শুনলেন না...”

“তারপর?”

“বড়োলাট হতভম্ব হয়ে মাটিতে বসে ছিলেন। যেন বুঝতে পারছেন না কী করা যায়। একবার শুধু মৃদুগলায় বললেন, ‘ইজ হি ডেড?’ সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তবুও হ্যালিডে নাড়ি পরীক্ষা করে উপরে নিচে মাথা নাড়ল। ম্যাজিশিয়ান কার্টার স্তম্ভিত হয়ে গেছিল। ঘরের একপাশে হড়হড় করে বমি করে ফেলল সে। বড়োলাট তখনও স্বাভাবিক হননি। হ্যালিডেই তাঁকে বলল চলে যেতে। পলের দায়িত্ব আমরা নেব। তিনি চলে যাবার পর পলকে ফালাফালা করে চিরে ফেলা হল। অণ্ডকোশ কেটে দেওয়া হল। ওরিজেনের মতো, কিংবা যেমন করে গংসিরা খুন করে। ফেলে আসা হল চিনেপাড়ায়। ভাবা হল সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সন্ধে থেকেই সব কিছুর শুরু।” আবার থামল ল্যানসন।

ভূদেব অবাক হয়ে শুনছিলেন। ল্যানসন থামতেই বললেন, “এখনও বুঝলাম না, তুমি আমাকে এতসব বলছ কেন?”

“এবার আসল কথায় আসছি। যেমন প্ল্যান হয়েছিল তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে। করিন্থিয়ান হলে সাইগারসন নামের সেই সাহেব যে আসলে গোয়েন্দা, তা আমার জানা ছিল না। মাস্টার ম্যাসন পরের দিনই আমায় জানান, বড়োলাট এইসবের জন্য হ্যালিডেকে দোষী করেছেন। তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। আমার উপরে দায়িত্ব এল হ্যালিডেকে নিকেশ করে তার সেই বাক্স আর ফর্মুলা খুঁজে বড়োলাটকে দিতে। আমি বাক্সটা খুঁজে পাই। কিন্তু অনেক খুঁজেও ফর্মুলা পাইনি। এদিকে শুনি কার্টার ব্ল্যাকমেল করার জন্য পত্রিকা অফিসে চিঠি লিখেছিল। তাকেও খুন করা হয়েছে। তখনই আমার কেন যেন মনে হয় বড়োলাট সেই সন্ধ্যার কোনও সাক্ষী রাখবেন না। মানে একটাই। এবার আমার আর মারিয়ানার পালা। আমরা গা ঢাকা দিই। দিন কয়েক কলকাতাতেই বাগবাজারের কাছে এক গুদামে লুকিয়ে ছিলাম। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, ইংরেজ বাহাদুরের সেনারা আমাদের তল্লাশি চালাচ্ছে। খুঁজে পেলেই মেরে ফেলে দেবে। আর আমরা মারা গেলে দ্রিনাকেও ওরা আর বাঁচিয়ে রাখবে ভেবেছেন? হয়তো মেরে ফেলবে কিংবা কলিঙ্গবাজারে....”

“থামো থামো! এসব আর বোলো না। তোমরা চন্দননগরে গা ঢাকা দিতে চাও। তাই তো?”

“মারিয়ানা বলল ইংরেজদের চৌদ্দ আইন থেকে বাঁচতে সোনাগাজির কিছু বেশ্যা চন্দননগরে পালিয়ে আসে। আপনি তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করেন। আমাদের কথা তো সব শুনলেন। এখন একমাত্র চন্দননগরেই ইংরেজ বাহাদুরের সেনারা আমাদের কিছু করতে পারবে না।”

বেশ খানিক চুপ করে বসে রইলেন ভূদেব। মাথা নিচু। শেষে বললেন, “পৃথিবীতে মানুষ যত বাড়ছে, পাপও বাড়ছে সেই হারে। তুমিও সেই পাপের অংশ। আশ্রিত না হলে তোমাকে আমি আইনের হাতে ধরিয়ে দিতাম হয়তো। কিন্তু অনেক সময় পরিস্থিতির উপরে মানুষের হাত থাকে না। তবে মানুষ নিজেকে বদলায়। বদলাতে পারে। যা হোক, আমি এক শর্তে তোমাদের আশ্রয়

দিতে পারি। যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন ব্রাদারহুডের কোনও কাজকর্মে যেন তোমাদের না দেখতে পাই, কিংবা কোনও অসৎ কাজে অংশগ্রহণে না দেখি। এমনকি শত প্রলোভনেও এই ভয়ানক আরক ব্যবহার করবে না। আমি বৃদ্ধ। কিন্তু সব খবরই আমার কাছে আসে। আমার কথার অবাধ্য হলে আমি নিয়ে আমাদের মিউনিসিপালিটির ফরাসি মেয়র দুমেঁ সাহেবকে বলে তোমাদের জেলে ঢোকাব। কী? রাজি? কথা দিচ্ছ?”

ল্যানসন, মারিয়ানা দুজনের চোখেই জল। তারা মাথা নেড়ে বলল, “রাজি।“

“আর সেই ভূত বাক্স?”

“সেটাও এখন আমার কাছেই আছে। মাস্টার ম্যাসন বলেছেন ওটা কলকাতায় রাখা বিপজ্জনক।“

“আগে হলে তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করতাম না। করার মতো না। কিন্তু এখন বয়স বাড়ছে। অনেক কিছু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। ভগবানকে..... ভূতকে... মানুষকে। ছাড়ো সেসব কথা। আমাদের বড়বাজারের কাছেই একটা বাড়িতে তোমাদের ব্যবস্থা করে দেব। আমার বন্ধু সুরেশ বাঁড়ুজ্যের অনেকগুলো বাড়ি আছে। তাদেরই একটা। একটাই সমস্যা, ওকে সবকিছু খুলে বলতে হবে। তবে সমস্যা নেই। লোক ভালো। ওখানে ময়না আর তার মেয়ে থাকবে এক সাহেবের বিধবা আর তাঁর মেয়ে সেজে। তোমার পরিচয় হবে তাদের চাকরের। আপত্তি আছে?”

কোনও কথা না বলে পাশাপাশি মাথা নাড়ল দুজনে।

“তবে আমার হাতে হাত রেখে দুজন মিলে একসঙ্গে শপথ নাও। আমার জীবৎকালে এই বাক্স যেন খোলা না হয়। প্যান্ডোরার বাক্স খোলার পর পৃথিবীর কী দুর্দশা হয়েছিল জানো নিশ্চয়ই?”

দুজনেই একসঙ্গে বৃদ্ধ ভূদেবের হাতে হাত রেখে শপথ নিল, “আপনি বেঁচে থাকতে আমরা কোনওরকম অসৎ কাজে লিপ্ত হব না। বাক্সও ততদিন বন্ধ থাকবে।”

তবে খুব বেশিদিন কথা রাখার দায় রইল না তাদের। পরের বছরই মে মাসে সন্ন্যাস রোগে না ফেরার দেশে চলে গেলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

২।

ফরাসিরা চন্দননগরের অধিকার নেবার পরে বহুদিন এদেশীয়দের এড়িয়ে চলতেন। উৎসব করতেন নিজেদের মতো। ফলে দেশীয় উৎসবে শুরুতে ফরাসি ছোঁয়াচ লাগেনি। কিন্তু দিনে দিনে মেলামেশা বেড়েছে। অনেক ফরাসিরা নেটিভদের সঙ্গে সংসারও পেতেছেন। ফলে কলকাতায় বড়দিনের মতো চন্দননগরবাসীদের একান্ত নিজেদের এক পার্বণ শুরু হয়েছে। আগে এ শুধুই ফরাসিদের অনুষ্ঠান ছিল। প্রতি বছর চোদ্দোই জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের স্মৃতিতে এ দেশের ফরাসিরা উৎসবে মেতে উঠতেন। তাঁদের ভাষায় এই উৎসবের নাম ফিয়েস্তা। নেটিভদের আড়ষ্ট জিভে কালে কালে তা "ফ্যাস্তা" নাম নিয়েছে। এখন গোটা চন্দননগরের মানুষ মিলে এই পার্বণে মাতেন।

উৎসবের আগের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। ওই দিন পুরো স্ট্যান্ড ফরাসি পতাকা আর নীল, সাদা, লাল ফুল দিয়ে সাজানো হয়। ফরাসি সরকারি ভবনও সাজানো হয় পতাকা, ফুল, আলো দিয়ে। মেয়রের কার্যালয়ে মেয়র নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অনাথ আর দুঃস্থদের নতুন কাপড় দান করেন। সন্ধে ছটায় হয় তোপ ধ্বনি। পরদিন সাজ সাজ রব। ঠিক ভোর ছটায় একুশ তোপধ্বনি দিয়ে মূল অনুষ্ঠানে শুরু। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে পথের দুপাশে লোকের ভিড় জমে যায়। ঝকঝকে নীল, লাল, সাদা পোশাক পরা ফরাসি পুলিশ বাহিনী কুচকাওয়াজ করে কুটির মাঠ থেকে জমায়েত হয় মেরির মাঠে। চারিদিকে সবাই হইচই বাধিয়ে দেয়। ফরাসি জানা অনেকে অতি উৎসাহে হেঁকে ওঠে, "লা ফেত ন্যাশিওনাল, লা ক্যাতৌয়ে জুইয়ে।"

এর পরেই শুরু হয় আসল মজা। ফরাসি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের ঠিক সামনে কুড়ি ফুট উঁচু এক মাস্তুল পুঁতে, তাতে চর্বি মাখিয়ে চপচপে করে

ভিজিয়ে দেওয়া হয়। চারপাশে থাকে বালি। মাস্তুলের মাথায় বিরাট একটা ঢাকা থেকে নানারকমের পুরস্কার ঝুলে থাকে। মাস্তুল বেয়ে উঠতে পারলেই মিলবে সেই পুরস্কার। প্রতিযোগীরা সেই মাস্তুল বেয়ে উঠতে চেষ্টা করে কিন্তু বারবার পিছলে পড়ে যায়। তা দেখে দর্শকরা সবাই হেসে খুন হয়। তবে সবচেয়ে মজা হয় হাঁসের খেলায়। মাঝগঙ্গায় হাঁস ছেড়ে দেন মেয়র নিজে। প্রতিযোগীরা সবাই সাঁতরে গিয়ে সেই হাঁস ধরে নিয়ে আসে। যে আগে আনবে, সেই জিতবে। এতে আবার বাজিও রাখেন অনেকে। এই খেলাটা প্রিনার খুব প্রিয়। সকাল হতে না হতে সে লখনকে তাড়া দেয় ঘাটে নিয়ে আসার জন্য। এইসব দিনে ষ্ট্যান্ডে ভয়ানক ভিড় হয়। আগেভাগে গিয়ে ভালো জায়গা দেখে না দাঁড়ালে সব মজাই মাটি।

বছর দেড়েক হল লখন চন্দননগরের বাসিন্দা হয়েছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফ্যাস্তা দেখছে। এখনও এখানকার আদবকায়দার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। কলকাতার চঞ্চল জীবনের পাশে কর্মহীন চন্দননগর যেন এঁদো ডোবা। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। যতদিন না আবার মাস্টার ম্যাসনের নির্দেশ আসে, ততদিন এভাবেই তাদের থাকতে হবে। চন্দননগরে আসার পর ময়নাও কেমন যেন ঘরকুনো হয়ে গেছে। বেশিরভাগ সময় মেয়েকে নিয়েই সময় কাটে তার। প্রিনাকে মেরির মাঠের পাশেই এক ফরাসি শিক্ষিকার ইস্কুলে ভরতি করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফরাসির সঙ্গে সঙ্গে মেমসাহেব কাজ চালানোর মতো ইংরাজিও শেখায়।

স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে লখন আনমনে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ তার মন বড়ো চঞ্চল। এদিকে হাঁসের খেলা শেষ। এবার জনা দশেক লোক ধরাধরি করে আর-একটা চর্বি মাখানো মাস্তুল নিয়ে এসে ঘাট থেকে গঙ্গার উপরে আড়াআড়ি রেখে দিল। মাস্তুলের ডগায় ফরাসি পতাকা পতপত করে উড়ছে। যে মাস্তুলের শেষ প্রাপ্ত পর্যন্ত পৌঁছে পতাকা ছুঁতে পারবে সে-ই জিতবে। আর তার আগে হড়কে গেলেই সোজা গঙ্গায়। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সারা

বিকেল কুঠির মাঠে চলল বাচ্চাদের কানামাছি, ডিম রেস আর বস্তা দৌড়। সন্ধেবেলা সাতটার সময় আবার তোপধ্বনি হল। এই তোপ মানে এইবারের মতো উৎসবের সমাপ্তি। কিন্তু লখন জানে এত তাড়াতাড়ি দ্রিনাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়া যাবে না। একটু পরেই শুরু হবে বাজি পোড়ানো। বাজি তৈরির কারিগররা দু-তিন মাস আগে থেকে চন্দননগরে চলে এসে বাজি তৈরি করেছে। ময়না এমনিতে ঘর থেকে বিশেষ বেরোয় না। তবে এই বাজি পোড়ানো দেখতে সেও জোড়াঘাটের চাঁদনিতে এসে হাজির। ওই জায়গাটা আবার কেবল মহিলা আর বাচ্চাদের জন্য সংরক্ষিত। দ্রিনাকে ময়নার কাছে রেখে সোজা কুঠির মাঠের দিকে পা বাড়াল লখন। আপাতদৃষ্টিতে সব স্বাভাবিক মনে হলেও সে জানে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। লোকটা কিছু বুঝতে পেরে ভেগেছে হয়তো।

লোকটাকে প্রথমবার লখন দেখেছিল তাদের বাড়ির উলটো দিকে। পরনে ধুতি আর ফতুয়া। রোগাভোগা চেহারা। একদৃষ্টিতে তাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। প্রথমে লখন গা করেনি। বাড়ির সামনে ছোটো একটা ফুলের বাগান বানিয়েছে। সেটার জন্যেই মাটি কোপাচ্ছিল সে। আড়চোখে যে সেও লোকটাকে দেখছে, সেটা বোধহয় সে বোঝেনি। দ্বিতীয় দিন আবার লখন লোকটাকে দেখতে পেল মেরির মাঠের পাশে। দ্রিনাকে হপ্তায় তিনদিন সেই ফরাসি মেমের কাছে দিতে যায়। ভূদেব মুখুজ্জে মহাপ্রাণ। এই চন্দননগরের ব্রাদারহুডের সঙ্গে কথা বলে তিনি ওদের একটা সামান্য ভাতার ব্যবস্থা করেছেন, নইলে পেটের দায়ে লখনদের আবার কাজে নামতে হত। দ্রিনার এই পড়াশুনোও সম্ভব হত না। দ্রিনাকে মেমের কাছে দিয়ে ফিরতে গিয়ে এক মোটা জারুল গাছের আড়ালে আবার লোকটাকে দেখতে পেল লখন। ইংরেজ পুলিশের খোচড় নয় তো? খুনের কেস তামাদি হয় না। লখনের খোঁজ করতে করতেই এখানে হাজির হল কি না। কে জানে? লখন দ্রুত পা চালাল। অবাক হয়ে দেখল লোকটাও তার পিছু নিল। নিজের উদ্বেগ বুঝতে না দিয়ে, হাঁটার গতি একটুও না কমিয়ে পরপর দুটো গলি পার হল সে। এবার সে নিশ্চিত লোকটা তার পিছুধাওয়া করেছে।

তৃতীয় গলিটায় ঢুকেই একটা বাড়ির উঁচু রোয়াক। চট করে তার নিচে লুকিয়ে পড়ল লখন। বেশ খানিক লুকিয়ে থেকে আবার যখন মাথা তুলল, গলিতে আর কেউ নেই। ইচ্ছে করেই এদিক ওদিক ঘুরে বাড়ি ফিরল সেদিন। দ্রিনাকেও নিয়ে এল অন্য রাস্তা দিয়ে। লোকটা নেই, তবে কিছুই বলা যায় না।

মাঝে দিন তিনেক লোকটাকে আর দেখতে পায়নি লখন। ভেবেছিল আপদ গেছে। আজ ফ্যাস্তার দিনে স্ট্যান্ডে ওই ভিড়ের মধ্যে একপলকে লোকটাকে দেখেই সে আবার চিন্তায় পড়ল। শুধু চিন্তা না। ভয়। সে একা হলে সমস্যা ছিল না। ভয় ময়না আর দ্রিনাকে নিয়ে। তার কিছু হলে ওদের কী হবে? বিকেলে কুঠির মাঠে বাচ্চাদের কানামাছি খেলার সময়ও লোকটা এক কোণে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিল। লখনের সঙ্গে চোখে চোখ পড়তেই মাঠের উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসতে লাগল। ভাগ্য ভালো, মাঝে একগাদা বাচ্চা দৌড়াদৌড়ি করছিল। লখন অবধি আসার আগেই সে দ্রিনার হাত ধরে আবার উলটো দিকে পা বাড়িয়ে একটা দোকানের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। মুশকিল হল, এই লখনের ভিতরে একটা ল্যানসন লুকিয়ে আছে। যে ল্যানসন মাস্টারের এক নির্দেশে খুন করতে পিছপা হয় না, ভয়ে পেয়ে পিছু হটতে জানে না, সে এমন পালিয়ে বেড়াচ্ছে ভেবে নিজেকেই মনে মনে গাল দেয় লখন। ঠিক করে আজকেই এর ফয়সালা করতে হবে। জানতেই হবে কে এই লোকটা?

সন্ধ্যায় তোপ দাগা শেষ হলে দ্রিনাকে মানার কাছে দিয়ে এবার সে উলটো লোকটার খোঁজে বার হল। ঠিকই ধরেছে। লোকটা তাকে খুঁজে না পেয়ে অবশেষে কুঠির মাঠের দিকে পা বাড়িয়েছে। এইদিন সন্ধ্যায় কুঠির মাঠে ফরাসি আর অ্যাংলো মহিলারা মেলা দিয়ে বসেন। গ্যাসের আলো জ্বেলে নানা পসরা বিক্রি হয় ছোটো ছোটো সব দোকানে। ঘর সাজানোর দারুণ সব জিনিস আর বুফ বাগিনিয়ঁ, কাসুলে কিংবা ডুফাঁনুয়াস পটেটোস-এর মতো খাঁটি ফরাসি খাবারের লোভে নেটিভরাও সেখানে জটলা পাকায়। তবে এই রাস্তা এখন ফাঁকা। ভিড় জমবে একটু পরে। বাজির খেলা শেষ হলে। লোকটা একমনে কী একটা

দিশি সুর গাইতে গাইতে চলেছে। কোনও দিকে খেয়াল নেই। লখন শ্বাপদের মতো ক্ষিপ্র পায়ে লোকটার পিছুনিল। লখনের পরনেও দেশি পোশাক। ফতুয়া আর খাটো ধুতি। নেটিভ চাকরদের যেমন হয়। দ্রুত ধুতির গেঁজে খুলে ক্ষুরটা হাতে নিয়ে নিল সে। এটা সর্বদা কাছে রাখে। কী দরকারে লাগে। লোকটা গুনগুন ছেড়ে এবার খোলা গলায় গান ধরেছে। এ গান যাত্রা থিয়েটারে শুনেছে বলে মনে হল লখনের। একটু খেয়াল করে শুনল লোকটা গাইছে-

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।

এ তো জ্যোতি ঠাকুরের নাটক সরোজিনীর গান! জ্যোতি ঠাকুর নিজেও ব্রাদারহুডে ছিলেন কিছুকাল। লখন তাঁকে চেনে। এবার গানের সঙ্গে সঙ্গে হাতে চাপড় মেরে তালও দেওয়া শুরু করল লোকটা। মানতেই হবে, গানের গলাটা খাসা। কিন্তু এ লোক লখনকে ধাওয়া করছে কেন?

কুঠির মাঠ আসার আগেই এক অন্ধকার কোণে বাঘের মতো লোকটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল লখন। তার হাতের ক্ষুর লোকটার গলায় হালকা আঁচড় বসিয়েছে। একটু এদিক ওদিক হলেই কণ্ঠনালী দুই ফাঁক হয়ে যাবে। লোকটা এত ভয় পেয়েছিল, তার গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছিল না।

সাপের মতোফিসফিসিয়েলখন জিজ্ঞাসা করল, "তুই কে?"

লোকটা দুবার খাবি খেল। কিছু বলতে পারল না। লখন বুঝতে পারল এক আকস্মিক আক্রমণে লোকটার সারা শরীর কাঁপছে।

ক্ষুরটা একটু আলগা করে আবার একই প্রশ্ন করল।

অতিকষ্টে ধরা গলায় উত্তর এল, "ব্রাদার"

"ব্রাদার? ম্যাসন?"

"নাহ। জাবুলন।"



লোকটার চেহারা, গলা সবেতেই অদ্ভুত এক কোমল, মেয়েলি ভাব। এমন লোককে ভয় পেয়েছিল ভেবে লখনের নিজেরই হাসি পায়।

"আমাকে যাওয়া করেছিস কেন?"

"ধাওয়া তো করিনি। একটা খপর দেওয়ার ছিল।"

"খবর? কী খবর?"

"আগের বড়োলাট দেশে ফিরে গেছেন। আর আসবেন না। নতুন লাটসাহেব এয়েচেন। লর্ড এলগিন। আমাদের নোক। মাস্টার ম্যাসন আপনাকে কলকেতায় দেকা করতে বলেচেন।"

"কলকাতার কোথায়? লজে?"

"না। আস্তানায়। খুব প্রয়োজন। এটা জানাতেই আমি আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজে যাচ্ছি এতদিন ধরে। আর আপনি কিনা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন!"

"আমার সন্ধান কে দিল?" কঠিন গলায় শুধাল লখন।

"কে আর দেবে? মাস্টার জানতেন আপনারা চন্দননগরে আচেন। তিনি আপনাদের বন্ননা দিয়ে আমায় বললেন, তুমি ওকানের নোক। ভালো সন্ধান কত্তে পারবে। যাও, খুঁজে নিয়ে বলে এসো। আমিই খুঁজে খুঁজে... বাড়িতে আপনাকে কাজ করতে দেকে চাকর ভেবেছিলুম। আর এসব কথা নিশ্চিত না হয়ে তো বলা যায় না.... এই কাগজটাও তিনি দিয়েচেন আপনাকে দেবার জন্যে", বলে ফতুয়ার পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বার করে দিল লোকটা। ছাপা চিঠি। উপরেই লেখা "ইগনোর করিবেন না'। তলায় ম্যাসনদের চিহ্ন। তিনটে লোক হাতে হাতে ধরে ত্রিভুজ বানিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চিঠির মাথায় এই চিহ্নের একটাই মানে, এ চিঠি স্বয়ং মাস্টার ম্যাসন লিখছেন অন্য কোনও ব্রাদারকে। লখনের যতটুকু সন্দেহ ছিল এই চিঠি পেয়ে দূর হয়ে গেল। চিঠির ভাষা অতি জটিল, একেবারে পোড়খাওয়া লোক ছাড়া কেউ বুঝবে না। প্রাপকের নাম কোথাও নেই। প্রেরকের জায়গায় শুধু এক তর্জনী। স্বাভাবিক। ভুলবশত

কারও হাতে এই চিঠি পড়লেও যেন কোনও অনর্থ না হয়। একমাত্র প্রাপক এর অর্থ বুঝতে পারবে। টকটকে লাল কালি দিয়ে চিঠিতে লেখা-

ইগনোর করিবেন না

বিনয় পূর্ব্বক নম-
স্কার নিবেদনঞ্চাগে
মহাশয়ের রাজলক্ষ্মী
শ্রীশ্রীৎবিরাজকরিতে
ছেন তাহাতে অত্রা-
নন্দ হয় বিশেষঃ। পরে
পরম শুভাশীর্ব্বাদ বি-
জ্ঞাপনঞ্চাদৌ তোমার
মঙ্গল শ্রীশ্রীৎ স্থানে
পার্থনা করিতেছি তা-
হাতে মঙ্গল বিশেষঃ।
বহু দিবসাবধি সম্বাদ
না পাইয়া বড় ভাবিত
আছি মঙ্গলাদি লিখি-
বেন ইতি

ইগনোর করিবেন না

চিঠি পড়ে খানিক কী যেন ভাবল লখন। তারপর বলল, “লিখিত উত্তর আর দিলাম না। আজ তো শনিবার, মাস্টারকে জানিয়ো আগামী বুধবার আমি যাব আস্তানায়। আর হ্যাঁ, পরে কোনও দিন আমার বাড়ির আশেপাশে তোমায় যেন না দেখি।”

“দেকবেন না। আমি কালই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি। রিয়ার্সাল আছে। থ্যাটাকের। এবার তো ছাড়বেন? নাকি মেরেই শাস্তি হবে আপনার?”

গলা থেকে ক্ষুর সরিয়ে নিল লখন। থিয়েটার করে লোকটা। এত ভালো গানের গলার কারণ অবশেষে বোঝা গেল। একটু নরম সুরেই লখন বলল, "কী নাম যেন বললে তোমার? ভুলে গেছি।"

"ভুলবেন কী করে? নাম একনও বলিনি তো! অধমের নাম শ্রীযুক্ত শৈলচরণ সান্যাল। আদি নিবাস চুঁচড়ো।"

৩।

সরু রাস্তা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে দুইদিকের বাড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। প্রায় সব বাড়ির দরজার উপরেই দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব যেন লেখা। প্রায় প্রতি পদেই রাস্তার ধারে এক-একটা করে সরাই। সামনে ক্রেতাকে প্রলোভন দেখানোর জন্যেই হয়তো কয়েকটা ছাল ছাড়ানো, মশলা মাখানো কাঁচা মুরগি ঝুলছে। গোটা রাস্তা জুড়ে এক অজানা গন্ধ। তীব্র। বিভিন্ন মশলাপাতি মিশালে এমন ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়। কারও চোখ বেঁধে এই রাস্তায় ছেড়ে দিলে শুধু গন্ধেই মালুম পড়বে সে কোথায় এসেছে। চিনা ধর্মমন্দিরটার দরজা আজকে খোলা। ভিতরে তারের বাদ্য বাজিয়ে কে যেন হেঁড়ে গলায় গান গাইছে। এই সবই লখনের এককালের কত চেনা! কিন্তু এই কদিনের ব্যবধানে মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে। গলির মোড়টা ঘোরার মুখে যেখানে কিছুদিন আগেও রেড়ির তেলের বাতিস্তম্ভটা ছিল, সেখানে এখন বিজলিবাতি বসেছে। অজান্তেই সেটা দেখে একটু শিউরে উঠল লখন। এখানেই তো বড়োলাটের সেই ভাইকে.... তবে তার ভাবার সময় নেই। দ্রুত পায়ে সে চলল আস্তানার দিকে। এটার কথা ব্রাদারহুডেরও সবাই জানেন না। বাইরে থেকে অন্য পাঁচটা সরাইয়ের মতোই। ঢুকেই চার-পাঁচটা শীর্ণ টেবিল। দরজার পাশে নানারকমের খাবার, বোতল আর পাত্র সাজানো। লখন ঢুকতেই হাসিমুখে এগিয়ে এলেন দোকানের মালকিন। "কাম কাম বাবু, হোয়াত দু ইউ ওয়ান্ত?"

লখন জানে এর উত্তরে কী বলতে হয়। সে চাপা গলায় বলল, "সিয়াংদি। ব্রাদার।"

মহিলার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়ে সামান্য উদ্বেগ দেখা দিল। "ওয়েত হিয়ার", বলে প্রায় ছুটে ঢুকে গেলেন দোকানের পিছনের পর্দা সরিয়ে। লখন অপেক্ষা করতে লাগল। পাশের টেবিলে দুজন চিনাম্যান মাঝে মাঝে মুখের সামনে বাটি তুলে দুটো কাঠি দিয়ে কী যেন খাবার তুলে তুলে খাচ্ছে, অনেকটা সিমাইয়ের মতো দেখতে, নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, আবার কথার ফাঁকে একটু অবাক হয়েই এই কুচকুচে কালো লোকটাকে দেখছে। উপরের লাল লণ্ঠনের আলোতে সব কিছুই কেমন ভৌতিক। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে মহিলা ফিরে এলেন। ফুটিফাটা মুখে আবার হাসি।

"কাম বাবু, কাম", বলে লখনকে নিয়ে চললেন দোকানের পিছনের দিকে। এখানে আলোয় ভরা লম্বা একটা ঘর থেকে টাকার আওয়াজ আর মৃদু গলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। লখন উঁকি মেরে দেখল সে ঘরে অনেক লোক। প্রায় সবাই চিনাম্যান। সবাই একত্রে জুয়া খেলছে। টেবিলে টাকাপয়সার পাহাড় জমেছে। সে ঘর পেরিয়ে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা নিচের দিকে। মহিলা পথ দেখিয়ে নিয়ে চলছেন। বার্নিশ করা কাঠের দরজা খুলে মহিলা পাশে সরে দাঁড়ালেন। লখন ঘরে ঢুকতে ইতস্তত করছিল। ভিতর থেকে আওয়াজ ভেসে এল, "কাম ইন।" এ গলা লখন চেনে। সে ঘরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করে দিলেন মহিলা। ঘরে কোনও বিজলিবাতি নেই। লণ্ঠনের আলোতে চোখ ধাতস্থ হতে খানিক সময় লাগল। তারপরেই ঘরের একেবারে মাঝে চেয়ারে বসা মাস্টার ম্যাসনকে দেখতে পেল লখন। এই কয়েকদিনেই তাঁর বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। প্রায় সব চুল সাদা। চোখের কোলে কালি। লখনকে দেখেই চেয়ার থেকে উঠে করমর্দন করলেন মাস্টার। ম্যাসনিক করমর্দন। এই করমর্দন মাস্টার একমাত্র খুব বিশেষ ব্রাদার বাদে কারও সঙ্গে করেন না। তবে কি লখন

আবার কোনও গুরুদায়িত্ব পেতে চলেছে? উত্তেজনায় লখনের বুক ধুকপুক করতে লাগল।



"আয়্যাম সরি, ব্রাদার ল্যানসন।"

মাস্টারের মুখ থেকে এমন কথা শুনবে বলে আশা করেনি লখন। সে কোনও জবাব দিল না। অপেক্ষা করতে লাগল মাস্টার কী বলেন তাঁর জন্য। মাস্টার খানিক চুপ রইলেন। হয়তো তিনি লখনের মুখ থেকেই শুনতে চাইছিলেন। লখন কিছু বলছে না দেখে তিনি আবার বললেন, "আমি জানি এখন তোমাদের একেবারে অজ্ঞাতবাসে কাটাতে হচ্ছে। আমার কথামতো কাজ করার পরেও আমি তোমাকে যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারিনি। এ আমার অক্ষমতা।"

আবার চুপ করলেন মাস্টার। লখন নিরুত্তর।

"তবে তুমি হয়তো জানো না, সরকারের পুলিশ যাতে তোমাদের অবধি না পৌঁছাতে পারে, তার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করেছি। তোমাকে খুঁজে পাবার সবকটা সূত্র, সোনাগাছির লক্ষ্মীমণি থেকে দর্জিপাড়ার নবীনচন্দ্র মান্না, কেউই আর সাক্ষী দেবার জন্য উপস্থিত নেই। সাইগারসন সাহেব দেশে ফিরে গেছেন। যেটার অপেক্ষায় ছিলাম, সেই বড়োলাটও বদলে নতুন বড়োলাট এসেছেন। ইনি আমাদের লোক। আমাদের, মানে নব্য ম্যাসনদের পক্ষে। ফলে আগের আমলে যেসব ব্রাদাররা কলকাতা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল, আমরা তাদের ফিরিয়ে আনতে চাইছি। জোরাজুরির কিছু নেই। তবে আমরা চাই তুমি আবার এসো। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে। তোমাকে ছাড়া সেসব কাজ হবে না।"

খানিক কী যেন ভাবল লখন। তারপর বলল, "এই প্রস্তাবে না বলার সুযোগ আছে?"

মাস্টার বোধহয় এটা আশা করেননি। তাঁর মুখ কঠিন হল। চোয়াল শক্ত। খুব ধীরে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, "না করার কারণ জানতে পারি কি?"

"আমি তো এখন একলা নই আর। বাকি দুইজনকে আমার জন্য বিপদে ফেলতে পারি না।"

হো হো করে হেসে উঠলেন মাস্টার ম্যাসন। হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। লখনের দুই কাঁধে হাত দিয়ে লখনের মুখের খুব কাছে নিজের মুখ নিয়ে এলেন। তাঁর মুখ থেকে এলাচের মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে। কাটা কাটা গলায় বললেন, "যা তোমার না, যা তোমার কোনও দিন হবে না, তার দাবি করছ কেমন করে? তুমি ব্রাদারহুডের সামান্য কর্মী। মনে রাখবে। তোমার দায়িত্ব কী?"

লখন চুপ।

মাস্টার এবার তীব্র স্বরে বলেন, "তোমার দায়িত্ব কী?"

"মাস্টারের আজ্ঞা পালন", ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয় লখন।

"যাক! ভোলোনি দেখছি! আর আজ্ঞা পালন না করলে কী হয়?"

"বিনাশ।"

"গুড। এক হপ্তা সময় দিলাম। চন্দননগরের পাট চোকাও। কলকাতায় কিড স্ট্রিটে ঘর দেখা হয়েছে। সেখানেই থাকবে তোমরা। এখন যেভাবে আছ।"

"ঠিক আছে মাস্টার।"

"আর হ্যাঁ। তোমাকে যে দুটো সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়েছিলাম, সে দুটোর কী খবর?"

"দুটোই ঠিক আছে।"

"সময় ঘনিয়ে আসছে। ব্রাদারহুড এতদিন ঘুমিয়ে ছিল। এইবার সুযোগ এসেছে প্রত্যাঘাতের। কোনওমতেই যেন আমরা এই সুযোগ না হারাই। এমন সুযোগ একবারই আসে। ময়না কতটুকু জানে?"

"শুধু জানে মা-মরা মেয়ে। কলিঙ্গবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ব্রাদারহুড তাকে উদ্ধার করেছে।"

"ব্যস! আর কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। সময় হলে সব জানবে। আর সেই বাক্স?"

"মাস্টারের আদেশ ছাড়া ওই বাক্সে হাত দিইনি।"

"খুব ভালো। তুমি কলকাতায় চলে এসো। তারপর তোমাকে নতুন কাজ দেব। হাসপাতালে।"

"আবার ডালান্ডায়?"

"না। ওখানে প্রিয়নাথ একবার তোমাকে দেখে ফেলেছিল। এখন প্রায়ই ডালান্ডায় পুলিশের খোচড় ঘুরে বেড়ায়। তোমায় কেউ চিনে নিলে মুশকিল। তুমি যাবে প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে। ডাক্তার কানিংহ্যাম বুড়ো হয়েছেন। তাঁর ল্যাবরেটরিটা আগের মতো ব্যবহার হয় না। ইদানীং তাঁর এক ছাত্র সেখানে কাজ করেন। কিছুদিন আগে অবধি ল্যাবরেটরিতে ধোয়ামোছার জন্য রামেশ্বর নামের একজন ঢুলি ছিল। গত সপ্তাহে সে মারা গেছে।"

"কীভাবে মারা গেল?" না চাইতেই লখনের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

"তাতে তোমার কী দরকার হে? তবে জানতে চাইছ যখন বলেই দিচ্ছি, রামেশ্বর ছিল ক্যানিংহ্যামের ডান হাত। একদিন বাড়ি ফেরার পথে কিছু ডাকাত তার উপরে চড়াও হয়ে পেটে ছুরি ঢুকিয়ে মেরে ফেলে। এবার তোমাকে ওর জায়গাটা নিতে হবে। তোমার সুপারিশপত্র তৈরিই আছে। ক্যানিংহ্যামের ল্যাবরেটরিতেই আমাদের এক ব্রাদার এখন কাজ করছেন। তুমি তাঁকে সাহায্য করবে। তুমি একা না। আরও একজন মহিলা আছেন। মঙ্গলা নাম। সেও ধোয়ামোছার কাজই করে। আমাদেরই লোক।"

"ঠিক কী ধরনের সাহায্য করব আমি?"

"কিচ্ছু না। তুমি তোমার সেই ভূতের বাক্সটা এনে আমাদের ব্রাদারকে দেবে। তিনি ওটা নিয়েই গবেষণা করবেন।"

“কী গবেষণা?”

“সেটা আমাদের চেয়ে তিনিই ভালো বুঝবেন, তাই নয় কি? দাঁড়াও। তিনি পাশের ঘরেই আছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।”

ঘরের লাগোয়া যে আরও একটা দরজা দেওয়ালে প্রায় মিশে আছে, সেটা এতক্ষণ খেয়াল করেনি লখন। মাস্টার সেই ঘরের দরজা খুলে কাউকে একটা আহ্বান করলেন। ছোটোখাটো চেহারার এক নেটিভ ভদ্রলোক ঘরে উপস্থিত হলেন। লখন তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

“এই হল লখন। যার কথা আপনাকে বলছিলাম। আর লখন, এঁকে চিনে রাখো, এখন থেকে ইনি যা বলবেন তোমাকে সেইমতোই চলতে হবে। ইনি ক্যানিংহ্যাম ল্যাবরেটরির নতুন ডাক্তার, আগে মেডিক্যাল কলেজে ছিলেন, মহেন্দ্রলাল সরকারের ছাত্র ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্ত। হাটখোলার দত্ত বাড়ির ছেলে।”

৪।

১৭৫৮ সালের মাঝামাঝি রেভারেন্ড জন জ্যাকেরিয়াস কিয়েরেন্ডার কলকাতায় পা রাখলেন। প্রোটেস্টান্ট চার্চ থেকে তাঁকে গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কলকাতার নেটিভদের মিশনারি শিক্ষার আলোতে আলোকিত করার। কলকাতায় এসেই কাজে নেমে পড়লেন কিয়েরেন্ডার। প্রচুর জায়গা-জমিও কিনে মিশন রো এলাকায় প্রথম প্রোটেস্টান্ট প্রেয়ার হাউস তৈরি করেন, মুখে মুখে যা ওল্ড মিশন চার্চ নামে পরিচিত হল। এরই খুব কাছে, বর্তমানের এক নম্বর গারস্টিন প্লেস-এ ছিল শুধুমাত্র সাহেবদের জন্য প্রেসিডেন্সি হসপিটাল। হাসপাতাল থাকলেও সেখানে যতজন সাহেব ঢুকতেন তাঁদের প্রায় কেউই জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে আসতেন না। তাঁদের সরাসরি নিয়ে যাওয়া হত পাশেই ঠিক উত্তর-পশ্চিম কোণের প্রাচীন গোরস্থানে। ভারতে আসা সাহেবদের ক্রমাগত চাপে কোম্পানি নতুন হাসপাতাল তৈরির কথা ভাবল। ময়দানের উলটো দিকে জ্যাকেরিয়ার এক

প্রকাণ্ড বাগানবাড়ি ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মোটা টাকায় সেই জায়গাটা তাঁর কাছ থেকে কিনে নেয়। পাশেই ছিল এক বাঙালি ভদ্রলোকের অনেকটা জমি বাড়ি। সেটাও কিনে নিল কোম্পানি। ১৭৭০ সালের এপ্রিলে শেষ হল হাসপাতাল তৈরির কাজ। নতুন এই হাসপাতালের নাম রাখা হল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হসপিটাল। লোকের মুখে মুখে পিজি হাসপাতাল। ঠিক করা হল, শুধু চিকিৎসা না, সময় মোতাবেক আধুনিক চিকিৎসানিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা আর গবেষণাও করা হবে এখানে।

ডাক্তার ক্যানিংহ্যাম-ও সেই কাজেই লন্ডন থেকে কলকাতা এসেছিলেন। জাতে স্কটিশ এই চিরকুমার মানুষটির ধ্যানজ্ঞান ছিল গবেষণা। কলকাতায় এসে নিজের গবেষণাগারে কলেরা নিয়ে যে কটা পেপার প্রকাশ করেছিলেন, প্রত্যেকটা বিজ্ঞানের এক-একটা মাইলস্টোন। বেশ কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে পড়িয়ে এখন শুধু গবেষণা আর পড়াশোনা করেন। দেশবিদেশের নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়েছেন নিজের গবেষণাগার। অবশ্য বয়স বাড়ায় নিজে আর খুব বেশি কাজ করতে পারেন না এখন। করে তাঁর ছাত্ররা। ছাত্রের সংখ্যাও অবশ্য ইদানীং কমতে কমতে একটিতে এসে ঠেকেছে। কোনও অজানা কারণে ইদানীং ক্যানিংহ্যামের গবেষণাগারে ছাত্র আসা বন্ধ হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও তাঁকে আর ছাত্র দিচ্ছেন না। ক্যানিংহ্যাম কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। চিঠি দিয়েছেন। কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাননি। সবেধন নীলমণি ছাত্রটি অবশ্য মেধাবী। মেডিক্যাল কলেজের নামী ডাক্তার। তাঁর এককালের ছাত্র। উচ্চতর গবেষণার জন্য সে খামোখা কেন মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে তাঁর কাছে এল, বুঝতে পারেন না ক্যানিংহ্যাম। হয়তো আধুনিক রসায়ন আর জীবাণুবিদ্যাচর্চায় তাঁর ল্যাবরেটরিটা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সেরা বলে। লন্ডন থেকে ডাক্তার প্রিয়ার্সন যে মানব নার্ভতন্ত্রের আধুনিক মডেলটি পাঠিয়েছেন, সেটিও একমাত্র তাঁর কাছেই আছে। ডাক্তার টাইটলার তাঁকে দিয়েছিলেন মস্তিষ্কের আর মানবকঙ্কালের সম্পূর্ণ চিত্র। কিন্তু ছাত্রটির কাজের সঙ্গে এসবের

কী সম্পর্ক? যতদূর তিনি জানেন, সে একজন সার্জন। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে এড়িয়ে যায়। হাসে। বলে, "আপনার দেখানো পথে কাজ করতে চাই।" যদিও কতটা কী পথ দেখাতে পারছেন, সে বিষয়ে ক্যানিংহ্যাম সন্দিহান। শারীরবিদ্যার চেয়ে মনস্তত্ত্বে ছাত্রটির আগ্রহ বেশি। দিনরাত ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকে। মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব প্রশ্ন করে। এই যেমন সেদিন আচমকা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা স্যার, এমন কি কোনও পদ্ধতি আছে, যাতে কোনও ওষুধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবে না। করবে ঘণ্টাখানেক বা ঘণ্টা দেড়েক বাদে?" কিংবা "কীভাবে কোনও বিক্রিয়ার সময় বাড়ানো যাবে?" এসব অবাস্তর প্রশ্ন সে কেন করে সাহেব বোঝেন না। হিসেবমতো তার কাজ মানুষের স্নায়ু ও বিভিন্ন স্নায়বিক রোগ নিয়ে। রোগের ধরন দেখাই তার কাজ। অন্তত এমনটাই বলেছিল সে। কিন্তু যা মনে হচ্ছে, ল্যাবরেটরিতে সে অন্য কিছু করে। সেদিন আচমকা ল্যাবরেটরিতে ঢুকে দেখেন তাঁর ছাত্র নানারকম দ্রবণ মিশিয়ে কী যেন বানাচ্ছে, গোটা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি। ক্যানিংহ্যাম যতটা চমকেছিলেন, তাঁর ছাত্রটিও কম চমকায়নি। "এসব কী হচ্ছে?" জিজ্ঞাসা করায় সে প্রথমে আমতা আমতা করে। পরে বলে, পাশেই ডালান্ডা হাউসের কিছু পাগল উন্মত্ত হয়ে তাণ্ডব চালাচ্ছে। তাদের শান্ত করে ঘুম পাড়ানোর জন্যেই নাকি পি জি হাসপাতালের ডিরেক্টর তাকে এই কাজ দিয়েছেন।

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন ডাক্তার ক্যানিংহ্যাম। তিনি এ দেশের নেটিভদের অপছন্দ করেন না। বরং ভালোবাসেন বলা যায়। কিন্তু এক নেটিভ তাঁরই গবেষণাগারে বসে, তাঁকেই না জানিয়ে দিনের পর দিন কাজ করে যাবে, সেই চিন্তাও তাঁর কাছে অসহ্য। আর সইতে না পেরে একদিন তিনি ডিরেক্টরের দ্বারস্থ হলেন। ডিরেক্টর সোজা জানিয়ে দিলেন কলকাতার বনেদি পরিবারের এই সন্তানের হাত অনেক দূর অবধি বিস্তৃত। সহজে কেউ তাঁকে ঘাঁটায় না। খুব উঁচু থেকে তাঁর জন্য সুপারিশ এসেছে। ডিরেক্টরের কিছু করার নেই। ক্যানিংহ্যাম-ও যেন এসবে মাথা না গলান।

বৃদ্ধ ডাক্তার নিজের কাজের জায়গাতেই ব্রাত্য হলেন। তিনজন নেটিভের মধ্যে মৌলাবক্স আর মঙ্গলা আগে থেকেই কাজ করত। এখন একজন নতুন লোক এসেছে। পোশাকে নেটিভ। কিন্তু হাবেভাবে একটা ইউরোপীয় ব্যাপার আছে। সম্ভবত হাফব্লাড। অ্যাংলো। গায়ের রং কুচকুচে কালো, কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। সে বেশি কথা বলে না। শুধু স্থির হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। ছেলেটার হাতের একটা আঙুলের ডগা নেই।

আজকাল রাত বাড়লে ল্যাবরেটরিতে আলো জ্বলে। খুটখাট কী সব কাজ হয় যেন। অচেনা মানুষদের আনাগোনা বাড়ে। একদিন ক্যানিংহ্যাম প্রায় মধ্যরাতে জলতেষ্টা পাওয়ায় উঠেছিলেন। জানলা দিয়ে ল্যাবরেটরির ঘষা কাচের শার্সি দেখা যায়। চমকে উঠে তিনি দেখলেন, এই মাঝরাতে ল্যাবরেটরিতে বেশ কিছু ছায়ামূর্তি উত্তেজিত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। তিনি ভাবলেন নিশ্চয়ই চোর ঢুকেছে। রাতের পোশাক পরেই ল্যাবরেটরির দিকে যেতে পথ আটকে দাঁড়াল সেই ছেলেটা। চোস্ত ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে বলল, "এত রাতে ল্যাবরেটরিতে যাবেন না স্যার। বিপদ হবে।"

"কীসের বিপদ? ল্যাবে চোর ঢুকেছে। সরো এখান থেকে", বলে তাঁকে সরাতে যেতেই ইস্পাতকঠিন হাতে তাঁর দুই কাঁধ চেপে ধরল ছেলেটা। ক্যানিংহ্যামের সারা শরীর যেন অবশ হয়ে যেতে লাগল।

"চলুন স্যার, আপনাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি", বলে প্রায় ঠেলেই তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিল সে।

নিজের হাতে গড়া ল্যাবরেটরিতে ক্যানিংহ্যামের সেই শেষবারের মতো যাওয়ার চেষ্টা। পরের দিন সকালেই তিনি দেশে ফেরার আবেদন করলেন। "বয়স হয়েছে। এবার নিজভূমে শান্তিতে মরতে চাই।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর্জি মঞ্জুর হল। কেউ একবারের জন্যেও বলল না, থেকে যান। পরের মাসেই খিদিরপুর ডক থেকে আটলান্টা জাহাজে চেপে

শেষবারের মতো চোখের জলে ভারতকে বিদায় দিলেন ডাক্তার ডেভিড ডগলাস ক্যানিংহ্যাম।

৫।

এমন নিস্তরঙ্গ জীবনই কি চেয়েছিল লখন? চন্দননগরে ক্রমাগত কর্মহীনতা তাকে ক্লান্ত করে তুলেছিল। ভেবেছিল কলকাতায় নিয়ে এসে মাস্টার তাঁকে কোনও গুরুদায়িত্ব দেবেন। তিনি কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কেমন কাজ? প্রায় সারাদিন নিশ্চুপ বসে থাকা ক্যানিংহ্যামের ল্যাবরেটরির সামনে। মাঝেমাঝে গোপালচন্দ্র টুকটাক সাহায্যের জন্য ডাকে। কিন্তু মূল সাহায্যকারী মঙ্গলাই। এই মঙ্গলা এক অদ্ভুত মহিলা। জাতে বাগদি, কিন্তু চেহারা ব্রাহ্মণকন্যার মতো। অকারণে কথা বলে না। মুখ বুজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। দুই বছর কেটে গেল। যে উত্তেজনার টানে লখন এক কথায় কলকাতায় ফিরে এসেছিল, তার কণামাত্র অবশিষ্ট নেই। একবার ঠারেঠোরে সে ব্রাদারহুডকে জানিয়েছে। মাস্টার মৃদুহেসে শুধু বলেছেন, "তৈরি থাকো লখন। ভয়ানক একটা ঝড় আসতে চলেছে। সেই ঝড়ে সব ওলটপালট হয়ে যাবে। এই থমথমে শান্ত ভাব আসলে ঝড়ের আগের পূর্বাভাস মাত্র। যেদিন ঝড় আসবে, আমি কথা দিচ্ছি, সবার আগে জানতে পারবে তুমিই।" লখন শিকারি বাঘের মতো অপেক্ষায় বসে থাকে। ইদানীং গোপালচন্দ্র নিজে প্রায়ই কোথাও বেরিয়ে যান। ফেরেন বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে। হাতে ছোপ ছোপ কালি মাখা কাগজের তাড়া। আজকাল আর নানা কেমিক্যাল মিশিয়ে বকযন্ত্রে ফোটান না গোপাল। বরং আতশকাচ নিয়ে সেইসব কালিমাখা কাগজে কী যেন খুঁজতে থাকেন।

লখনের এখনও মনে আছে সেই রাতের কথা। মধ্যরাত্রি প্রায় অতিক্রান্ত। মাস্টারের কড়া নির্দেশ, গোপাল ল্যাবরেটরিতে থাকাকালীন তাঁর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না। লখন তাই বসে আছে দরজা জুড়ে। হয়তো ঘুমে চোখ একটু ঢুলেই এসেছিল, হঠাৎ এক তীব্র চিৎকারে তার ঘোর কেটে

গেল। পড়ি কি মরি করে দৌড়ে ভিতরে ঢুকে দ্যাখে এক অদ্ভুত দৃশ্য। হলদে বিজলিবাতির একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে সাইডটেবিলে, আর এক হাতে আতশকাচ, অন্য হাতে একটা কাগজের ফালি নিয়ে দুই হাত উপরে তুলে গোপালচন্দ্র নাচছেন। দৃশ্যটা এতই আকস্মিক আর অভাবনীয় যে লখন প্রথমেই ভাবল ডালান্ডা হাউসের কোনও পাগল ছাড়া পেয়ে ল্যাবে ঢুকে গেছে, অথবা কাজের চাপ সইতে না পেরে গোপালচন্দ্র উন্মাদ হয়ে গেছেন। লখনকে দেখতে পেয়ে নাচ কমল তো না, বরং বাড়ল। দুই হাতে লখনকে জড়িয়ে ধরে, ভুল তালে, হেঁড়েগলায় গোপাল "পেয়েছি রে পেয়েছি" বলে প্রায় লাফাতে শুরু করলেন। প্রথমে খানিকক্ষণলখন বাধা দেয়নি, তারপর গোপালের দুই হাত ধরে "শান্ত হোন ডাক্তারবাবু, এসব কী? এসব শিশুপনা কি আপনার মতো মানুষকে মানায়?" বলতে গোপাল কিছুটা স্বাভাবিক হলেন। তখনও তাঁর দুই চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করছে।

"নাচছি কেন? নাচছি আনন্দে। এই দ্যাখো কী পেয়েছি", বলে দুটো কালিমাখা কাগজ লখনের চোখের সামনে মেলে দিলেন। লখন কিছুই বুঝল না। কী এসব? কেনই বা এতে এত উত্তেজনা?

এবার গোপালও নিজে বুঝলেন কেন তাঁর আনন্দ লখনের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে না।

"এ হে, আমারই ভুল। তোমায় কিছু না বুঝিয়ে একেবারে ফলাফল দেখাচ্ছি। কাছে এসো।"

লখন কাছে আসতেই তার হাত দুটো ধরে টেবিল ল্যাম্পেরতলায় এনে চেটো দুটো উলটে রাখলেন ডাক্তার গোপাল।

"কী দেখতে পাচ্ছ?"

"নিজের হাত", গোপালের মাথাটা কি সত্যিই গেছে? মনে মনে ভাবল লখন।

"হাতের চেটোয় কোনও দাগ দেখতে পাচ্ছ না?"

অনেক খেয়াল করে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রচুর দাগ চোখে পড়ল লখনের। আগে কোনও দিন খেয়াল করেনি।

"এবার বাঁ হাতটা বাড়াও।"

যন্ত্রের মতো বাঁ হাত বাড়াতেই তাতে কালির একটা রোলার ঘষে দিলেন গোপাল। তারপর বললেন, "এবার এই সাদা কাগজে হাতটা চেপে ধরো।" লখন চেপে ধরল। কিন্তু কেন এসব হচ্ছে, কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না।

"ব্যস। এবার উঠিয়ে নাও। তোমার হাতের ছাপ তৈরি।"

এবার লখন অবাক হল। এতক্ষণ হাতের যে সূক্ষ্ম দাগগুলো তার চোখেই পড়ছিল না, তারা প্রায় সবাই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে এই সাদা কাগজের বুকে। লখন এই প্রথমবার আগ্রহী হল।

লখনের চোখ মুখ দেখেই গোপাল সেটা বুঝতে পেরেছেন। এবার মৃদুহেসে বললেন, "কেমন? পুরো ম্যাজিক, তাই না? আসলে এ একেবারে আধুনিকতম বিজ্ঞান। সবে দুই-আড়াই বছর হল এ সম্পর্কে জানা গেছে। এখনও অনেক কিছু জানা বাকি। আমাদের ইনস্পেকটর জেনারেল এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি আর তাঁর দুই নেটিভ সঙ্গী আজিজুল হক আর রায়বাহাদুর হেমচন্দ্র বসু এ নিয়ে নিত্যনতুন গবেষণা করছেন। আর তা থেকেই অদ্ভুত সব খবর পাওয়া যাচ্ছে।"

"যেমন?"

"যেমন? এই যে ধরো তোমার হাতের ছাপ। এই কাগজে। এই ছাপ একান্তই তোমার। একবারে নিজস্ব। এই গোটা বিশ্বে তোমার মতো দেখতে লোক অনেক থাকতে পারে, কিন্তু এই হাতের ছাপের মালিক একজনই। তুমি। এর অর্থ বুঝতে পারছ?"

মাথা নাড়ল লখন। পারছে না।

"এতদিন অনেক অপরাধী এই মর্মে ছাড়া পেয়ে যেত যে, অপরাধের সময় আমি সেখানে ছিলাম না। সাক্ষী থাকলেও বলা হত, তার মতো কাউকে দেখেছে। অনেক সময় অপরাধীর পক্ষে বেশ কিছু সাক্ষী জোগাড় হত, যারা দিব্যি গেলে

বলত অপরাধের সময় আসামি অকুস্থলে ছিলই না। এবার ভাবো, যদি কোনওমতে অকুস্থলে আসামির হাতের ছাপ পাওয়া যায়, আর সেটা তার সঙ্গে মিলে যায়, তবে স্বয়ং ভগবান এসে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না আসামি এই কাজ করেনি। কারণ একই হাতের ছাপ শুধু একজনেরই হয়।“

“কিন্তু যমজ ভাই বা বোন হলে?”

“এখানেই তো মজা। যমজদের সব এক। কিন্তু হাতের ছাপ আলাদা। ঈশ্বরের এই এক অদ্ভুত সৃষ্টি। প্রতিটা মানুষকে তিনি একেবারে নিজস্ব হাতের ছাপ দিয়ে পাঠিয়েছেন।

এইটুকু বলে গোপাল চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, “ব্রাদারহুডে একটা কথা আছে জানো তো? ঈশ্বরের সৃষ্টিকে একজনই মাত্র অস্বীকার করতে পারে?”

“হ্যাঁ। জানি। শয়তান।”

গোপালচন্দ্র কিচ্ছু না বলে টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন। যখন ফিরে এলেন, তাঁর হাতে লখনের সেই চেনা বাক্স। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর তাঁর কাছেই এ বাক্স ছিল। তালাচাবি নেই। একটা মাত্র বিশেষ পদ্ধতিতেই খোলা যায়।

“এই বাক্সে শয়তান পোরা আছে। স্বয়ং শয়তান। আমার সন্দেহ হচ্ছিল। আজ নিশ্চিত হলাম।” একটু আগেও নতুন কিছু খুঁজে পাওয়ার যে আনন্দ গোপালের গলায় ছিল, তা সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়ে অদ্ভুত এক ভয় যেন বাসা বেঁধেছে।

“আমাকে এই ল্যাবরেটরিতে কী কাজ দেওয়া হয়েছিল তুমি জানো?”

পাশাপাশি মাথা নাড়ল লখন। সে জানে না। ব্রাদারহুড়ে একজন কর্মীর এত কিছু জানার অধিকার নেই।

“কিন্তু তোমার জানা উচিত। হাজার হোক তুমি আমার সহকারী। গবেষণাগারে যতটা করা যায় আমি করেছি। এবার সরাসরি এটা প্রয়োগ করতে হবে। আর সেই কাজে তুমি ছাড়া গতি নেই। তাই কাকেই বা বলব এসব?”

লখন বুঝতে পারছিল না আলোচনাটা কোনদিকে এগোচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘ এই ক্লান্তিকর বসে থাকার চেয়ে ভালো কিছু, এটুকু বুঝতে পারল।

"এই BHUT নিয়ে তো অনেক কিছুই জানো তুমি। একটা গোটা মানুষকে বদলে দেয়। যদিও সাময়িক। এই আরক মানুষের সবচেয়ে নিকৃষ্ট, হিংস্র দিকটাকে বাইরে বার করে আনে। এ সবই তোমার জানা। কিন্তু এই আরকের একটা সমস্যা আছে। চারটে আরক পরপর মিশিয়ে এটা তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াতে হবে, নইলে কাজ হবে না। কাজও হবে সঙ্গে সঙ্গে। এর অসুবিধা দুটো। একে তো হাতে সময় পাওয়া যায় না, তোমাকে চারটে আরকের বাক্স নিয়ে ঘুরতে হবে, আর দুই, যেটা সবচেয়ে সমস্যার, যার ওপরে তুমি এটা প্রয়োগ করবে, তার অজ্ঞাতে এটা খাইয়ে দেওয়া প্রায় অসম্ভব।"

"ঠিক। এটা আমিও ভেবেছি", বলল লখন।

"আর ক্যানিংহ্যামের এই ল্যাবরেটরিতে এটাই আমার কাজ ছিল। এমন কিছু বানানো, যাতে এই আরকের কাজ খুব ধীরে ধীরে হয়, ফলে হাতে সময় থাকে আর যাকে দেওয়া হবে তার অজ্ঞাতে এই আরক খাইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।"

"তারপর?"

"খাঁটি বিজ্ঞানীর মতো আমি প্রথমে এলিমেন্টাল অ্যানালাইসিস করতে চাইলাম", বলে লখনের হতবাক মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন গোপালচন্দ্র।

"ওহ। দুঃখিত। তোমাকে এসব বলছি কেন? সোজা কথায় এই চারটে আরকে কী কী আছে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মাস্টার মানা করেন। কারণ আরকের পরিমাণ কম, আর শেষ হলে নতুন করে বানানোর ফর্মুলা আমরা কেউ জানি না। বদলে আমি অন্য একটা কাজ শুরু করি। গত দুই বছরে আমি এমন একটা বড়ি আবিষ্কার করেছি, যা জলে দিয়ে দিলে গলে যায়, আর তার ভিতরের রাসায়নিক খুব ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে কাজ করে। এবার বড়ির

মধ্যে আলাদা আলাদা চারটে আরক যদি খুব অল্প পরিমাণে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তবে খাদ্য বা জলের মাধ্যমে এই মিশ্রণ মানুষের শরীরে প্রবেশ করার বেশ খানিক বাদে কাজ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে না।”

“অভিনন্দন আপনাকে।”

“ধন্যবাদ। কিন্তু এইজন্য আমি একটু আগে পাগলের মতো নাচিনি। নেচেছি অন্য কারণে।”

“কী কারণ?”

“আর-একটু জ্ঞান দিই তোমায়। এই দ্যাখো তিনরকম আঙুলের ছাপ।



প্রথমটায় দাগগুলো একদিক থেকে শুরু হয়ে, আর একদিকে শেষ হয়েছে। এদের বলে আর্চ। পাঁচ শতাংশের কম সংখ্যক মানুষের হাতের ছাপে আর্চ দেখা যায়। দুই নম্বরই সবচেয়ে বেশি। দাগগুলো যেদিক থেকে শুরু হয়েছে, ঘুরে এসে সেদিকেই মিলেছে। এদের নাম লুপ। আর লুপের পরেই যেটা বেশি দেখা যায়, তা হল তৃতীয়। ঘূর্ণিপাকের মতো নকশা। একে বলে হোর্ল। এদেরই বিভিন্নরকম এদিক ওদিক করে হাতের ছাপ নির্ণয় করা হয়। সেই জটিলতায় যাব না। এবার যেটা দেখাচ্ছি সেটা দ্যাখো।”

বলে উঠে আবার একতাড়া কাগজ নিয়ে এলেন গোপালচন্দ্র। “ইদানীং ল্যাবরেটরিতে বিশেষ থাকি না, মাঝেমধ্যে বেরিয়ে যাই। কোথায় যাই জানো?”

“না। আমার জানার এক্তিয়ার নেই।”

“আছে আছে। নাম শুনলেই বুঝবে আছে। এমন এক জায়গায়, যেখানে কিছু বছর আগে মাস্টার তোমায় কাজ দিয়েছিলেন পাগল ধরে আনার।”

"ডালান্ডা!! আবার পাগলদের..."

"না না, এবার তেমন নৃশংস কিছু হচ্ছে না। আমি শুধু আমার বড়ির উপযোগিতা দেখতে গেছিলাম।"

"কাজ হচ্ছে?"

"হচ্ছে। প্রয়োগের ঠিক আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে। এই সময়টা মানুষে মানুষে আলাদা হয়। কিন্তু কাজ হচ্ছে। ওষুধের প্রভাবে আর দুটো ঘটনা ঘটে। রোগীর দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায় আর হাতের তালু খসখসে হয়ে ঘাম হতে থাকে। সেই দেখেই কিছুদিন আগে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। আর এই দ্যাখো। ক্যাপসুল খাওয়ানোর আগের আর পরের আঙুলের ছাপ। কী বুঝছ?"

লখনের মুখ না চাইতেই হাঁ হয়ে গেল।

"এ তো সব লুপ আর্চ হয়ে গেছে!"



"এক্সজ্যাক্টলি। সেই আর্চ, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে রেয়ার। যদিও ওষুধের প্রভাব কমলে ছাপ আপনাআপনি আগের মতো হয়ে যায়, তবুও এ জিনিস কী ভয়ানক একটা দিক খুলে দিল বুঝতে পারছ?"

"বোধহয় পারছি।"

"কিচ্ছু পারছ না। অপরাধীকে শনাক্ত করার জন্য একেবারে পাথুরে প্রমাণ এই হাতের ছাপ। সবাই জানে হাতের ছাপ বদলানো যায় না। কিন্তু খানিকক্ষণের জন্য হলেও যদি হাতের ছাপ বদলে যায়, তবে কী জঘন্য সব ঘটনা ঘটতে পারে ভেবেছ কোনও দিন? অপরাধী অপরাধ করে নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে। চাক্ষুষ

প্রমাণ থাকলেও ধরার উপায় থাকবে না। এত অসামান্য একটা অস্ত্র একেবারে ভোঁতা হয়ে যাবে। আর দুটো অদ্ভুত ব্যাপার আছে...”

“কী?”

“ভূতের প্রয়োগের মাত্রা একেবারে সঠিক না হলে ভূত প্রয়োগকারীকেও ছাড়ে না, আর যার উপরে ভূত প্রয়োগ হচ্ছে, প্রভাব কেটে গেলে সে প্রয়োগের পূর্বের বহু কথাও বিস্মৃত হয়। আমার বিশ্বাস আমার গবেষণায় আমি এই ত্রুটি দূর করতে পারব। তার জন্য সময় লাগবে। মাস্টার ম্যাসন জানলে সে সময় আমাকে দেবেন না। ওঁর কাজ শেষ, কিন্তু আমার গবেষণা সম্পূর্ণ হয়নি। তোমায় বিশ্বাস করে বললাম। তুমি এখনই দয়া করে কাউকে এটা জানিয়ো না। মাস্টার ম্যাসনকেও না।”

“কথা দিলাম”, লখন বলল।

পরের দিন ল্যাবরেটরিতে ঢোকার আগেই গেটে দারোয়ান জানাল ডিরেক্টর সাহেব গোপালচন্দ্রকে ডেকেছেন। গোপাল একটু অবাক হলেন। স্বয়ং ডিরেক্টর তলব করেছেন! গুরুতর কিছু ঘটল নাকি? ডিরেক্টরের ঘরে যেতেই তিনি গোপালকে জানালেন, অনিবার্য কারণবশত গোপালচন্দ্রকে আর ক্যানিংহ্যাম ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে দেওয়া যাবে না। শুধু তাই না, বিশেষ কারণে কেউ, এমনকি গোপালচন্দ্রও আবার অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত সেই গবেষণাগারে প্রবেশ করতে পারবেন না। তাঁকে আবার মেডিক্যাল কলেজে ফিরে যেতে হবে। আগের মতোই সার্জারির কাজ করতে হবে। প্রায় তিন বছর সেই ল্যাবরেটরিতে ঠিক কী হল কেউ জানে না। কয়েক বছর বাদে, ১৮৯৮ সালে বম্বে ফেরত এক খিটখিটে বদরাগি সাহেব ডাক্তার কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়া নিয়ে কাজ করতে সেই গবেষণাগারে এলেন। ডাক্তারের নাম রোনাল্ড রস ।

৬।

পঞ্চদশ শতকে পর্তুগিজরা বাংলায় এসে দুটো নৌবন্দর দেখতে পায়। বড়োটি চট্টগ্রামে আর ছোটোটি আদিসপ্তগ্রামে, যার পর্তুগিজ নাম ছিল পোর্টো পিকোনো। ছোটো বন্দর। আদিসপ্তগ্রামে সমস্ত উত্তর ভারত থেকে পণ্য আসত। নদীতে নৌকার ছড়াছড়ি। কিন্তু নদীর গতিপথ বদলানোয় ক্রমশ চড়া পড়তে পড়তে একসময় আদিসপ্তগ্রাম বন্দর হিসাবে পরিত্যক্ত হয়। একই দশা হয় হুগলিরও। এদিকে আদিগঙ্গার ধারাও ক্রমশ তার নাব্যতা হারিয়ে কালো পচা জলের নালায় পরিণত হয়। অগত্যা উপায় না দেখে পর্তুগিজদের বড়ো বড়ো জাহাজগুলো নদীর আরও দক্ষিণে নাব্য এলাকায় নোঙ্গর ফেলত। অন্য পাড়ে শিবপুরের কাছে বেতড়ে তৈরি হল বিদেশিদের বাজার। বাজারের কেনা-বেচার বহর দেখে আকৃষ্ট হয়ে আদিসপ্তগ্রাম ছেড়ে চারটি নেটিভ বসাক পরিবার ও এক শেঠ পরিবার নদীর এপাড়েই গোবিন্দপুরে বাসা বাঁধে। বেতড়ের উলটো দিকে নতুন বাজার গড়ে ওঠে। নাম হয় সুতানুটি। সে অনেক কাল আগের কথা। ইংরেজরা এসে নদীর ধারে খোলামেলা এই জায়গার নাম দিয়েছিলেন গার্ডেনরিচ। সারাদিনের গরমে ক্লান্ত হয়ে সবাই সন্ধেবেলা হাওয়া খেতে আসতেন নদীর পারে।

এখন অবশ্য সেদিন আর নেই। ওই এলাকাতেই কলকাতা বন্দর গড়ে উঠেছে আর বন্দরকে কেন্দ্র করে নানা কলকারখানা। আগে বাংলায় চটকল ছিল না। ছিল সেই ডান্ডিতে। যদিও কাঁচামাল বয়ে নিয়ে যেতে হত এই বাংলা থেকেই। চতুর ইংরেজ আর স্কট ব্যবসায়ীরা দেখলেন এর চেয়ে গঙ্গার ধারে এই কলকাতার আশেপাশেই কল বানালে খরচা অনেক কম, মুনাফা বেশি। একে একে চটকল গড়ে উঠেছে কাঁকিনাড়া, বজবজ আর গার্ডেনরিচে। সাহেবরা এই মিলগুলো নিজেরা চালান না। চালান দেশি এজেন্সি মারফত। ফলে দেশি সদাগর আর বিদেশি শিল্পপতি মিলে লাভের গুড় খান আর মরে চটকলের সাধারণ শ্রমিকরা। গত তিন বছর যাবৎ প্রায়ই মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের বচসা বাধছে। শুরুতে গণ্ডগোল আয়ত্তে থাকলেও বকরি ইদের দিন কাঁকিনাড়া

চটকলে বাড়াবাড়ি রকমের ঝামেলা হল। বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশের চটকলগুলোতেও। কিন্তু গার্ডেনরিচে এই গণ্ডগোলের আঁচ পড়তে দেননি মালিক মাইকেল স্টুয়ার্ট। তিনি নিজে চটকল চালান। এজেন্সির মাধ্যমে না। ফলে শ্রমিকরা কিছু হলেও বেশি পারিশ্রমিক পায়। তাদের কোনও ক্ষোভ নেই। অন্ততস্টুয়ার্ট নিজে তেমনটাই ভাবতেন।

সেদিনও সকাল থেকে রোজকার মতোই কাজ শুরু হল। ফোরম্যান বুড়ো আবুল হাসান কলের বাঁশিতে সময়মতো ভোঁ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল চারিদিকের তদারক করতে। বাইরে থেকে সব স্বাভাবিক মনে হলেও আবুলের মনে কেমন কু ডাকছে। অন্যদিন সবাই ছড়িয়েছিটিয়ে নিজেদের মতো কাজ করে। আজ চার-পাঁচজন মিলে জটলা বেঁধে এক-এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কী যেন আলোচনা করছে। আবুল কাছে গেলেই চুপ মেরে যাচ্ছে। আবুলের অস্বস্তি শুরু হল। বছরখানেক আগে বেহার মুলুক থেকে শিউচরণ দুবে এই চটকলে যোগ দেবার পর থেকেই কারখানার পরিবেশ কেমন যেন বদলে গেছে। শিউচরণ একটু নেতা গোছের। বয়স কম। রক্ত গরম। সে মাঝে মাঝেই সবাইকে বোঝায় মালিক তাদের কতটা ঠকিয়ে মুনাফা কামাচ্ছে। আবুলকেও বোঝাতে এসেছিল। আবুল ভাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অন্য মুসলমান শ্রমিকরা তার কথা মন দিয়ে শোনে। এসব কথা শোনাও গুনাহ। যে মালিক তাকে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে, যার দয়ায়তার বউ, পাঁচ ছেলেমেয়ে বেঁচে আছে, তার নামে এসব না-পাক কথা শুনলে দোজখেও ঠাঁই হবে না। এখন সে শিউচরণের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু বুঝতে পারে ভিতরে ভিতরে শিউচরণ ঘোঁট পাকাচ্ছে। যে-কোনো দিন এই কলেও একটা গণ্ডগোল বাধবে। একবার ভাবে সে সাহেবকে সব বলে দেবে। তারপরেই ভাবে, বললেই সাহেব বলবে সন্দেহের তালিকায় কে কে আছে, তাদের নাম বলতে। আর নাম বললেই সাহেব তাদের চাকরি খাবে। সেটাও ঠিক না। এক হপ্তা হল কোথা থেকে ভাইপোকে এনে জুটিয়েছে। সে আবার দারোয়ানের কাজ করে। এদের কী মতলব কে জানে? অতএব চোখকান

খোলা রেখে চলে সে। আজকেও চলছিল। আর চলতে চলতেই প্রথমবার ছেলেটাকে চোখে পড়ল তার।

কুচকুচে কালো চেহারা। মাথায় পাতা কেটে আঁচড়ানো তেল চকচকে চুল। খাটো ধুতি পরা। চটকাটার মেশিনে জোরে ঘোরা চাকার পাশে দাঁড়িয়ে পাটের গুছি ঢোকাচ্ছে। আগে এই ছেলেকে কোনও দিন দেখেনি আবুল। একটু আগ্রহী হয়েই তার কাছে এগিয়ে গেল। ছেলেটা দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়ে একটা সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। যাক! সহবত জানে অন্তত। আর তখনই আবুল খেয়াল করল ছেলেটার কড়ে আঙুলের কিছুটা নেই।

"নাম কেয়া হ্যায় তেরা?" প্রশ্ন শুনে আবুলের মুখের দিকে ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে রইল ছেলেটা। আবুল বুঝল নেহাত গাঁয়ের ছেলে। সদ্য কলকাতা এসেছে। হিন্দি জানে না।

" নাম... কী নাম আছে তোর?"

"এজ্ঞে ভবতারণ জানা, এজ্ঞে", দুই হাত জোর করে মাটির দিকে চেয়ে মিনমিন করে বলল ছেলেটা।

"ঘর কোথা আছে?"

"এজ্ঞে, গাঁয়েরবাড়ি মিদনাপুরের বালিচকে।"

"তাহলে ইখানে কী করছিস?"

"এজ্ঞে, কায়েতের ছেলে। পড়াশুনো কিচু হলনি। বাবা বললে কলকেতায় গে দেখ যদি কিছু হয়। তা গাঁয়ের বিপিন মাইতিকে বলতে সে এই কলে টেনির কাজে ঢুকিয়ে দিলে। এক আনা রোজ।"

"ঠিক হ্যায়। মন দিয়ে কাজ শিখে নে", বলে বাইরে বেরোতেই শিউচরণকে আবার দেখতে পেল আবুল। গেটের সেই দারোয়ান ভাইপোর সঙ্গে ফিসফিস করে কী যেন বলছে আর আবুলকে আড়চোখে দেখছে....

দুপুরে খাবারের ঘন্টা পড়লে যোহরের নমাজ সেরে ওজু করে খেতে বসতে যেতেই আবার ছেলেটার দিকে চোখ পড়ল আবুলের। ছেলেটার মুখ বড়ো

মায়াভরা। চোখ দুটো বড়ো, টানা টানা। এক কোণে চুপচাপ বসে আছে। সামনে খাবারদাবার কিছু নেই। হাতছানি দিয়ে ডাকল আবুল, "এ ভবতারণ, ইধার আ।"

বুঝতে পেরে গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এল ছেলেটা।

"কুছু খাবার আনিসনি?"

উত্তর না দিয়ে পাশাপাশি মাথা নাড়ল, চোখ মাটির দিকে।

"কেন আনিসনি? কিনার পয়সা নেই?"

আবার সে আগের মতোই মাথা নাড়ল। আবুলের মনে হল চোখের কোনায় যেন জল চিকচিক করছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমান আবুল কাউকে অভুক্ত রেখে খেতে পারে না। কিন্তু এ কি তার হাতের ছোঁয়া খাবে? জিজ্ঞাসা করতে এককথায় রাজি হল ছেলেটা। রুটি আর সবজি আবুল ভাগ করে নিল তার সঙ্গে। কিন্তু জল? তার ঘাটির জল খাইয়ে সে এই ছেলের জাত মারবে না। ছেলেটা যখন বুভুক্ষুর মতো খাচ্ছিল, তখন একফাঁকে সে উঠে গেল জলের পাত্রের সন্ধানে। সেই সামান্য সময়ে ছেলেটার বাঁ হাত চলে গেল ফতুয়ার পকেটে। বেরিয়ে এল ছোটো একটা কাচের ডিবে, আর তাতে ভর্তি সাদা সাদাবড়ি। সবার অলক্ষে একটা বড়ি আবুলের ঘটির জলে মিশতেই সামান্য ফিসস আওয়াজ করে গুলে গেল। মাটির খুরিতে জল ভরে আবুল যখন ফিরে এল তখন ছেলেটার খাওয়া সবে শেষ হয়েছে। একগাল হেসে সে পাত্রটা আবুলের থেকে নিয়ে ঢকঢক করে একেবারে গোটা জলটা খেয়ে নিল। আবুল নিজেও ঘটির জল পুরোটা শেষ করে একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিল মুখ, মাথা, ঘাড়। এখনও হাতে খানিক সময় আছে। বিপিন মাইতি না কার একটা নাম বলল ছেলেটা, সে নাম আগে কোনও দিন শোনেনি আবুল। কোন ডিভিশনে কাজ করে কে জানে? ছেলেটাকে সবে জিজ্ঞেস করতে যাবে, আর তখনই আবুলের কানে এল আওয়াজটা। একটা হইহই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে যেন.... ভিতরের গেটের একপাশে

শিউচরণের সেই ভাইপো দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখছে। আর কোনও দিকে খেয়াল না করে আবুল সব ফেলে তড়িঘড়ি ছুট লাগাল আওয়াজের উদ্দেশে।

মাইকেল স্টুয়ার্ট কারখানার মেইন গেট বন্ধ করার আদেশ দেবার ঠিক আগে ক্ষিপ্র বিড়ালের মতো লখন সবার অলক্ষে কারখানা থেকে বেরিয়ে গেল। আবুল ততক্ষণে হাসি হাসি মুখে দৃঢ় হাতে শিউচরণের ভাইপো কানাইয়ালালের টুটি টিপে ধরেছে...

৭।

"ভিতরে এসো ল্যানসন। সামনে এসে বোসো। কাজ চলছে?"

"হ্যাঁ, মাস্টার।"

"জানি। আমার কানেও খবর এসেছে। ব্রাদারহুডের সৈনিক হিসেবে তুমি যা করছ, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।"

"ধন্যবাদ মাস্টার।"

"ভূতের কার্যকারিতা কেমন?"

"যেমন আন্দাজ করা গেছিল তেমন।"

"সে তো হবেই ল্যানসন, সে তো হবেই। কিন্তু যেটা আসল কথা, প্রয়োগের পরে কাজ হতে কত সময় লাগছে?" "সেটা দেখার জন্যেই তো এই পরীক্ষাগুলো করছি মাস্টার। তবে এতদিনে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন মানুষের উপরে ব্যবহার করে একটা জিনিস বোঝা গেছে, এই বড়ি কাজ করতে কুড়ি মিনিট থেকে দেড় ঘণ্টা অবধি সময় নেয়।"

"কার ক্ষেত্রে কত নেবে সেটা বোঝার উপায় আছে?"

"হয়তো আছে। সবচেয়ে কম সময় লেগেছিল গার্ডেনরিচে, কুড়ি মিনিট। সবচেয়ে বেশি সেই কিলবার্ন কোম্পানির ইলেকট্রিক মিস্তিরির বেলায়। আমি

প্রায় হাল ছেড়েই দিয়েছিলাম। পরে বুঝলাম গোটাটাই ওজনের উপরে নির্ভর করে। যার ওজন যত বেশি, তার ক্ষেত্রে এই বড়ির কাজ হয় তত দেরিতে। গার্ডেনরিচের আবুল ছিল রোগাপাতলা লোক, কিন্তু কিলবার্নের সেই...."

"বুঝেছি। খুব ভালো। এবার তোমাকে কয়েকটা জরুরি কথা বলছি। মন দিয়ে শোনো।"

"বলুন মাস্টার।"

"এতদিন নানা জায়গায়, নাম ভাঁড়িয়ে ছদ্মবেশে তুমি যে কাজগুলো করেছ, ব্রাদারহুড তার জন্য তোমার কাছে ঋণী। কিন্তু আজ এই মুহূর্ত থেকে তোমার সেসব কাজ বন্ধ। আবার লুকিয়ে পড়ো। যেন কেউ আর তোমায় না দেখতে পায়। "

"কিন্তু কেন মাস্টার?"

"তুমি জানো না, নাকি জেনেও অস্বীকার করছ যে তোমার পিছনে পুলিশ লেগেছে?"

"প্রিয়নাথ দারোগা?"

"সে তো আছেই। সঙ্গে বিলেত থেকে আসা এক ধুরন্ধর গোয়েন্দা সাইগারসন-ও রয়েছে। তুমি এদের চেনো?"

"হ্যাঁ। ডালান্ডায় দেখেছিলাম। তখন চিনতাম না। নাম ভাঁড়িয়ে এসেছিল। পরে চিনেছি।"

"তারা হন্যে হয়ে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"কিন্তু আমায় কেন?"

"দলের মধ্যেই কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তোমার পরিচয় ওদের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছে।"

"কে সে?"

"আমাদের একজনকে সন্দেহ ছিল। খুব সম্ভব সে-ই।"

“নামটা বলুন...”

“তুমি তো বাংলা পড়তে পারো। দ্যাখো দেখি, এই নাটকটা চেনো?”

“এটা তো.... কিন্তু শৈল শপথ নিয়েছিল জীবনে আর নাটক লিখবে না। ও এ কাজ করবে কেন?”

“করবে শুধু না, করেছে। তুমি বিজ্ঞাপন অংশের প্রতি প্যারার প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো মিলিয়ে দ্যাখো।”

“বি-ক-তো-রি-আ! সে কী!!”

“শুধু তাই না, আমাদের গোটা প্ল্যানের কথা সাঁটে এই নাটকে লেখা আছে।”

“কিন্তু কেন? ব্রাদার শৈলর মতো মানুষ... শৈল কী বলছে?”

“সে কিছু বলার জায়গায় নেই। ওরা শত্রুর শেষ রাখেনি। কাল রাতে শৈল চুঁচুড়ায় এসেছিল, ওখানেই ওকে খুন করা হয়। মৃতদেহ সকালে উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু সেটা বড়ো কথা না। খুন করা হয়েছে একেবারে টেক্সটবুক জাবুলনদের পদ্ধতিতে। পেট চিরে দুই ফালা, মুখে অণ্ডকোশ কেটে ঢোকানো।”

“তবে কি ব্রাদারহুডেরই কেউ....”

“আমার আদেশ ছাড়া ব্রাদারহুডের কারও সাধ্যি হবে না শৈলর গায়ে হাত দেবার। এ কাজ বাইরের কেউ করেছে। প্রমাণ লোপাট। আর যদি তাই হয়, তবে বিপদটা বুঝতে পারছ? এ এমন কেউ যে আমাদের ভিতরের সবরকম খবর রাখে, আর শুধু রাখেই না, এইভাবে খুন করে ব্রাদারহুডকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করতে পারে।”

“কোনও ধারণা করেছেন সে কে হতে পারে? প্রিয়নাথ বা সাইগারসন?”

“এঁরা সজ্জন মানুষ। আইন নিজের হাতে নেবার লোক নন। একটা নাম...”

“কী নাম?’

“একটা নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে বাতাসে। অশরীরীর মতো। ম্যানুয়েল ডিব্যাসি। সে যে কে, কোথা থেকে কী উদ্দেশ্য, কিছুই এখনও জানা যায়নি। আমরা খোঁজ

চালাচ্ছি। কিন্তু সবার আগে দরকার তোমার একেবারে লুকিয়ে পড়া। শৈলর ঘটনার পরে আমি আর কোনও ঝুঁকি নেব না। তোমরা তিনজন কিডস্ট্রিটের বাড়ি ছেড়ে ব্রাদারহুডের মূল বাড়িতে চলে এসো। আমার আদেশ।”

“কিন্তু মাস্টার, একেবারে অশরীরী একজনের জন্য...”

“দাঁড়াও দাঁড়াও! তোমাকে তবে একটা জিনিস দেখাই। এই ব্রোমাইড ফটোতে একজনকে রাজভবনের বাইরে দেখা যাচ্ছে, দ্যাখো দেখি তাকে চেনো কিনা?”

“এ কী!! কিন্তু আমিতো...”

“জানি। তোমার অজ্ঞাতেই এই ছবি তোলা। হীরালাল সেন নামে এক শখের ফটোগ্রাফার রাস্তাঘাটের ছবি তোলে। তার ক্যামেরাতেই তোমার এই ছবি বন্দি হয়েছে। শুধু হয়নি, লালমোহন মল্লিকের বাড়িতে পর্দা টাঙিয়ে দেখানোও হয়েছে। দর্শকদের মধ্যে আমাদের এক ব্রাদার ছিলেন। তিনি চড়া দামে ছবিটা কিনে নেন। কিন্তু এর কোনও কপি আছে কিনা আমাদের জানা নেই। তাই তুমি এখন অচেনা না। পুলিশের হাতে এই ছবি এলে কী হতে পারে ভেবেছ? কিংবা সেই খুনির হাতে?”

“তবে আমার কী কর্তব্য?”

“সবার আগে দ্রিনা আর মারিয়ানার সুরক্ষা। তারপর তোমার সুরক্ষা।”

“আর আমার কাজ?”

“অন্য কেউ করবে। তোমাকে আর যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যাবেনা। এমনকি তোমার কাছে যে বাক্সটা গচ্ছিত আছে সেটাও কিছুদিনের জন্য অন্য কাউকে দিতে হবে। মুশকিল হল তেমন যোগ্য লোক পাওয়া মুশকিল।”

“আমার একটা কথাছিল।“

“বলে ফেলো।”

“একজন আছে। হাতসাফাইয়ের কাজে আমার চেয়েও দড়। সত্যি বলতে ভোজবাজি আমরা একই গুরুর থেকে শিখেছিলাম।”

“অ্যাংলো? খ্রিস্টান?”

“নাহ। হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনকূলে কেউ নেই। আমার কথা বেদবাক্যের মতো মানে।”

“কীকরে?”

“জাদুর খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। আগে রাস্তায় দেখাত। এখন ধনী মানুষদের বাড়ি গিয়ে গিয়ে দেখায়।“

“বিশ্বাস করা যায়?”

“চোখ বুজে। সত্যি কথা বলতে কি, আমিও চাইছিলাম ওর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করতে। আজ রাতেই ওর আস্তানায় আসার কথা।”

“তাও একবার পরীক্ষা করে নাও। দরকার হলে ওকে আমাদের ব্রাদারহুডে নিয়ে এসো। ব্রাদারহুডের অনুশাসনে না এলে তাকে কোনও কাজের দায়িত্ব দেওয়া যাবেনা।”

“একেবারেই সহমত মাস্টার।”

“আর দেখো, কোনওমতে দলের বাকিদের নাম, আমার নাম ইত্যাদি যেন এর কাছে প্রকাশ না পায়।”

“তাই হবে মাস্টার।”

“তবে কাজ শুরু করে দাও। সময় নেই। মাত্র কয়েকমাস। তারপরেই... কী নাম তোমার এই জাদুকর বন্ধুর?” “গণপতি। গণপতি চক্রবর্তী।”

শৈলর কথা

১।

সবে তখন সিপাই বিদ্রোহ শেষ হয়েছে। আগুনের আঁচ ধিকিধিকি জ্বলছে সারা ভারত জুড়ে। ঠিক এমন সময় কলকাতার অদূরেই চুঁচুড়ায় অন্য এক আগুন ঘনিয়ে উঠল। যদিও শুরুতে কেউই বুঝতে পারেননি যে এমনটাও হতে পারে। বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথা নিয়ে বছর চারেক আগে রামনারায়ণ তর্করত্ন একখানা নাটক লিখেছিলেন। নাম "কুলীনকুল-সর্বস্ব"। কালীসিংহী নিজের বাড়িতে এই নাটকের অভিনয় করালেন। ওরিয়েন্টাল থিয়েটারের প্রিয়নাথ দত্ত নিজে এই নাটকে অভিনয় করলেন। তাঁরই উদ্যোগে তাঁর মামা গদাধর শেঠের বাড়িতেও এই নাটকের অভিনয় হল। যে-ই দ্যাখে, সে-ই ধন্য ধন্য করে। খবর ছড়াতে দেরি হলনা। ১৮৫৮ সালের ৩ জুলাই চুঁচুড়ায় নরোত্তম পালের ছেলে শ্রীনাথের উৎসাহে প্রথমবার "কুলীনকুল- সর্বস্ব" অভিনীত হল। গায়ক রূপচাঁদ পক্ষী নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই নাটকের অভিনয়ের জন্য গান রচনা করে অভিনেতাদের তালিম নিলেন। নাটকে প্রায় নয়শো লোক ভিড় জমিয়েছিলেন। এত ভিড় চুঁচড়োর মানুষ আগে কোনও বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে দেখেননি। দুর্গাপুজোতেও না। নাটক দেখে সবাই যখন বেরোচ্ছে, প্রায় সবাই গুনগুন করে নটীর গান গাইছে, "অধীনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে।" অল্পেতে স্বাদ মেটে না। ঠিক হল দুইদিন বাদে ৫ জুলাই আবার এই নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় হবে। এদিকে খবর পৌঁছে গেল গঙ্গার অপর পাড়ে ভাটপাড়ায়। ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা শুনলেন তাঁদের অপমান করে নাটুকে নারায়ণ নাটক বেঁধেছে, আর চুঁচড়োর পালবাড়িতে মহাসমারোহে সেই "এটোপ্লে" হচ্ছে। দুনিয়ার পেচাপেটি লোক দেখছে আর তালি বাজাচ্ছে। আর যায় কোথায়? একদল কুলীন ব্রাহ্মণ বেশ কয়েকটা নৌকা ভাড়া করে গঙ্গা পেরিয়ে এপারে এসে পালবাড়িতে চড়াও হলেন। দাবি একটাই, "এ নাটক অশ্লীল। এ নাটক দেখানো যাবেনা।" প্রায়

মারামারি বাধার উপক্রম, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণরা এমনদুটো ব্যাপার জানতে পারেন, যা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। এক, রামনারায়ণ নিজে ভাটপাড়ার বামুন বংশের ছেলে, আর দ্বিতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, নরোত্তম পালের প্রচুর টাকাপয়সা। তিনি টাকা দিয়ে বামুনদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। নাটক যথাসময়ে অভিনীত হল। কিন্তু সমাজের রোষে পড়ার ইতিহাস বাংলা নাটকের সেই প্রথম।

এই ঘটনায় শাপে বর হল। কলকাতার পাশাপাশি চুঁচুড়াতেও নাটকের দল গড়ে উঠতে লাগল। চুঁচুড়ার কদমতলায় অক্ষয় সরকারের বাড়িতেও এমন একটা নাটকের দল গড়ে উঠল। অক্ষয় সরকার এককালে নবজীবন নামে একটা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ কে লেখেননি তাঁর সেই পত্রিকায়! এখনও কলকাতার বড়ো বড়ো দিগগজরা তাঁকে একডাকে চেনে। ইদানীং তাঁর শখ জেগেছে থিয়েটারের।

পুজোর কিছু আগের কথা। ঠিক হল এবার ঘটা করে “প্রহ্লাদচরিত্র” অভিনীত হবে। প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা নাটমন্দিরে “প্রহ্লাদচরিত্র” রিহার্সাল হয়। অক্ষয় সরকার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদবির করেন। আর প্রতিদিনই নাটমন্দিরের ঠিক পাশের ভাঙা পাঁচিলে এক যুবককে বসে থাকতে দেখেন তিনি। সে একেবারে বিরক্ত করে না। শুধু ঠায় বসে থাকে আর তাকিয়ে থাকে তাঁদের দিকে। ভাঙা পাঁচিলটির মালিক একজন বৃদ্ধা। তাকে নগদ দুটো পয়সা দিলেই পাঁচিলের উপর বসে থিয়েটার দেখতে দেয়। পাঁচিলটির আরও মজা আছে। পাঁচিলের উপর থেকে থিয়েটারের সদর অন্দর দুটোই পরিপাটি করে দেখা যায়। যুবক দ্যাখে, কেমন করে অন্দরমহলে বসে নারদ হুঁকোয় দম নিয়েই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে “নারায়ণ নারায়ণ” বলে স্টেজে ঢুকেছেন! অক্ষয় সরকার সব দেখেন। কিছু বলেন না।

একদিন তিনি ছেলেটিকে ডেকে নিলেন। প্রথমে উলটে পালাতে গেছিল। পরে ন্যাপলা সহ তিন-চারজন দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে আনল। ছোটোখাটো চেহারা, মুখে লালিত্যের ভাব। ভগবান যেন মেয়ে বানাতে গিয়ে মুহূর্তের ভুলে

একে ছেলে বানিয়ে দিয়েছেন। আচরণেও মেয়েলি ভাব স্পষ্ট। অক্ষয় সরকারের সামনে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল সে।

"নাম কী?" খুব নরম সুরেই জিজ্ঞেস করলেন অক্ষয়।

"আজ্ঞে শৈলচরণ। শৈলচরণ সান্যাল। পিতা রমাপ্রসাদ সান্যাল।"

"আরে বলো কী হে! তুমি রমার ছেলে? তোমার বাবা তো এককালে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। আমরা এক আখড়ায় কুস্তি করতাম। তোমার আগে দুই দাদা আছে না? তারা কী করে?"

"আজ্ঞে কুস্তি করে।"

"আর তুমি? তুমি কুস্তি করো না?" বলেই অক্ষয় বুঝলেন প্রশ্নটা নেহাত বেফাঁস হয়ে গেছে। এই চেহারা আর এই গঠনে আর যাই হোক তৃপ্তি হয় না। তার জন্য অন্য ধাতু দরকার।

ছেলেটি অবশ্য এ কথায় কিছু মনে করল না। সরল মুখে বলল, "আজ্ঞে না। আমার ওসব ভালো লাগে না।"

"তবে কী ভালো লাগে? নাটক দেখতে?"

"আজ্ঞে, লেখালেখিও করি কিছু।"

"নাটক করার ইচ্ছে আছে?"

ছেলেটি বোধহয় এমনটা আশা করেনি। সে হাঁ করে অক্ষয় সরকারের দিকে তাকিয়ে রইল। অক্ষয় ন্যাপলাকে বললেন, "ওরে ন্যাপলা, একে একটা বই দে দিখি। কেমন পার্ট পড়ে, শুনে দেখা যাক!"

ন্যাপলা বই এগিয়ে দিতে যেতেই হাত বাড়িয়ে মানা করল ছেলেটা। তারপর গলার উড়নি মাথায় পেঁচিয়ে ঘোমটার মতো করে হাত নেড়ে হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুর পার্ট বলা শুরু করলে-

"আগে পুত্রকে সিংহাসনে বসাও, তারপর মহারানি সম্বোধন করো; নতুবা ও সম্বোধন আমার কানে বিদ্রুপ শোনায়, সেনাপতি! বড়ো রাজার মৃত্যুর পর যদি একদিনও দৈত্যনাথ সিংহাসনে বসে যেতেন, তা হলেও মহারানি কথার

সার্থকতা আমার থাকত; কিন্তু তা হয়নি। তারপর নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও যদি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে যেতেন, তা হলেও আমার রাজমাতা বা মহারানি সম্বোধনের মূল্য থাকত। কিন্তু এ যে সবই বিপরীত হয়ে গেল, সেনাপতি! হা, অতিরিক্ত ভ্রাতৃশোকে তার বুদ্ধিবিপর্যয় ঘটেছিল। তার সে মহাত্রুটির সংশোধন আমাকেই এখন করে নিতে হবে। তুমি যখন আমার হস্তগত, এক ফুৎকারে সব উড়িয়ে দেব। সব ভেঙে দেব।"

"চমৎকার! অতি চমৎকার! শুধু শুনেই এত!" নিজের অজান্তেই ফ্ল্যাপ দিয়ে উঠলেন অক্ষয় সরকার। "শুধু গলায় একটু নজর দিতে হবে। ওসব হয়ে যাবে। ন্যাপলা, তুই এক কাজ কর। ছেনোকে বলে দে ওকে আর কয়াধুর পার্ট করতে হবে না। আমি আমার কয়াধুকে পেয়ে গেছি। শোনো হে ছোঁড়া, একজনকে বাদ দিয়ে তোমায় নিচ্ছি। মান বজায় রেখো।"

ছেলেটি ইতস্তত করে।

"কিছু বলবে?"

"আজ্ঞে একটাই কথা ছিল। আমার বাবা দাদারা এসব পছন্দ করেন না। আপনি দেখবেন তাঁরা যেন না জানেন।"

"নাটক মঞ্চস্থ হলে তো জানতেই পারবেন।"

"পারবেন না। তখন তো মেক-আপ নিয়ে থাকব। আর আমাদের বাড়ির কেউ থ্যাটার দেখা পছন্দ করে না।" "হ্যান্ডবিলে তো তোমার নাম থাকবে।"

"বদলে দেবেন।"

"কী দেব?"

"আজ্ঞে, কুমারী শৈলবালা দাসী।"

গলা সাধার একটা উপায় একটা বার করা হল। ঘন্টাঘর থেকে কিছু দূরে একটা নির্জন ঘাটের নিচে খানিকটা সিমেন্ট দিয়ে আর খানিকটা পোস্তা বাঁধানো। চতুর্দিকে মাঠ, বন। গলা সাধার পক্ষে অতীব চমৎকার জায়গা। সারা দুপুর গলা

সাধার কসরত চলে শৈলর। প্রাণপণে চিৎকার করতে হয়। গলার শির ফুলে যায়, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে আসে। তবু সে গলা সাধা থামায় না।

পুজোতে “প্রহ্লাদচরিত্র” নাটকে কয়াধু চরিত্রখানি দুইখানি সোনার মেডেল পেল। একটা দিলেন শ্রীনাথ পাল স্বয়ং, আর অন্যটা চুঁচুড়োর ভট্টচার্য বাড়ির গিরীন ভট্টচার্য। অক্ষয় সরকারের দলে নারী চরিত্রে শৈলর স্থান পাকা হয়ে গেল।

২।

সাইগারসন দেশে ফেরার পর তারিণীর অবস্থা আবার সেই আগের মতো একটেরে হয়ে গেল। বরং আরও খারাপ হল। এর আগে নিজের ছোটো অফিস, ছোটো কেস নিয়ে একরকম কাটিয়ে দিচ্ছিল। মাঝের এই কয়দিন যেন ঝড়ের মতো এসে তার জীবন পুরো ওলটপালট করে দিয়ে গেছে। ম্যাজিকের মঞ্চে এক সন্ধ্যায় দুই জাদুকরের মৃত্যু, চিনা গুপ্তঘাতকের দল, রক্ত পরিবর্তন, সব মিলেমিশে যে উত্তেজনা সদ্য কাটিয়ে উঠেছে সে, তা এখন ভাবলে অলীক স্বপ্ন বোধ হয়। জোয়ার চলে যাবার পরের পলির মতো ওই দুঃসহ দিনগুলোর স্মৃতি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। প্রিয়নাথ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তার মতো ছাপোষা লোককে সময় দেবার সময় তাঁর নেই। মাঝের এই কেসের ফলে সবচেয়েবড়ো যে ক্ষতি হয়েছে, তার বেশ কিছু বাঁধা মক্কেলের কাজ সে সময়মতো করে দিতে পারেনি। ফলে তারা অন্য গোয়েন্দা ধরেছে। এক অর্থে তারিণী এখন কর্মহীন। আবার সে ঘুরে ঘুরে পুরোনো মক্কেলদের সঙ্গে দেখা করছে। যদি কেউ কোনও কাজ দিতে পারে। সাহেবদের অনেকেই দেশে ফিরে গেছেন। নেটিভরা দরকার মতো তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছে। এখন এমন ভাব করছে, যেন কোনও দিন দেখেইনি।

সেদিন লোয়ার সার্কুলার রোডের এক সাহেবের বাড়িতে গেছিল তারিণী। ফেরার পথে দেখতে পেল জোড়া গির্জার সামনে মাটি খুঁড়ে কাঠের বেড়া লাগানোর কাজ চলছে। আগে এই গির্জা আমহার্স্ট স্ট্রিটে ছিল। তখন কোনও চূড়া ছিল না বলে লোকে ন্যাড়া গির্জা বলত। সে গির্জা ভেঙে পড়ায় ইদানীং নতুন জায়গায় নতুন করে গির্জা তৈরি হয়েছে। এবার অবশ্য আগের বারের চূড়ার হিসেব মেলাতে দুইখানি চূড়া বানিয়েছেন সাহেবরা। আনতে গির্জা একটা হলেও লোকে জোড়া গির্জা ডাকে। তারিণীর হাতে তেমন কোনও কাজ নেই। সে খানিক কোমরে হাত দিয়ে কাজ দেখতে লাগল। লম্বা কালো আলখাল্লা পরা কিছু সাহেব পাদ্রির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে দুই-একজন নেটিভ। তাদেরই একজনকে দেখে চমকে উঠল তারিণী। শৈল না? রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভিড় প্রচুর। তারই মধ্যে কোনওমতে রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে গিয়ে সে শৈলকে চেপে ধরল। শৈলও তাকে দেখে অবাক! এতদিন বাদে তারিণীকে দেখবে আশা করেনি।

"এখানে কী করচ ভাই?" তারিণী শুধাল।

"সে অনেক কথা। ফুরসতে বলা যাবেখন। হাতের কাজটা সেরে নিই।"

"হাতের কাজ! বলো কী হে! তুমি হিন্দু বামুনের ছেলে, তুমি কিনা ভাখুইয়ে, মান খুইয়ে কেরেস্তানি গির্জায় জন খাটচ? কত বড়ো বাড়ির ছেলে তুমি!"

"আর বাড়ি! বাবা আমায় ত্যাজ্যপুত্তুর করেচেন ভাই।"

"সে কী! কেন? আর অক্ষয় সরকারের দলে যে নাটক করতে? সেখানে ঠাঁইদিলে না?"

"সেকান থেকেই তো গণ্ডগোল!"

"আর ন্যাশনাল? সেখানেই তো ছিলে এতদিন। নাটক ছেড়ে দিলে?"

শৈলর চোখ জলে ভরে এল, "সে অনেক কতা ভাই। তোমায় পরে সব বলবখন।"

"পরে আবার কখন? তোমায় আমি ছোটো থেকে চিনি। এই জন খাটার জন্য। ভগবান তোমায় তৈরি করেননি। তুমি এসো দেকি আমার সঙ্গে।"

"কোতায়?"

"ক্লাইভ স্ট্রিটে আমার ছোটো একখানা আপিস আচে। আমার যদি দুবেলা দুমুঠো জোটে, তোমারও জুটে যাবে। আর নেহাত না ফুটলে হরিমটর", তারিণী একটু হাসির চেষ্টা করল। "এখন চলো দেকিনি আমার সঙ্গে। মুক দেখে মনে হয় কতদিন কিচুখাওনি। শ্যালদার কাচে ভালো কচুরি, সবজি আর জিলিপি ভাজে। খাওয়ার চলো।"

খানিক ইতস্তত করে শৈল বললে, "এরা যে এক আনা পয়সা দেবে বলেচে।"

"রাখো সে পয়সা। তোমার মতো ছেলের পক্ষে ওই পয়সা নেওয়া পাপ।"

খানিক কীসব ভেবে শৈল তারিণীর পিছু নিলে। শিয়ালদায় খাওয়াদাওয়া করে, ক্লাইভ স্ট্রিটে তারিণীর ঘরে গিয়ে বসল দুজনে। অগোছালো ঘর। যেমন অবিবাহিত পুরুষদের থেকে আশা করা যায়। এক প্রান্তে একটা খাটিয়া পাতা। পাশে বেশ কিছু তাস, বড়ো একটা টুপি আর কিছু রঙিন কাগজ ছড়ানো। একধারে দুটি বড়ো দিশি মদের বোতল।

"এগুলো কীসের? তুমি আবার নেশাও ধরেচ নাকি?"

একগাল হেসে তারিণী বললে, "না হে! তোমার এক পুরোনো বন্ধু মাঝে মাঝেই একানে থাকেন কিনা। এসব তাঁরই অবদান।"

"কে? গণপতি? তার কী খবর?"

"খবর ভালোই। দর্জিপাড়ায় একন আর থাকে না। এদানি বেশ নামডাক হচ্চে। শো-এর কাজে প্রায়ই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। সবই ভালো, শুধু এই কারণবারিই তাকে খেলে। কত মানা করি... শুনবেই না।"

শৈল কিছু বলে না একেবারে গুম মেরে বসে থাকে।

"এবার তুমি বলো দেখি, সব কতা খুলে। চুঁচড়ো থেকে কলকেতায় পথ্থম যকন এলে তখন কিছু শুধাইনি। কিন্তু আজ তোমায় ওভাবে দেকে বড্ড কষ্ট হচ্চে। আমায় যদি বন্ধু মানো, তবে কিছু লুকিয়ো না।"

শৈল খানিক ফাঁকা দৃষ্টিতে তারিণীর দিকে চেয়ে রইল। তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। তারিণী এটা আশা করেনি। সে যত্ন করে শৈলর চোখের জল মুছিয়ে দিল। পিতলের ঘটি করে জল এনে দিল। সে জলের কিছু গলায় ঢেলে, কিছুটা মুখে, ঘাড়ে মাথায় দিয়ে সামান্য শান্ত হল শৈলচরণ। তারপর শুরু করল তার অদ্ভুত আখ্যান-

চুঁচুড়ায় 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয়ের পরে অক্ষয় সরকারের দলে শৈলর স্থান একরকম পাকা হয়ে গেল। তারপর একে একে 'মীরাবাই'-এর মীরা, 'জনা'-তে স্বয়ং জনা, 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডি ম্যাকবেথ- যে-কোনো নাটকে প্রধান মহিলা চরিত্র মানেই শৈল। হ্যান্ডবিলে অবশ্য শৈলবালা। প্রায় সবকটি নাটকেই তার বিপরীতে নায়কের ভূমিকায় থাকতেন ব্যোমকেশ সরকার। অক্ষয়ের বড়ো ছেলে। প্রেসিডেন্সি পাশ। সদ্যবিবাহিত। কিন্তু কোনও সন্তানাদি নেই। সেই ব্যোমকেশ মঞ্চের প্রেমকে বাস্তব করে তোলার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। প্রথমে শৈল বাধা দিয়েছিল। কিন্তু ব্যোমকেশকে ঠেকানো সহজ নয়। রিহার্সালের ফাঁকে, নাটকের সময় যেন আলগোছেই তাঁর হাত স্পর্শ করত শৈলর গোপনতম অঙ্গগুলোতে। সেই শিহরন উপেক্ষা করতে পারেনি শৈলও। সে ব্যোমকেশকে নিজের সবকিছু দিয়ে দিতে বাধ্য হয়। তারা দুজনেই জানত এ সম্পর্কের কোনও পূর্ণতা নেই। কিন্তু ভালোবাসা কোনদিন এত কিছু ভেবেছে! যেটা ভাবতে পারেনি, সেটা হল অত তাড়াতাড়ি অক্ষয় সরকার ওদের দুজনকে গ্রিনরুমে দেখে ফেলবেন। দলের কেউ নিশ্চয়ই খবর দিয়েছিল। ব্যোমকেশ গোটা দোষ খুব স্বাভাবিকভাবেই শৈলর উপর চাপান। তাঁর নাকি এসবে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। শৈলই ক্রমাগত তাঁকে ফুসলিয়ে... ফলে অক্ষয় সরকার তাকে দল থেকে

তাড়ালেন। খবর পেয়ে শৈলর বাবাও ত্যাজ্য পুত্র করলেন তাকে। কলকাতা আসা ছাড়া শৈলর আর গতি রইল না।

এর পরের অংশ কিছুটা জানে তারিণী। কলকাতায় এসে রামানন্দ পালের বাড়িতে নাট্যসমাজে যোগ দেয় শৈল। অবশ্য অভিনেতা হিসেবে না। নাট্যকার হিসেবে। নাট্যসমাজ-এর বাঁধা নাট্যকার গোপেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রামানন্দবাবুর সঙ্গে হিস্যা নিয়ে করে স্টারে যোগ দেন। রামানন্দ আতান্তরে পড়লে এই শৈলই "কলকেতার কালোয়াতি" নামে এক প্রহসন লিখে তাঁকে বাঁচায়। প্রহসন শৈলর দক্ষতা ছিল দেখার মতো। হাসির গান লেখায় তার জুড়ি ছিল । "গুরুদেব স্যাঙাৎ সংবাদ" নাটকে তাঁর লেখা "ব্রান্ডি এল ঠান্ডি গেল পাণ্ডা হল কাত" গান মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এমনকি নাটকের শুরুতে যে জাদু দেখানো হত তাতে জাদুকর গণপতিও হারমোনিয়াম বাজিয়ে শৈলর গান গাইত।

রামানন্দ চেয়েছিলেন শৈল নাট্যসমাজেই থাক। কিন্তু দুটো সমস্যা হল। এক রামানন্দ শৈলকে দিয়ে নাটক লেখালেও তাঁকে অভিনয়ে চাপ দিতে চাইতেন না। খুব সম্ভবত অক্ষয় সরকারের দলের ঘটনা তাঁর কানে এসেছিল। অন্যদিকে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রায় দেড়া দামে শৈলকে তাদের দলে যোগ দেবার প্রস্তাব দেয়। শৈলর কাছে এ এমন প্রস্তাব যা অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তবে সে শর্ত দেয়, লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অভিনয়েও সুযোগ দিতে হবে। প্রথমে রাজি না হলেও পরে ছেলে দানীবাণুর অনুরোধে গিরিশ ঘোষ রাজি হলেন।

ন্যাশনালে শৈলর প্রথম অভিনয় 'আদর্শ সতী' নাটকে। নায়িকার সঙ্গীর ভূমিকায়। তারপরেই তার উল্কার গতিতে উত্থান। বিদ্যাসুন্দর-এর বিদ্যা, নবীন তপস্বিনীর তপস্বিনী, সরোজিনী আর কৃষ্ণকুমারীতে নামভূমিকায়। গিরিশ ঘোষের বয়স হয়েছে। আজকাল সব নাটক দেখতে আসেন না। ছেলের অনুরোধে নল-দময়ন্তী দেখতে এসে শৈলর অভিনয় দেখে দাঁড়িয়ে উঠে ক্ল্যাপ দিয়েছেন তিনি। ন্যাশনালে এমন সৌভাগ্য এক ভুনিবাবু আর বিনোদিনী ছাড়া আর কারও হয়নি। শৈলর খ্যাতি যখন প্রায় মধ্যগগনে, তখনই অনর্থ ঘটল।

ন্যাশনালে দানীবাবুর কিছু ইয়ার দোস্ত ছিল। এদের পান্ডা রামতারণ বসু নামে এক বড়োলোকের ছেলে। ন্যাশনালে তার বাপ ভালো পয়সা ঢালে, সেই সুবাদে সে অভিনেতা। অভিনয়ের "অ" জানে না। কিন্তু প্রত্যেক নাটকে তার থাকা চাই। ধনী বাধ্য হয়ে ছোটো ছোটো রোল দেন তাকে। চুচ্চুরে মাতাল হয়ে নাটকের রিহার্সালে আসে, পার্ট ভুলে যায়, কিন্তু তার আসল নজর নাটকের মেয়েদের দিকে। নতুন কোনও মেয়ে এলেই ছলে বলে কৌশলে রামতারণ তাকে অঙ্কশায়িনী করে। অবশ্য এই ব্যাপারে সে উদার। একা ভোগ করার পক্ষপাতী সে নয়। তার বাগানবাড়িতে চার-পাঁচজন ইয়ার মিলে একত্রে ভোগ করে সেই ষোড়শী মেয়ের অপরিণত শরীর। অনেকসময় তাদের যৌনতার বিকৃতি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে বহু মেয়ে প্রায় এক পক্ষকাল বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। সবাই সব জানে। কেউ কিছু বলে না।

শৈলরই দুর্ভাগ্য, মুখ বদলাবার জন্য রামতারণের নজর পড়ল তার দিকে। প্রথমে ঠারেঠোরে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, বলেছিল শৈলকে তার বাগানবাড়িতে যেতে। শৈল রাজি হয়নি। শেষে একদিন রিহার্সালের শেষে অভিনয়ের অছিলায় শৈলকে জড়িয়ে চুম্বনের চেষ্টা করে রামতারণ। শৈল কোনওক্রমে তাকে ঠেলে পালিয়ে যায়। সেদিন রিহার্সালে দানীবাবু নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রামতারণকে মৃদু ভর্ৎসনা করেন। এতে হিতে বিপরীত হয়। রামতারণের দল হিংস্র হয়ে ওঠে। একদিন রিহার্সাল শেষে ফেরার সময় তারা শৈলর পিছু ধাওয়া করে। শৈল পালাতে যায়। লাভ হয় না। রামতারণ ও তার বন্ধুরা এক গলির ভিতরে তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একে একে পায়ুমন্থন করে। যন্ত্রণায় প্রায় চারদিন শয্যাশায়ী ছিল শৈল। সুস্থ হয়ে ন্যাশনালে ফিরে সে দানীবাবুকে গোটা ঘটনা জানায়। দানীবাবু গিরিশ ঘোষকে। বিচার বসে। বিচারে অন্তত দশজন সাক্ষ্য দেয়, সেই দিন রিহার্সালের পর রামতারণ জুড়িগাড়ি চেপে সোজা বাড়ি ফিরে গেছিল। সাক্ষীদের মধ্যে রামতারণের বন্ধু ছাড়াও গাড়ির সহিস, বাড়ির চাকর, এমনকি স্বয়ং রামতারণের বাবা শিবচরণ নিজে ছিলেন। বিচারের একেবারে

শেষে এরা এক নতুন সাক্ষীকে নিয়ে আসে। এতদিন পর তাকে এইভাবে দেখবে বলে শৈল আশাও করেনি। চুঁচুড়োর অক্ষয় সরকারের ছেলে ব্যোমকেশ নিজে এসে জানায়, শৈলর চরিত্র ভালো না। সে থিয়েটারের পরিবেশ নষ্ট করে। ফলত বিচারে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে শৈলকে সেই মুহূর্তে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শৈল পুলিশের কাছে যায়। কিন্তু ন্যাশনাল এই বিষয়ে কোনও ঝামেলা চাইছিল না। তারা পুলিশের মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে দেয়। বেশ কিছুদিন কাটে কাজের আশায়। অবশেষে ন্যাশনালেরই এক খ্রিস্টান লাইটম্যান তাকে জানায় সে যদি প্রভু যিশুর পাদপদ্মে নিজেকে অর্পণ করে, তবে চার্চ তার থাকা খাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতে পারে। তখন শৈলর যা অবস্থা, তাতে যে-কোনো প্রস্তাবই তার কাছে গ্রহণযোগ্য। সাতপাঁচ না ভেবেই এক রবিবার সকালে জোড়াগির্জায় তাকে ব্যাপটাইজ করা হয়। নতুন নাম হয় ডেভিড শৈলচরণ সান্যাল।

এই অবধি বলে চুপ করে বসে থাকে শৈল। বোঝে না আর কী বলবে। এদিকে তারিণীর দিকে তাকিয়ে দ্যাখে তারও দুচোখ জলে ভরে গেছে। খুব মৃদু স্বরে তারিণী বলে, "তোমাকে আর গির্জায় গিয়ে গায়ে খাটতে হবে না। আমার কিছু পরিচিত দোকান ইত্যাদি আছে। তারা হ্যান্ডবিল, বিজ্ঞাপন লেখার লোক খুঁজছে। টাকাপয়সা ভালোই দেয়। তবে নাম হবে না। তুমি কিছুদিন একটু চুপ করে বসে থাকো। তারপর সব মিটলে আবার নাটক লিখো। ন্যাশনাল তো আর একা থিয়েটার না, অনেক থিয়েটার আচে, যারা তোমার নাটক পেলে লুপে নেবে। তবে কিছুদিন অপেক্কা কত্তে হবে এই যা। এর মধ্যে..." বলে চুপ করে গেল তারিণী।

"কি ভাই? চুপ করে গেলে যে?"

"না, ভাবছিলাম বলা উচিত হবে কি না। তুমি তো কেরেস্তান হয়েছ। এ কি স্বেচ্ছায়? নাকি আবার হিন্দু হবার..."

"প্রশ্নই ওঠে না।"

"তবে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে আছে। একটা সংঘ আছে। আমি এককালে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলাম। মাঝে কিছুদিন যোগাযোগ ছিল না বটে, কিন্তু এদানি আবার যোগাযোগের সুযোগ ঘটেচে। তোমাকে আমি নিয়ে যাব। আলাপ করিয়ে দেব। সংঘের নানা কাজকম্ম সারাবছর চলে। কর্মীরা টাকাপয়সাও পায়। তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে। একবার শুধু বাবু প্রসন্নকুমারকে ধরতে হবে।"

"কে তিনি?"

"আমাদের সংঘের প্রথম বাঙালি। সদাশয় মানুষ। তোমার কথা বললে না করবেন না।"

"কী নাম তোমাদের সংঘের?"

"দি ফ্ল্যাটারনাল অরগানাইজেশন অফ ফ্রিম্যাসনরি।"

৩।

যেদিন লজ থেকে বেরোনোর সময় ব্রাদার হ্যামিলটন শৈলর হাতে একটা গাল আটকানো খাম গুঁজে দিয়ে বলল, "আজ রাত নটায়", শৈল প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি। বছর দেড়েক হল সে ম্যাসনিক লক্ষের সদস্য হয়েছে। যাকে বলে "ফুল টাইম ওয়ার্কার"। ফলে এখন আর ক্লাইভ স্ট্রিটে থাকা হয় না। আর তারিণীর ওই ছোট্ট আপিসঘরে একা তারিণীর থাকা মুশকিল, দুইজন হলে তো লবেজান। তবু সে মাঝে মাঝে দেখা করতে যায়। কখনও তারিণীকে পায়, বেশিরভাগ সময় দরজা তালাবদ্ধ। পেটের দায়ে বেচারা ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়তো। শৈলর একটা ছোটো ব্যবস্থা হয়েছে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের আপিসের এক ঘরে। দিনের বেলায় এখানে সংঘের কাজ হয়। সবাই চলে গেলে খাটিয়া পেতে এখানেই শুয়ে পড়ে শৈল। নাটক লেখাও চলছে তালে তালে। তবে এখন তার বুদ্ধি খুলে গেছে। ন্যাশনাল বাদে বাকি থিয়েটার কোম্পানিতে ঘুরে ঘুরে নাটক বেচে আসে। কামাই নেহাত মন্দ হয় না। প্রথমে শুধু পৌরাণিক নাটক লিখত। ইদানীং কমিক

নাটক আর প্যান্টোমাইমের চাহিদা বাড়ায় শৈলর বড্ড সুবিধে হয়েছে। হাসির নাটক লেখায় তার জুড়ি নেই। তবে নাটকের জগতে সে নিজের খ্রিস্টান পরিচয় দেয় না। খ্রিস্টানের লেখা হিন্দু দেবদেবীর নাটকে এখনও অনেকের অনীহা রয়েছে। তাই ডেভিড নামটাকে সযতনে লুকিয়ে রাখে। তার লেখা মুকুল মঞ্জরী, উপেন্দ্র বিনোদিনী, স্বর্ণভস্ম প্রতিটাই মিনার্ভায় পঞ্চাশ রজনী অতিক্রান্ত করেছে। তবু তার মনে সামান্য খোঁচা লেগে আছে। একে তো অভিনয়ের সময় সুযোগ নেই, আর তার চেয়েও বড়ো কথা, ন্যাশনালে তার উপরে অত্যাচার করেও চার পাষণ্ড দিব্যি হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ব্রাদারহুডে শৈল শুরুর দিকে তেমন কোনও কাজ পেত না। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের এই লজটা কলকাতার তৃতীয় লজ। এর একটা গালভরা নাম আছে "স্টার ইন দ্য ইস্ট", পুবের তারা। কলকাতায় ম্যাসনদের প্রথম লজ স্থাপিত হয়েছিল ১৭৩০ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে। দ্বিতীয়টাও আশেপাশেই। পলাশির যুদ্ধের ঠিক আগে। সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করে আলিনগর বানানোর সময় এই দুটি লজই ধ্বংস করেন। ব্রাদারদের হত্যা করেন নৃশংসভাবে। তার আগে অবধি ব্রাদাররা নেহাতই ধর্মকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। দেশের রাজনীতিতে মাথা গলাতেন না। কিন্তু ১৭৯০ সালে এই পূর্বের তারা যখন গঠন হল, ততদিনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে জাঁকিয়ে বসা শুরু করেছে। ফলে ইংল্যান্ডের মতো এ দেশেও ব্রাদারহুড সরাসরি রাজনীতিতে ঢুকে গেল। ব্যাপারটা এতই গোপনে হল, যে কেউ জানতেই পারল না, যে এই দেশে বড়ো বড়ো অফিসার থেকে গভর্নর জেনারেল অবধি কে হবেন, তা ঠিক হয় বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের এক ছোটো ঘুপচি ঘর থেকে। প্রথমে ইংল্যান্ডের গ্র্যান্ডমাস্টাররা শেষ কথা বলতেন, কিন্তু সে নিয়ম এক ডিক্রি জারি করে বাতিল করেন স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনিই প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার অফ অল ইন্ডিয়া। এই সবই শৈল জেনেছে লজে যুক্ত হয়ে। তবে সে তুলনায় লজের কাজ বড্ড পানসে। একঘেয়ে। রবিবার করে যিশুর গান গাওয়াহয়। ইংরাজিতে। ইদানীং কিছু নেটিভ ব্রাদার যোগ দেওয়াতে

কয়েকটা বাংলা গানও যোগ হয়েছে। সেসবই শৈলের লেখা। তবে ইদানীং সে বুঝতে পারছে, এই গোটা ব্যাপারের মধ্যেই কোথাও একটা ধোঁকা আছে। গ্র্যান্ডমাস্টার হ্যালিফ্যাক্স নামেই সংঘের প্রধান। আসলে সংঘ চালান অন্য একজন। তাঁর আসল নাম সংঘের সাধারণ সদস্যরা জানে না। তিনি দেখতে কেমন তাও না। সবাই তাঁকে উল্লেখ করে মাস্টার ম্যাসন বলে। সেটাও প্রায় ফিসফিস করে। কিন্তু শৈল বুঝেছে, এই মাস্টার ম্যাসনের অঙ্গুলিহেলনেই ইংরেজ সরকারের বড়োবড়ো অফিসার বদলি হয়ে দেশে চলে যান, আচমকা পেটের অসুখে ভুগে মারা যান কেউ কেউ। ইনি অমিত ক্ষমতাশালী, ধুরন্ধর এবং নির্মম। ম্যাসনিক লগবুকে তাঁর একটাই পরিচয়, AG। বহুদিন পরে এর পুরো অর্থ জানতে পেরেছে শৈল, *Absconditum Grandmaster*, গোপন গ্র্যান্ডমাস্টার। মাঝে মাঝেই তাঁর গোপন ফরমান আসে লজে। সে ফরমান অস্বীকার করে, এমন সাধ্য কারও নেই। তার কোনও ফরমানে কোনও সই থাকে না। শুধু থাকে A আর G-র মধ্যে অদ্ভুত এক ছবি। পায়ে থাবা, ল্যাজ আর ডানাওয়ালা শয়তানের হাতে কিছু একটা তুলে দিচ্ছেন এক ম্যাসন। তাঁর এক হাতে টপ হ্যাট, অন্য হাতে ঝুড়ির মতো কিছু একটা।



এই চিঠি মানেই সমনের মতো। অনেকে মাঝে মাঝেই সংঘ থেকে উধাও হয়ে যায়। আর ফেরে না। শোনা যায় তারা নাকি ফরমান পেয়েছিল। আবার এই ফরমান পেয়েই অনেকের ভাগ্য বদলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। শৈল নিজে দেখেছে। তাই তার বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। কী জানি তার ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে!

সেই সভাতেই প্রথমবার মাস্টার ম্যাসনকে দেখল শৈল। একেবারেই সাধারণ চেহারার এক মানুষ। ম্যাসনিক লজের বাইরে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের এক আয়ুর্বেদের দোকানের পিছনের ফাঁকা ঘরে শৈলকে ডেকে মাস্টার তাকে প্রথমবারের জন্য একটা গোপন মিশন দিলেন। চন্দননগরে তাঁদের এক ব্রাদার আছেন। লুকিয়ে। এই মুহূর্তে তাঁর খোঁজ ব্রাদারহুডের কাছে নেই। ব্রাদারহুড-ই এককালে তাঁকে বলেছিল গা ঢাকা দিতে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে আবার দরকার। শৈলর কাজ তাঁকে খুঁজে বার করে আনা। যদি পারে, ব্রাদারহুড তার এই প্রতিদান মনে রাখবে।

ঠিক সতেরো দিনের মাথায় চন্দননগরের ফ্যাস্তার দিন লোকটাকে খুঁজে বার করে তার হাতে মাস্টারের চিঠি ধরিয়ে দেয় শৈল। যদিও এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল এ যাত্রা তাকে আর বেঁচে কলকাতায় ফিরতে হচ্ছে না। লোকটার চেহারা দেখে বোঝা যায় না, গায়ে বাঘের শক্তি। পরের দিনই শৈল ফিরে এসে মাস্টার ম্যাসনকে জানায় তাঁর কাজ শেষ। মাস্টার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করেন। শৈল বলে। শুধু একটা ব্যাপার বাদে। একেবারে প্রথম দিন লোকটা যখন বাগানে কাজ করছিল, ঘরের জানলায় সে একটা কচি মেয়েকে দেখতে পায়। এই মেয়ে খাঁটি সাহেবের মেয়ে। অ্যাংলো না। এই ব্যাপারে সে নিশ্চিত। ইচ্ছে করেই মাস্টারকে সে এই তথ্য দিল না। তার কৌতূহল জেগেছে। তারিণী নামজাদা গোয়েন্দা! শৈলও কিছু কম নয়। সে নিজে ব্যাপারটার গভীরে যাবার সিদ্ধান্ত নিল।

প্রতিদানের বিষয়ে মাস্টার তাঁর কথা রেখেছিলেন। ঠিক তিনদিন বাদে সম্মান পূর্ণচন্দ্রোদয় কাগজে ছোটো করে ছাপা হল এই খবর-

জীবন্ত দগ্ধ

এই এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতার চতুর্দিকে খুন ও ডাকাতি প্রায় মধ্যে২ হয়। শুনিতে পাইতেছি যে এমত রাত্রি নাই যে তাহাতে ডাকাতি বা খুন বা উভয়ই না হয়। পরন্তু গত ৭ই শ্রাবণ গড়ের মাঠের নির্জন প্রান্তে যে নৃশংস ঘটনা

ঘটিয়াছে, আমার সাধ্য নাই, তাহার সম্যক বর্ণনা করি। গগন প্রভাত হইতেই মেঘ মেদুর হইয়া রহিয়াছিল। বৃষ্টি হয় নাই। স্বাভাবিকভাবেই সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাটে লোক চলাচল ঈষৎ কমিয়া গিয়াছিল। খবরে প্রকাশ, রাত্র দশ ঘটিকাকালীন গড়ের মাঠের নিকট দিয়া পাঁচ সাতজন পথিক একত্রে গমন করিতেছিলেন। তাহারা একখানি সম্পূর্ণ আবদ্ধ ব্রুহ্যাম কৌচকে তীব্র হুতাশনে জ্বলিতে দেখিয়া হতবাক হইয়া যান। তাঁহারা নিশ্চিত, সেই অগ্নিজঠরের মধ্য হইতে প্রত্যেকেই মানবকণ্ঠের সুতীব্র আর্তনাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন। ঘটনাস্থলে কোচোয়ান বা তাহার ঘোড়াটির চিহ্নমাত্র ছিল না। পথিকরা সেই তীব্র অগ্নির সম্মুখে যাইবার সাহস না করিয়া কোথা হইতে এক হাবিলদারকে ধরিয়া আনেন। তিনি আবার অন্য তিন-চারজন হাবিলদারকে আনিয়া অগ্নি নির্বাপণ করিলেও শেষরক্ষা হয় নাই। কৌচে আসীন চার যুবাপুরুষই জীবন্ত দগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছে ওই কৌচে প্রখ্যাত বসু পরিবারের শ্রীযুত বাবু শিবচরণের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র রামতারণ ও তাঁর তিন ইয়ারদোস্ত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সান্যাল ও নবীনচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসীন ছিলেন। ওইদিন সন্ধ্যাকালে উহারা সোনাগাজিস্থিত একটি পতিতার সনে সময় অতিবাহিত করিয়ামদ্যপ অবস্থায় এই ভাড়াগাড়ি খানিতে উঠিয়া বসেন। পুলিশের অনুমান কোচোয়ান তাঁহাদের অগোচরে এই স্থানে আনিয়া বাহির হইতে তালা লাগাইয়া, ঘোড়াটিকে অর্গলমুক্ত করিয়া কৌচে অগ্নিসংযোগ করে। ইহার পশ্চাতে কোন ভীষণ ষড়যন্ত্র নাকি প্রতিশোধস্পৃহা রহিয়াছে, পুলিশ তাহার অনুসন্ধানে নিরত আছে। বাবু রামতারণ নির্বিবাদী ও অজাতশত্রু মানুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহার বন্ধুদের মত। তিনি শখের অভিনেতা ছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটারে বেশ কয়েকটি নাটকে তাঁহাকে অভিনয় করিতে দেখা গিয়াছে। কে বা কাহারা তাঁহার প্রতি এই ভীষণ ক্রোধ পুষিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে পুলিশ নিরুত্তর। এই সংক্রান্ত নূতন খবর পাইলে আমরা পাঠকদিগকে সমুদয় অবগত করিব।

শৈল মৃদু হেসে কাগজ মুড়ে পাশে রেখে নতুন নাটক লিখতে বসল।



৪।

স্টারে উপেন্দ্র-বিনোদিনীর অভিনয়ের দিন প্রথমবার শৈল লোকটাকে দেখেছিল। খাঁটি সাহেব। এ দেশে থাকা চামড়াপোড়া সাহেব না। দেখে মনে হয় সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন। শৈলর একটা স্বভাব আছে। ওর লেখা যে-কোনো নাটকের প্রথম অভিনয়ের দিন ঠায় উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। বিড়বিড় করে বলে যায় প্রায় গোটা নাটকটাই। কোথাও কারও ভুলচুক হলে টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে চিক চিক আওয়াজ করে। আবার কোনও ভালো দৃশ্য অভিনীত হলে দর্শকদের দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করে তাদের কী অভিমত। নাটক তেমন না জমলে নিচের পুরুষরা একে একে কেটে পড়ে। উপরে চিকের আড়ালে হয়তো তার মা বা স্ত্রী বসে আছেন। তাঁদের টেরটি পেতে না দিয়ে এই সময়ে সোনাগাজি গিয়ে একটু ফুর্তিফার্তা করে নাটকের শেষে আবার ফিরে আসে। বাকিরা এমন চ্যাঁচাতে থাকে যে অভিনয় বন্ধ করতে হয়। হলের মধ্যে পানওয়ালারা গায়ের উপর দিয়ে পা মাড়িয়ে ছোটাছুটি করে, বাবুরা 'পান সিগারেট' বলে হুংকার ছাড়েন, কানের রগ ঘেঁষে ঠাঁই ঠাঁই শব্দে সোডার বোতল খোলেন। আজ অবশ্য সেসবের কিছুই হচ্ছিল না। প্রথম দিনই নাটক এমন জমেছে যে সকলে হাঁ করে দেখছে। উপেন্দ্র এবং বিনোদিনীর ভূমিকায় নবাগত অমরনাথ আর ডাকসাইটে অভিনেত্রী অমলাসুন্দরী। বিনোদিনী চরিত্রটিকে নিজের মনের মতো করে লিখেছে শৈল। বাংলা থিয়েটারের দর্শকরা খুব ভালো নাটক হলেও মাঝে মাঝেই নড়েচড়ে বসেন। আসনের গদি ছিঁড়ে নারকেলের ছোবড়া বেড়িয়ে এসেছে, সেখানে কোটি কোটি ছারপোকার বাস। তবু তারই মধ্যে সেই সাহেব একেবারে স্থির, অচঞ্চল। শৈল আরও অবাক হয়েছিল এটা দেখে যে, সাহেবের নাটক নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এক কোনায় বসে তিনি পাথরের মূর্তির মতো শৈলর দিকে তাকিয়ে আছেন। বড্ড অস্বস্তিকর এই দৃষ্টি। শৈলর সঙ্গে বেশ কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। শৈল চোখ নামিয়ে নিয়েছে। সাহেব চোখ সরাননি।

সেই প্রথম, তারপর কতবার কত অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় শৈল এই সাহেবকে দেখেছে। ক্লাইভ স্ট্রিটে তারিণীর অফিস থেকে বেরোবার মুখে, অমৃতলালকে তার নতুন প্যান্টোমাইম 'একাকার'-এর পাণ্ডুলিপি দিতে যাবার সময়, আর সবচেয়ে বেশিবার বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে সংঘের অফিসের আশেপাশে। লোকটা মুখে কিছুই বলে না, শুধু ছায়ার মতো শৈলকে অনুসরণ করে যায়। সংঘের আপিসের উলটো দিকে একটা চিনা খাবারের দোকান আছে। লোকটা তেমন দরকারে সেখানেই সারাদিন কাটায়। খাওয়াদাওয়া করে। কিন্তু কাচের বড়ো জানলা দিয়ে নজর রাখে সংঘের দিকে। শৈল প্রথমে ভেবেছিল সংঘকে জানাবে। কিন্তু জানায়নি। আসলে লখন আসার পর শৈলর বেশ আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। আর সেটা খারাপের দিকেই। লখন আসার আগে মাস্টার ম্যাসন বিভিন্ন গুরুদায়িত্ব শৈলকে দিতেন। ইদানীং লখন বলেকয়ে তার পেয়ারের কিছু লোককে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেয়। সে নিজে সংঘে আসে না। কোথায় থাকে কে জানে? কিন্তু শৈলর মতো নেটিভদের জন্য তার কথাই শেষ কথা। উপস্থিত না থেকেও সে সর্বব্যাপী। মাস্টার ম্যাসন এখন নিজেও সব নির্দেশ দেন না। লখনের মারফত নির্দেশ আসে। শৈলদের সেটাই মেনে চলতে হয়। এ ব্যবস্থা শৈলর ভালো লাগেনি। একদিন আচমকা লখন শৈলকে জানাল তার আর সংঘের আপিসে রাত কাটানো চলবে না। অতএব সে আবার ফিরে গেছে তারিণীর আপিসে। তারিণী মহাপ্রাণ। বন্ধুর জন্য কোনও অসুবিধাকেই সে গ্রাহ্য করে না। শৈল আগে সংঘ থেকে যে হাতখরচ পেত, সেটাও কমেছে। নাটকের সঙ্গে তাই বিজ্ঞাপনের কপিও লিখতে হয়। সে কপিতে আবার কাব্য লিখে দেয় তারিণী নিজে। মাঝেমধ্যে পায়ে পড়ে মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের সেই ওষুধের দোকানের বিজ্ঞাপন কাম বার্তাও তাকেই লিখে দিতে হয়। শৈল ইদানীং তাই খানিক মরমে মরে থাকে।

সেদিন সংঘের নানা কাজের হিসেবনিকেশ চলছিল, তাই বেরোতে একটু দেরি হল শৈলর। মনটা ভারী। আজই লখন তাকে ডেকে জানিয়েছে, সংঘে

থাকতে হলে তার আর নাটক লেখা চলবে না। শৈল সচরাচর কোনও প্রশ্ন করে না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে সে এতটাই অবাক হয়ে গেছিল যে কারণ জিজ্ঞাসা না করে পারেনি। কারণ হিসেবে লখন তাকে জানায়, নাট্যকাররা তরলমতি। সংঘের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য শৈলর জানা আছে। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত সে এইসব নাটকে লিখে ফেললে সংঘের বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে। অবিলম্বে তাকে নাটক লেখা বন্ধ করতে হবে। শৈলর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ছোটো থেকে তার জীবনের লক্ষ্যই ছিল নাটক লেখা, অভিনয় করা। পরেরটা বন্ধ হলেও প্রথমটাকে আঁকড়ে ধরে কোনওমতে চালাচ্ছিল সে। আজ থেকে সেটাও গেল! শৈলর মাথা কাজ করছিল না। এতদিনের আনুগত্যের এই পুরস্কার!

প্রথমে দুঃখ, পরে হতাশা, তারপর সেই হতাশা পরিণত হল রাগে। শৈল লিখবে। নতুন নাটক। এই নাটক একেবারেই তার অন্য নাটকের মতো হবে না। এতকাল ইচ্ছে করে সে সংঘের চিহ্নমাত্র নিজের লেখায় রাখত না। এবার রাখবে। শুধু রাখবেই না, সংঘের যে গোপনতম তথ্য তার কাছে আছে, সেটাও প্রকাশ করে দেবে। কিন্তু সংঘের সঙ্গে বেইমানি করে নয়। সে সবাইকে দেখিয়ে দেবে নাট্যকার শৈল সব পারে। এমনকি সাঁটে কথাও কইতে পারে। এমন সাঁটে সে এই নাটক লিখে অভিনয় করাবে, যে, স্বয়ং মাস্টার ম্যাসন অবধি দেখলে ধোঁকা খেয়ে যেতে বাধ্য হবেন। এটাই হবে নাট্যকার শৈলচরণের জীবনের সেরা কাজ, অমৃতলাল যাকে বলেন "ম্যাগনামওপাস"।

রাস্তায় চলতে চলতেই অদ্ভুত এক প্লট এল তাঁর মাথায়। প্রহসন, তবে রূপকের আড়ালে। এমন কাজ বাংলা সাহিত্যে আগে কেউ করার সাহস দেখায়নি। শৈলই প্রথম এ কাজ করে দেখাবে। বিরাট নামডাক হবে তার। দেখা যাবে, তখন মাস্টারের ওই পেয়ারের লখন কী বলে.....

নিজের চিন্তাতে এতটাই ডুবে ছিল শৈল যে, তাকে রোজ দেখতে থাকা সাহেব যে আজ উলটো দিকের দোকানের সামনে নেই, বরং সে সংঘ থেকে বেরোতে না বেরোতে, সেই রাস্তারই এক অন্ধকার কোণ থেকে শৈলর পিছু

নিল, তা সে খেয়ালই করল না। ক্লাইভ স্ট্রিটের দিকে ঘোরার ঠিক আগের মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের তলায় হাতের কনুইয়ের কাছে তীব্র চাপ অনুভব করল শৈল। চমকে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল সেই সাহেব। বেঁটেখাটো, মাথায় টপ হ্যাট, হাতে ছড়ি। সাহেব আলগোছে বাঁ হাতে শৈলর হাত চেপে ধরে আছেন, আর শৈল কিছুতেই তা ছাড়াতে পারছে না। সাহেবের মুখে অদ্ভুত এক হাসি। কিন্তু তাঁর চোখ হাসছে না। সেই প্রথম ল্যাম্পপোস্টের আলোতে শৈল খেয়াল করল সাহেবের দুই চোখের মণির রং দুইরকম। ডানদিকেরটা নীল আর বাঁদিকেরটা ধূসর।

সাহেব অত্যন্ত ভদ্রভাবে হালকা মাথা নুইয়ে শৈলকে বলল, "গুড ইভনিং। একটু কথা বলা যাবে?"

৫।

ইংরাজি বলা কওয়াতে শৈল আগে একেবারেই দড় ছিল না। সংঘে ঢোকার পর দায়ে পড়ে কাজ চালানোর মতো ইংরাজি বলতে পারে। সাহেবের চেহারা আর কথায় এমন কিছু একটা ছিল, যাতে শৈল স্পষ্ট বুঝতে পারল সাহেব অনুমতি চাইছেন না। আদেশ করছেন। এই লোক 'না' শোনার জন্য একেবারেই তৈরি না। সাহেবের চোখে মুখে ভয় ধরানো এমন একটা ভাব, যে সম্মোহিতের মতো শৈল আর আগুপিছু চিন্তা করতে পারল না।

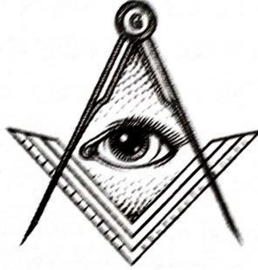
"চলুন", বলতেই সাহেব তাকে প্রায় একভাবে ধরেই নিয়ে চললেন অলিগলি বেয়ে। এ শহরের গলিঘুঁজি সাহেবের চেনা। নিশ্চয়ই প্রচুর ঘোরাঘুরি করে সব চিনে নিয়েছেন। খানিক বাদেই দুজনে এসে হাজির হল গঙ্গার ধারে। রাতে এই জায়গাটা একেবারে কিছু ছোটো ছোটো সলপ আর সওদাগরি নৌকা গঙ্গায় ভেসে চলেছে। দূরে কে যেন একজন ঘাটে বসে আড়বাঁশিতে হংসধ্বনির সুর তুলছে। সাহেব সন্ধানী চোখে চারদিকটা একবার দেখে নিলেন। তারপর শৈলকে সরাসরি বললেন, "তুমি আমার হয়ে কাজ করবে?"

“কাজ? কী কাজ? আপনি তো আমাকে চেনেনই না সাহেব!”

“তোমার নাম শৈলচরণ সান্যাল। চুঁচুড়ার রমাপ্রসাদ সান্যালের ছেলে। বাবা তাড়িয়ে দেওয়ায় প্রথমে ন্যাশনাল থিয়েটারে গেছিলে। সেখানে তোমাকে ধর্ষন করা হয়। তারপরে তুমি এখানকার ব্রাদারহুডে যোগ দিয়েছ। কিন্তু ব্রাদারহুড তোমাকে সব দিয়েছে স্বাধীনতা ছাড়া। আমি তোমাকে সেই স্বাধীনতা দেব।”

“কিন্তু আপনি...”

ডান হাতের কোটের কিছুটা তুলে নিলেন সাহেব। গঙ্গার ধারে এখনও ইলেকট্রিক বাতি লাগেনি। তবু টিমটিমে গ্যাসবাতির আলোতে শৈল দেখতে পেল উচ্চিটা। ম্যাসনিক কম্পাস আর স্কেলের মধ্যে একটা চোখ জ্বলজ্বল করছে। কম্পাসের ঠিক মাঝে ইংরাজি G অক্ষর। গড, জিওমেট্রি, গ্র্যান্ড আর্কিটেক্ট অফ ইউনিভার্স।



“কিন্তু এই চিহ্ন....”

“আমিও ব্রাদারহুডের সদস্য। তবে ইংল্যান্ডের। আমাকে এই দেশে পাঠানো হয়েছে বিশেষ এক কারণে।”

“কী কারণ?”

“সেটাই তোমায় বলব। তোমার সাহায্য আমার খুব প্রয়োজন। তবে তাতে তোমারও লাভ হবে। তুমি হিলি নামে এক দস্যুর কথা শুনেছ?”

চমকে উঠল শৈল। ‘হিলির ভূত’-এর কথা সাহেব জানলেন কীভাবে? সাহেব তার অভিব্যক্তি দেখে যা বোঝার বুঝে গেলেন। খুব শান্ত গলায় বললেন,

"শোনো, তোমায় বলি, স্বয়ং মহারানি ভিক্টোরিয়া হিলির বিষয়ে উদ্বিগ্ন। সে ও দেশ থেকে পালিয়ে আসার সময় দুটো খুব ভয়ানক জিনিস চুরি করে এনেছে। একটা ভয়ানক আরক, যা মানুষকে শয়তান বানিয়ে দেয়, আর একটা ছোট্ট মেয়ে, দেখতে একেবারে নিষ্পাপ, কিন্তু সেই মেয়ে আসলে ডাইনি। কলকাতার ব্রাদারহুডের সবাই এদের কথা জানে না, একেবারে ভিতরের কিছু লোক জানে। এদের দিয়ে এরা রানির বিরুদ্ধে ভয়ানক এক ষড়যন্ত্র করতে চলেছে। আর যদি তারা সফলকাম হয়, তবে যে স্বাধীনতার খোঁজে তুমি হাপিত্যেশ করছ, তা এ জীবনে পাবে না।"

শৈল কোনও উত্তর দিল না। তার মন এক অদ্ভুত দোলাচলে ভুগছে।

সাহেব বলে চললেন, "ভাবছ এসব খবর আমি কী করে জানলাম? সংঘে আমার লোক আছে। তবে তারা কেউই তোমার মতো জায়গায় পৌঁছায়নি। আমার তোমাকেই দরকার। আমি জানি এই মুহূর্তে তোমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব না। সংঘে ঢোকার সময় তুমি যে শপথ নিয়েছ, তাতে সংঘের চোখে চিরকালের মতো তুমি বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাবে। কিন্তু অন্যদিকে ভাবো, এদের ষড়যন্ত্র একবার ফাঁস হয়ে গেলে মহারানি এদের শাস্তি দেবেন, আর সেই শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সবার। কেউ বাদ যাবে না। ভেবে দ্যাখো তুমি সেই দলে থাকবে কি না। অন্যদিকে আমাদের সাহায্য করলে স্বয়ং মহারানি তোমার পাশে থাকবেন। তোমার নাম গোপন থাকবে। শুধু তাই না, পুরস্কার হিসেবে তোমায় প্রচুর টাকা দেওয়া হবে। প্রচুর, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। চাই কি, তুমি দরকার হলে নিজের নাটকের দল খুলে, থিয়েটার তৈরি করে নিজের মনের মতো নাটক লিখে অভিনয় করতে পারবে। ভেবে দ্যাখো।"

শৈলর মনে যেন তুফান উঠেছে। একদিকে বিশ্বাসঘাতকতার পাপ, অন্যদিকে স্বাধীনতার হাতছানি। সংঘ তাকে পথের ভিখারি থেকে আজ এই জায়গায় এনেছে। কিছুদিন আগে হলেও সে এই সাহেবের কথায় কর্ণপাত করত না। কিন্তু এখন অবস্থা বদলাচ্ছে। এখনই জল না মাপতে পারলে ভবিষ্যতে

হায়হায় করেও কোনও লাভ হবে না। অক্ষয় সরকার একটা কথা খুব বলতেন, হাওয়া থাকতে থাকতে পাল তুলে দাও, নইলে কোনও দিন তোমার নৌকা ঘাট ছেড়ে বেরোবে কি না কেউ জানে না।

সাহেব বলে চলছিলেন, "এখানের ব্রাদারহুড একটা অন্ধগুহার মতো। আমাদের লন্ডনের গ্র্যান্ড লজ অবধি এদের কীর্তিকলাপ নিয়ে কিচ্ছু জানে না। আমি বেশ কয়েক মাসের চেষ্টায় তোমায় উদ্ধার করেছি। তুমি সংঘের একেবারে ভিতরের খবর জানো, কিন্তু সংঘ ইদানীং তোমার প্রতি অবিচার করছে। যদি তুমি চাও..."

"কত টাকা?" সাহেবকে প্রায় থামিয়ে দিয়েই প্রশ্ন করল শৈল।

"তুমি কত চাও?"

"নতুন থিয়েটার গড়ে দল করতে অনেক টাকা লাগবে।"

"মহারানির টাকার অভাব নেই।"

"দশ হাজার।"

"টাকা?"

"পাউন্ড।"

"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু খবর যেন পাক্কাহয়। "

"হবে। আমি আপনাকে খুঁজে পাব কীভাবে?"

"দরকার নেই। আমি তোমায় খুঁজে নেব। তুমি শুধু দুটো খবর দেবে। হিলির ভূত আর সেই মেয়েটা। এখন কোথায়? খুব বেশিদিন দিতে পারব না। বড়োজোর দিন কুড়ি।"

"কিন্তু সাহেব, আপনার নামটুকুও জানা হল না যে..."

"হিউড র‍্যাডি।"

ক্লাইভ স্ট্রিটে ফিরতে ফিরতে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করে নিল শৈল। এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। সে যেমন ভেবেছিল, তেমন নাটক লিখবে, অভিনয় করাবে, আবার পাশে এই সাহেব যা যা জানতে চাইলেন সে খবরও

নেবে। সংঘকে সে একটা শেষ সুযোগ দিতে চায়। না হলে সব ছেড়েছুড়ে বেড়িয়ে গিয়ে টাকা নিয়ে নতুন থিয়েটার গড়বে। মনে একটাই সন্দেহ ছিল, এই সাহের যে সত্যি কথা বলছে তার মানে কী? কিন্তু নয় নয় করেও সাহেব সংঘের যেসব তথ্য উগরে দিলেন সেটাও নেহাত সাধারণ লোকের জানার কথা না। আর শৈল এখন মহাবিড়ম্বনায় পড়েছে। সাহেবের কথা না মানলে চিরকাল লখনের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। সেভাবে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া শ্রেয়।

শৈল আড়িপাতা শুরু করল। বিশেষ করে লখন এলেই মাস্টার ম্যাসন গোপন মিটিং ডাকেন। আগে প্রায় সবকটাতেই শৈল থাকত। এখন সিকিভাগ মিটিং-এ তাকে রাখা হয়। কিন্তু শৈল এক উপায় বার করেছে। যে ঘরে মিটিং চলে, তার দেওয়াল কাঠের। একটা কাচের গেলাস দেওয়ালের বাইরে ঠেকিয়ে তাতে কান লাগিয়ে ভিতরের প্রায় সব কথাই শোনা যায়। আর গত কয়েকদিনে ইতিউতি যা যা শুনেছে শৈল, তাতে সেই সাহেবের কথাই সত্যি মনে হচ্ছে। এরা যা আলোচনা করছে, তা যদি বাস্তবে ঘটে, তবে অনর্থ হয়ে যাবে। শৈল রানির প্রজা। সে এমনটা হতে দিতে পারে না। প্রায় পনেরো দিন লাগল তার গোটা নাটকটা লিখতে। লিখে বারবার পড়ে দেখল। এবার ঠিকটি হয়েছে। একবার ভেবেছিল তারিণীকে জানাবে। তারপর নিজেই ভাবল, এখন না। হাতে টাকা এলে সেই টাকা থেকে কিছুটা সে তারিণীকে দিয়ে অবাক করে দেবে। এর মধ্যে একদিন বউবাজারের ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও থেকে একটা বান্ডিল আনতে দেওয়া হয়েছিল শৈলকে। টাকাপয়সা সব দেওয়া আছে। শুধু গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। একমাস আগে হলেও ভিতরে কী আছে জানার কৌতূহল হত না শৈলর। কিন্তু এবার হল। 'ভারতভিক্ষা' নামের এক ছাপাই ছবি। তাতে মহারানিকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। পাশে এক বৃদ্ধা আর এক শিশু। এই শিশুটিও শৈলর চেনা। চন্দননগরে লখনকে খুঁজতে গিয়ে তার বাড়ির জানলায় অবিকল এই শিশুকেই দেখেছিল সে। সন্তর্পণে একটা ছবি সরিয়ে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়েনিল শৈল। তারপর রাস্তার ধারের ছাড়া কল থেকে এক আঁজলা জল

নিয়ে বাকি বান্ডিলের উপরে ছড়িয়ে দিল ভালো। করে। সংঘ এই নিয়ে প্রশ্ন করায় বলল, রাস্তা ধোয়ার গাড়ির পাইপ বেকায়দায় জল ছিটিয়ে দিয়েছে। উপরের কিছু ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। সামান্য ধমক খেলেও বেশি কিছু বললেন না মাস্টার ম্যাসন। বরং এই পাইপে জল দিয়ে রাস্তা ধোয়ার চেয়ে পুরোনো ভিস্তিই যে ভালো ছিল, তা বলে গজগজ করলেন। নষ্ট ছবিগুলো ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতে দিতে বলা হল শৈলকে। মোট চারটে ছবি নষ্ট হয়েছিল। শৈল বলেছিল পাঁচটা। এই একটার গরমিল কেউ আর গুনে দেখেনি।

৬।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা। আষাঢ়ের মেঘের চরিত্র বোঝা দায়। সবসময় মনে হয় এই ঢালবে। আবার হয়তো সারাদিন একরকম মুখ ভার করে রইল। তারিণী আজ আপিসে নেই। গতকাল প্রিয়নাথ দারোগা এসেছিলেন। তারিণীকে নিয়ে চুঁচুড়া গেছেন। তারিণী নিজে শৈলকে কিছু বলেনি। তারিণী যখন ঘরে থাকে না, তখন শৈল লুকিয়ে তার ডায়রি পড়েছে। সে জানে বছর চারেক আগে তারিণী কী ভয়ানক এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল। সে জানে সাইগারসন ব্রিটিশ সরকারের খাস লোক। কিছু একটা ঘটেছে। নইলে তারিণী এমন সাত তাড়াতাড়ি দারোগাবাবুর সঙ্গে চুঁচড়ো ছুটত না। তবে কি সে যা সন্দেহ করেছিল সেটাই হতে চলেছে? রানি সব জেনে গেছেন? এবার তাদের শাস্তির পালা? যদি তাই হয়, তবে তাকে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। র‍্যাডি সাহেবকে সব বলে দিতে হবে। খাটের একপাশে বান্ডিল বাঁধা নাটক পড়ে আছে। এগুলো নিয়ে তারিণীর সঙ্গে কথা বলা হয়নি। তারিণী বাড়িতে ফিরলেই দুই বন্ধু মিলে ঠিক করতে হবে এরপরে কী করা যায়। হাতে একদম সময় নেই।

বাইরে মেঘ গর্জাচ্ছে। এমন সময় আপিসের সামনে একটা ছ্যাকরাগাড়ি থামল। তারিণী এল বুঝি। কিন্তু তারিণী তো সচরাচর গাড়ি চাপে না! গাড়ি

থেকে প্রথমে প্রিয়নাথকে নামতে দেখেই শৈল বুঝে গেল যা করার এবার তাকে একা করতে হবে। তারিণীর সঙ্গে আলোচনার উপায় নেই। মনের ভাব তারিণীকে বুঝতে না দিয়েই সে বলল, "তুমি এয়েচ ভাই? বেশ হল। তোমার কথাই ভাবছিলেম। জরুরি দরকার। এখুনি আমায় বেরুতে হচ্চে। তবে চলে আসবখন। রাতের খাওয়া বেড়ে রেখেচি। একসঙ্গে খাওয়া যাবে।" প্রিয়নাথ ঠায় তার দিকে তাকিয়ে। এই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে কেন ঘুরছে তারিণী? দেখেই মনে হয় ঘিলুতে কিছু নেই। তাঁকে পরখ করার জন্যেই শৈল তাঁকে শুধাল, "দারোগাবাবু, যে এককালে আপনার উপকার করেছিল, সে যদি অন্য কারও মহাক্ষতিতে লিপ্ত হয়, তবে আপনি কী করবেন?"

দারোগা মিনমিন করে কী যেন বললেন। আইনমাফিক সাজার কথা। শৈল মনে মনে হাসল। জাবুলনদের দেবে আইনমাফিক সাজা? এবার আইন সে নিজের হাতে তুলে নেবে। অনেক হয়েছে। আজ একটা হেস্তনেস্ত না করলেই নয়। অমৃতলালকে দেবার জন্য এক কপি নাটকের বই ফতুয়ার পকেটেই পোরা ছিল। আরও একটা ঢুকিয়েনিল। কাজে লাগতে পারে। তারপর অন্ধকারেই বেরিয়ে গেল।

অমৃতলালের কাছে যাবার আগেই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। এক বাড়ির রোয়াকে আশ্রয় নিল শৈল। আর তখনই ওদের দেখতে পেল। তিনটে লোক। আগাপাশতলা বর্ষাতিতে মোড়া। মাথায় টুপির জন্য মুখ দেখা যাচ্ছে না। ঠিক উলটো দিকের বাড়ির রোয়াকে দাঁড়িয়ে। ক্লাইভ স্ট্রিট থেকে বেরিয়েই এদের দেখেছিল শৈল। প্রথমে গা করেনি। কিন্তু নির্জন রাস্তায় এদের উপস্থিতিতে বেশ ভয়ভয় করতে লাগল তার। বৃষ্টি কমার অপেক্ষা করা গেল না। প্রায় কাকভেজা হয়েই অমৃতলালের কাছে গেল সে। যদি 'একাকার'-এর বদলে তার এই নতুন পালা অভিনয় করান অমৃতলাল। বিধি বাম। অমৃতলাল একরকম ভাগিয়েই দিলেন তাকে। যাবার আগে তবুও এক কপি নাটক তাঁকে দিয়ে গেল শৈল। দেখে যদি মন বদল হয়।

এখন আর একটাই উপায়। চুঁচুড়ার সেই সাইগারসন। তিনি নাকি স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারের লোক। তাঁকে নাটক বোঝানোর কিছু নেই। সরাসরি টাকা চাইতে হবে। সেই টাকা দিয়ে থিয়েটার হবে। আর সাইগারসন টাকা না দিলে দলের সঙ্গে বেইমানি করে সেই রাডিকেই সব বলে দেবে। যা থাকে কপালে। শিয়ালদহ থেকে চুঁচুড়াগামী শেষ ট্রেনে উঠল শৈল। বেশ বুঝতে পারল ওই তিনজন তার পাশের কামরায় গিয়ে উঠেছে।

চুঁচুড়ায় সাইগারসনের কাছে সে খুব একটা সুবিধে করতে পারল না। প্রথমে তো তাঁর চাকর ঢুকতেই দিচ্ছিল না। শেষে দেখা হলেও টাকার ব্যাপারে তিনি পিছিয়ে এলেন। লন্ডনে যোগাযোগ করতে হবে, কথা বলতে হবে, দিন পনেরো সময় লাগবে। এদিকে ঘরে পুলিশ ঢুকে গেছে। তারিণীও ঠিক কোন পক্ষে আছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তারিণীই তাকে সংঘে ঢুকিয়েছিল, কিন্তু এখন গা বাঁচাতে যদি সে শৈলকে ধরিয়ে দেয়? যাবার আগে বারবার সে সাহেবকে অনুরোধ করল, তারিণীকে যেন কিচ্ছুটি না জানানো হয়। সাহেব অন্তত মৌখিকভাবে রাজি হলেন।

এখন উপায়? র‍্যাডির সঙ্গে কীভাবে দেখা করবে সে জানে না। আজ চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় ফেরার শেষ ট্রেন চলে গেছে। নিজের বাড়িতে থাকার উপায় নেই। অক্ষয় সরকারের আড্ডার প্রশ্নই ওঠে না। একমাত্র উপায় তারিণীর সেই শরিকি বাড়ি। তারিণী বাড়িতে না থাকলেও তার আত্মীয়রা থাকেন। আজ রাতের মতো কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। শৈল সেদিকেই পা চালাল। রাস্তা অন্ধকার। বৃষ্টিটা আবার কেঁপে নামল। তোলা ফটক পেরোতে না পেরোতে শৈল বুঝল গোটা রাস্তায় সে একা। মানুষ তো দূরস্থান, একটা কুকুর অবধি রাস্তায় নেই। পকেটের নাটকটা ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে। সমস্যা নেই। আরও আটানব্বইটা আছে। এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছে, এমন সময় রাস্তার ঠিক মাঝখানে মিশমিশে কালো একটা দেওয়াল যেন তার পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। এক নিমেষে শৈলর পায়ের তলার মাটি সরে গেল যেন। তিনজনের মধ্যে মাঝের

জন আকারে কিছু ছোটো। বর্ষাতির ফাঁক থেকে একটা ঢাকা লণ্ঠন বার করে ঝিলিমিলিটা সামান্য খুলে দিতেই চিনতে পারল শৈল। র‍্যাডি। কিন্তু র‍্যাডির এমন চেহারা আগে সে দেখেনি। চোখে মুখে তীব্র ঘৃণা যেন ফুটে উঠছে। এক ভয়ানক জিঘাংসাতাড়িত হয়ে এই অনাসৃষ্টির দিনেও সে কৃতান্তরমতো শৈলকে ধাওয়া করেছে।

কেটে কেটে উচ্চারণ করল র‍্যাডি, "তোমার বাড়িতে দারোগা ঢুকছে আর তুমি সরকারি গোয়েন্দারবাড়িতে যাচ্ছ, কী মতলব বলো দেখি?"

ভয়েশৈলর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। সে কিছু বোঝার আগেই বাকি দুজন তাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে ঠেসে ধরল পাশের পগারের ধারের এক গাছের গায়ে। লণ্ঠনের আলোতে শৈল দেখতে পেল দুজনের হাতেই দুটো ছোৱা চিকচিক করছে। ছোরার একদিক খাঁজকাটা।

আবার একই প্রশ্ন করল র‍্যাডি। কোনওমতে যতটুকু জানে জবাব দিল শৈল।

"এবার আসল কথায় এসো দেখি। কুড়ি দিন সময়দিয়েছিলাম। আজ আর-একটু বাদেই কুড়ি দিন শেষ হবে। হিলির ভূত এখন কার কাছে? আর মেয়েটা কোথায়?"

"হিলির ভূত..." কোনওমতে দম নিয়ে শৈল বলল, "হিলির ভূত লখনের কাছে। আর লখনের বোনের একটা মেয়ে আছে। নাম দ্রিনা। একবারে মেমসাহেবের মতো দেখতে। সংঘ তাকে খুব যত্নে লুকিয়ে রাখে।"

"স্টারে কার কাছে গেছিলে?"

"অমৃতলালের কাছে। নতুন নাটক জমা দিতে।"

"তোমার না নাটক লেখা মানা?"

"এটা ওদের ভয় দেখাতে। এই নাটক মঞ্চ পেলে ওরা বুঝত ওদের প্ল্যান ফাঁস হয়ে গেছে। আর রানির বিরুদ্ধে যাবার সাহস করত না।"

"সে নাটক কোথায়?"

"এক কপি আমার পকেটেই আছে", পকেটে কোনওমতে হাত ঢুকিয়ে নাটকটা বার করে দেখাল শৈল। বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে দলা পাকিয়ে গেছে প্রায়। "আর- একটা স্টারে অমৃতলাল বসু মশাইয়ের কাছে। বাকিগুলো তারিণীর আপিসে।"

"শেষ প্রশ্ন, মাস্টার ম্যাসন কে? হল মাস্টার না, গোপন গ্র্যান্ডমাস্টার। যিনি এই সবকিছুর পিছনে আছেন।"

একটু ইতস্তত করল শৈল। সংঘে শয়তানের নাম করাও এত পাপ না, মাস্টার ম্যাসনের নাম জানানো যতটা পাপ। মাত্র গুটিকয়েক তাঁর আসল পরিচয় জানে। শৈল তাদের একজন।

শৈলর নীরবতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো ছোরা ধীরে ধীরে তার চামড়া কেটে বসতে লাগল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে। কিন্তু এত রাতে তার চিৎকার কে শুনবে?

বাধ্য হয়েই সে মাস্টার ম্যাসনের নাম বলল। আসল নাম। রাডি কিছু বলল না। তবে বোঝা গেল সে অবাক হয়েছে। শৈল দেখল তার দুপাশে দুই গুন্ডার চাপ কমে গেছে অনেকটাই। এবার একটু সাহস করে র‍্যাডিকে শুধাল, "আমি তো যা জানি, সব বলেই দিলাম। এবার আমার পুরস্কার? আপনি কথা দিয়েছিলেন..."

"ঠিক। কথা দিয়েছিলাম বটে। সংঘে ঢোকার সময় যে চারটে শব্দ শেখানো হয়েছিল, মনে আছে?"

"আজ্ঞে *Dissimulo, Fraternitati, Unio, Oblitus*। গোপনীয়তা, ভ্রাতৃত্ব, একতা, বিস্মৃতি।"

"ঠিক। একদম ঠিক। এই তিন আর চারের মধ্যে অদ্ভুত সম্পর্ক, জানো তো। কেউ বলেনি বোধহয়। যে ব্যক্তি তিন নম্বর রক্ষা করতে পারে না, তার জন্য আছে চার নম্বর। চিরবিস্মৃতি। সংঘে বেইমানদের কোনও স্থান নেই। যে বেইমান, যার রক্তে বেইমানির বীজ, তাকে ধ্বংস করাই সংঘের লক্ষ্য।"

শৈল কিছু বুঝে ওঠার আগেই দুই দিকের দুই জোয়ান তার মুখ বেঁধে দিল একটা কাপড়ে। বর্ষাতির পকেট থেকে রশি বার করে একজন বেঁধে ফেলল দুই হাত। শৈল বুঝতে পারল তার দুই পা টেনে ধরে ফাঁক করে দিয়েছে অন্যজন। এবার র‍্যাডি একদম ধীরেসুস্থে তার কোর্টের পকেট থেকে একইরকম একটা শাঁজকাটা ছোরা বার করল। হাতের ঢাকা লণ্ঠনটা রেখে দিল পাশে। শৈলর মনে হল তার দুই পায়ের ফাঁকে একটা গরম ধাতু ঢুকে সুতীব্র এক বেদনা ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা দেহ জুড়ে। শুনতে পেল কাছেই কোথাও তীব্রগর্জনে বাজ পড়ল একটা। রাড়ির ছোরা যখন তার পেট দুফালা করে দিচ্ছে, তখনও শৈলর ডান হাতের বজ্রমুষ্টিতে ধরা তার লেখা শেষ ম্যাগনাম ওপাস "বিষম ভূত আর পুষ্পসুন্দরীর পালা"। কাগজের সেই মণ্ড এখন বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে। শত যন্ত্রণাতেও সে ওটাকে ছাড়েনি!

গণপতির কথা

১।

"বদলে দিয়েছে। শয়তানটা হাতকড়া বদলে দিয়েছে।" মনে মনে গাল পাড়ল গণপতি। "আর কিচ্ছু করার নেই। সব খেলা শেষ। দর্শকদের থেকে একটু সময় চেয়ে স্টেজের পিছনে চলে যাব? সেখানে হয়তো কিছু ব্যবস্থা হতে পারে। নাকি চুপটি করে বসে থাকব? একসময় অধৈর্য হয়ে দর্শকরা নিজেরাই চলে যাবে।"

যে তার হাতে হাতকড়া পরিয়েছিল, তার ধৈর্যের অভাব নেই। শান্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছে, গণপতি কী করে তা দেখার জন্য। গণপতি হাতে ঝাঁকি দিল। অনেক সময় এভাবে কাজ হয়। প্রতিটা ঝাঁকিতে হাতকড়ার ভিতরের লোহার কাঁটা গেঁথে যেতে লাগল তার চামড়ায়। আর তীব্র ব্যথায় প্রায় কঁকিয়ে উঠতে লাগল গণপতি।

দর্শকদের অত ধৈর্য নেই। এবার পিছন থেকে কে যেন সিটি দিয়ে উঠল। “কি হে জাদুকর, চাবিওয়ালা ডাকব নাকি?” আওয়াজ দিল এক ফচকে ছোকরা। এতক্ষণ যারা নিশ্বাস বন্ধ করে গণপতির জাদু দেখে প্রায় অবশ হয়ে গেছিল, তারাও একে অপরকে ঠেলা মেরে হাসাহাসি করছে। আজ প্রথমবার হয়তো জাদুকর গণপতির পতন দেখবে কলকাতার লোকজন, তাও হিন্দু মেলার মঞ্চে।

গণপতির কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

১৮৬৭ সালে চৈত্র মাসে চড়কের দিন নবগোপাল মিত্র মশাই কলকাতায় এক নতুন ধরনের মেলা শুরু করলেন। সঙ্গী ছিলেন রাজনারায়ণ বসু আর ঠাকুরবাড়ির দ্বিজু ঠাকুর। বাংলাদেশে জাতীয় ভাবের উত্থান ঘটাতে শুরু করা এই মেলার নাম দেওয়া হয় “হিন্দুমেলা”। একেবারে অন্যরকম এই মেলায় গান, বক্তৃতা, প্রদর্শনী, কী না হত? হত কুস্তি প্রদর্শন, এমনকি সার্কাস-ও। স্বয়ং নবগোপালবাবু কতগুলি মড়াখেকো ঘোড়া নিয়ে নানা কসরত দেখাতেন। সেই হল বাঙালির প্রথম সার্কাস। ইদানীং অবশ্য ঠাকুরবাড়ির ছোটো ছেলে রবি ঠাকুর নিজে দায়িত্ব নেওয়ায় আগের নেহাত কেঠো আয়োজন থেকে মেলায় অনেক বেশি মানুষ আসেন। সময়টাও একটু পিছিয়ে আষাঢ়-শ্রাবণে করা গেছে। দেশি দেশলাই, গামছা, ভেজিটেবল মোমবাতি, পুতুল, চরকায় কাটা কাপড় ছাড়াও বাড়ির মেয়ে বউরা অনেকেই খাবারের দোকান দিয়ে বসেন। আর সেই খাবারের লোভে রাজ্যের লোক জমা হয়।

তবে গত কয়েক বছর মেলায় সবচেয়ে বেশি ভিড় টানছে একটাই তাঁবু। সে তাঁবুর উপরে একটা ধুতিপরা হাসিমুখের লোকের বিরাট বড়ো ছবি। সে রুমাল নেড়ে বলছে, “বহুৎ আচ্ছা। দিল খোস হো গয়া”। তাঁবুর চারিদিকে রঙিন কাচের স্লাইড। তাতে লেখা-

কুণ্ডলীনে শোভে চারু চাঁচর চিকুর

সুবসনে ‘দেলখোস’ বাসে ভরপুর

তাম্বুলেতে 'তাম্বুলীন' সুধাগন্ধ মুখে

প্রিয়জনে পরিতোষ করে লয়ে সুখে।

এই বছর নতুন এক বিজ্ঞাপনী কৌশল নিয়েছে এইচ বোসের কৃষ্ণলীন স্টল। যারাই তাদের তাঁবুতে যাচ্ছে, সবাইকে বিনে পয়সায় এক গেলাস করে তাদের নতুন আবিষ্কার 'মিল্ক অফ রোজ' খাওয়ানো হচ্ছে। ভালো লাগলে পরের প্রতি গেলাস এক আনা। হেমেন বোস নিজে প্রতিদিন মেলায় যেতে না পারলেও বিক্রির খবর নেন। এবার বিক্রি লক্ষণীয়ভাবে কম। দোকানে ভিড় হচ্ছে বটে, কিন্তু তা বিনে পয়সায় মিল্ক অফ রোজ খাওয়ার জন্য। কেউই আর এক আনা দিয়ে পরের গেলাস খেতে চাইছে না। এমনটা তো হবার নয়। জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে দোকানের কর্মচারী অদ্ভুত এক কথা জানালে। তাঁদের তাঁবুর ঠিক উলটো দিকে নাকি এক ম্যাজিশিয়ান তাঁবু ফেলেছে। এই বছরই প্রথম। সবাই সেখানেই ভিড় করছে। হেমেন বোস ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখতে নিজেই মেলায় উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর ফটোগ্রাফার বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর। ইনি লেখালেখিও কিছু করেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল আগ্রহ ছবি তোলায়। তাই তিনিও এসেছেন হিন্দু মেলার ছবি তুলতে। মেলায় ঢুকে হেমেন বোস দেখলেন খবর একেবারে সঠিক। তাঁর তাঁবুর ঠিক উলটো দিকেই লাল হলুদ পতাকা টাঙানো বিরাট এক তাঁবু পড়েছে। বাইরে লেখা-

অদ্ভুত ইন্দ্রজাল

জাদুকর গণপতির ভোজরাজা ও ভানুমতীর খেলা

ভালো সময়েই পৌঁছেছেন তাঁরা। একটু বাদেই জাদু প্রদর্শনী শুরু হবে। একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চেল্লাচ্ছে-

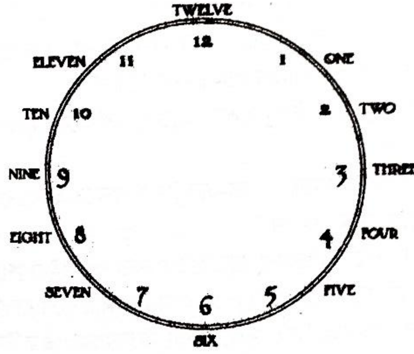
"অদ্যই শেষ রজনী! অদ্যই শেষ রজনী! অদ্য সত্যই শেষ রজনী। লোমহর্ষণ কাণ্ড। নিদারুণ ব্যাপার। ভৌতিক বাক্সের খেলা, বন্ধনমুক্তির খেলা।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাদুকর গণপতির খেলা দেখুন। দেখে মুগ্ধ হউন। টিকিট মাত্র এক আনা”

মিল্ক অফ রোজ না বিক্রি হবার কারণ এইবারে বুঝতে পারলেন এইচ বোস। এক আনা দিয়ে যদি এতরকমের তামাশা দেখা যায়, তবে সেই টাকা খেয়ে নষ্ট করে কোন পাগলে! তবে এই গণপতির নাম তিনি আগে শোনেননি। বেশ আগ্রহী হয়ে নিজেও এক আনা দিয়ে একটা টিকিট কাটলেন। তাঁর বন্ধু অবশ্য ম্যাজিকে খুব বেশি আগ্রহী নন। তিনি বাইরে ক্যামেরা কাঁধে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

ভিতরে ঢুকে এইচ বোস বেশ অবাক হয়ে গেলেন। তাঁবুর আকার খুব ছোটো নয়, কিন্তু তাও কানায়কানায় ভরা। দর্শকদের অনেকেই আগেও এসেছে জাদু দেখতে, আবার আজও যে এসেছে, তা তাদের কথাতেই বোঝা গেল। মঞ্চ বলতে কাঠের চৌকি দিয়ে সামান্য উঁচু করা। ভিতরে হ্যাজাকের আলোতে ঝলমল করছে। খানিক বাদে বাইরের সেই সহকারী তাঁবুর সামনের পর্দা আটকে দিলে। বাজনদাররা সবাই মিলে জোরে জোরে খোল, করতাল, ভেঁপু বাজাতে লাগল। এইবার খেলা শুরু হবে।

সেসব থামতেও জাদুকরকে দেখা গেল না। মঞ্চ শূন্য। শোনা যাচ্ছে হারমোনিয়াম বাজিয়ে মধুর কণ্ঠের গান, “মন যারে ভালোবাসে কেন তারে নাহি পায়/ যার তরে নয়নঝরে, সে তো ফিরে নাহি চায়।” শেষ হতেই প্রবল হাততালির মধ্যে মঞ্চে জাদুকর এলেন। তাঁর হাতে ধরা বিরাট এক ঘড়ি। সে ঘড়িতে কাঁটা-ফাঁটা কিচ্ছু নেই। শুধু সংখ্যা আর সংখ্যার নাম লেখা।



"আমি যখন হিমালয়ে আমার গুরুর কাছে জাদুবিদ্যে শিখেছিলাম, তখন ফিরে আসার সময় তিনি খুশি হয়ে আমায় এই ঘড়িটা দিয়েছিলেন। আমি বললাম, 'বাবা, এই ঘড়িতে সময় দেখব কী করে?' বাবা বললেন, 'বেটা, এ হল জাদুঘড়ি। এতে কাঁটা লাগে না। সময় এখন তোর হাতের মুঠোয়। তুই যা বলবি, ঘড়িতে সেই সময়ই দেখাবে।' আমি দর্শকদের বলছি, যদি কেউ একটু মঞ্চে উঠে আসেন...'

বেশ আগ্রহী হয়ে হেমেন বোস নিজেই উঠে এলেন মঞ্চে। দেখাই যাক না, এ কেমন জাদুকর! বোসের হাতে একটা কালো রুমাল দিয়ে গণপতি বললে, "আপনি যতটা সম্ভব জোরে আমার চোখ বেঁধে দিন। যেন একবিন্দু আলো আমার চোখে প্রবেশ করতে না পারে।"

হেমেন বোস তাই করলেন। এবার গণপতি ঘড়ি আর দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আমার পক্ষে কি এখন ঘড়ি দেখা সম্ভব?"

দর্শকদের একাংশ বেশ জোরেই বলে উঠল, "না।" হেমেন বোস নিজেও বুঝলেন দেখা সম্ভব নয়। তিনিও মাথা নাড়লেন।

"এইবারমশাই, এখন থেকে আপনার হাতই আমার ঘড়ির কাঁটা। আপনার হাত চলবে আমার বশে। আপনি ডায়ালের একেবারে মাথায় বারোতে হাত রেখে

যে-কোনো সংখ্যার কথা ভাবুন। যে-কোনো। যে সংখ্যাটা আপনার ভালো লাগে।"

হেমেন বোস বারোতে আঙুল রাখলেন। মনে ভাবলেন ছয়।

"এবার সেই সংখ্যাটার বানান করুন। মনে মনে। আর প্রতিবার ঘড়ির ডায়াল বরাবর নতুন সংখ্যায় হাত রাখুন। গোনা শেষ হলেই থেমে যাবেন।"

S-I-X, বারোর পর থেকে শুরু করে হেমেন বোসের আঙুল ডায়ালের তিন নম্বরে থামল।

"এবার নতুন সংখ্যাটার বানান করে আবার একবার আঙুল চালান।"

T-H-R-E-E, হাত এবার আটের ঘরে।

"ব্যস! এবার বলুন তো, আপনি মনে মনে যে সংখ্যা প্রথমে ধরেছিলেন, বা দ্বিতীয়তে, এদের একটাও আমার জানার কথা কি?"

হেমেন বোস মৃদুকণ্ঠে কিছু বলার আগেই দর্শকদের থেকে সজোরে "না-আ-আ" ভেসে এল।

"এইবার শেষবার আপনাকে আর-একটু কষ্ট করতে হবে। শেষ যে সংখ্যাটায় হাত দিলেন সেটাও শুনে ফেলুন।"

E-I-G-H-T, গুনে নতুন সংখ্যায় হাত দেবার আগেই গণপতি চিৎকার করে বলে উঠল, "হিমালয়ের বাবা বলেছিলেন, সময় আমার বশে থাকবে। এই দেখুন। সময় আমার বশে রয়েছে। এই মুহূর্তে এই ভদ্রলোক 'এক'টায় আঙুল দিয়ে আছেন। ঠিক কি না?"

গোটা তাঁবু করতালিতে ফেটে পড়ল। হেমেন বোস-ও মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তখনও তাঁর অনেক কিছু দেখা বাকি ছিল।

গণপতি প্রথমে তাসের কিছু খেলা দেখালে। তার নির্দেশে দর্শকদের বলা তাস বান্ডিল থেকে লাফিয়ে উঠে শূন্যে তিরতির করে ভাসতে লাগল। তারপর সরু ছুঁচ আর সুতো নিয়ে গণপতি পা দিয়ে শুধু ছুঁচে সুতোই পরাল না, সেই

ছুঁচ দিয়ে রীতিমতো ছেঁড়া জামা সেলাই করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল। এরপর তো আরও এক কাঠি। একমুঠো ভর্তি ছুঁচ নিয়ে গণপতি গপাৎ করে গিলে নিল। দর্শকদের অনেকেই হায়হায় করে উঠতেই গণপতি তাদের হাত তুলে অভয় দিল। সেখানেই শেষ না। সুতোর বান্ডিল থেকে কিছুটা লাল সুতো ছিঁড়ে সেটাও গিলে ফেলল। বেশ খানিক মুখ বিকৃত করে চিবিয়ে হাঁ করেই মুখ থেকে সে যখন সুতোয় গাঁথা ছুঁচের মালা বার করছে, এইচ বোস-ও মনে মনে মেনে নিলেন এমন জাদুকরের কাছে তাঁর মিল্ক অফ রোজ নেহাত পানসে।

ভূতের বাক্সের খেলায় গণপতিকে একটা বাক্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। শুধু তার মাথা আর হাত দুখানা বাইরে। সেই দুই হাত ধরে আছে তার দুই সহকারী। বাক্সের বাইরে কাগজে মোড়া স্লেট ঝুলছে। প্রথমেই গণপতি আর তার সঙ্গীরা বিদেহী আত্মাকে আহ্বান করল। আবার দুই দর্শককে মঞ্চে ডাকা হল। হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল দুটি বই। বলা হল যে-কোনো দুটি পাতা খুলে দুটি শব্দ পড়ে মনে রাখতে। তাঁরা তাই করলেন। এবার দুইজনের হাতে কাগজে মোড়া স্লেট দুটো ধরানো হল। বলতে বলা হল, বইয়ের পৃষ্ঠা আর শব্দ। বলার পরে স্লেটের ঢাকা খুলে দেখা গেল আত্মা এসে আগেই সেটা একেবারে সঠিকভাবে লিখে দিয়ে গেছে।

শেষ খেলা। আসল খেলা। বন্ধন মুক্তির খেলা। এই খেলার আগে প্রতিবার গণপতির বুক টিপটিপ করে অদ্ভুত এক আনন্দে। প্রথম অংশে গণপতিকে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে বাক্সে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। সে মুহূর্তে বন্ধন খুলে বেরিয়ে আসে। এই খেলা তার কাছে জলভাত। তার চেনা। কিন্তু তারপরেই সে যেটা করে সেটা হল সরাসরি চ্যালেঞ্জ। দর্শকদের মধ্যে কারও কাছে কোনও হাতকড়া থাকলে সে এসে গণপতিকে সেই কড়া দিয়ে বাঁধতে পারে। গণপতি মুক্ত হয়ে দেখাবে। বেশিরভাগ দর্শক এটার জন্যেই অপেক্ষা করে। অনেক সময় কেউ চ্যালেঞ্জ নিতে চায় না। কিন্তু দর্শকদের মধ্যে পুলিশের কেউ থাকলে খেলা জমে ভালো। প্রত্যেক পুলিশের ধারণা তার হাতকড়া সবচেয়ে সেরা। দুনিয়ার কেউই

তা থেকে মুক্ত হতে পারবে না। আর প্রতিবার গণপতি তাদের ভুল প্রমাণ করে। চেনা খেলা বারবার দেখানোর চেয়ে এই খেলা দেখানোতে ঢের বেশি মজা। আজকেও সব খেলা শেষে সে দর্শকদের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। তবে জানত আজ কিছু হবে না। সে আগেই দেখে নিয়েছে লাল পাগড়ি কেউ নেই এদের মধ্যে।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা হাত উঠল। গণপতি তাকে মঞ্চে ডাকতে গিয়ে আরও অবাক হয়ে দেখল এ কোনও দেশি মানুষ নয়, পাকা সাহেব। তার সাধ্যমতো ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে সাহেবকে ডেকে নিল সে। দরকারের কিছু বেশিবারই "ওয়েলকাম ওয়েলকাম" বলল। এবার আসল কাজ। সাহেব তাঁর পকেট থেকে যে হাতকড়াটা বার করলেন সেটা তার অতি চেনা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। মনে মনে হাসল গণপতি। এইখানে তারিণী থাকলে ভালো হত। কতকাল আগে এই হ্যান্ডকাফ নিয়েই তো ছোটুলাল ঘাটে প্রায় ডুবে মরতে বসেছিল তারা। এই হাতকড়া পরীক্ষা করার কিছু নেই। হাতে না নিয়েই সাহেবকে হাতকড়া পরিয়ে দিতে বলল গণপতি।

"ক্লিক" শব্দ করে তালা হাতে আটকে যেতেই ডান কবজিতে আলতো মোচড় দিল সে। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের তুক এটাই। পাশে একটা স্ক্রু থাকে। এই মোচড়ে সেটা ঢিলে হয়ে যায়। বাকিটা জলভাত। আজকে মোচড় দেবার পর হাতকড়া আরও এঁটে বসতেই চমকে গেল গণপতি। আর তখনই চরম আতঙ্কের সঙ্গে সে খেয়াল করল এটা কোনও সাধারণ হাতকড়া না। বিশেষভাবে বানানো। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের স্ক্রু-টাকে খুলে সেই জায়গায় লোহা দিয়ে ঝালাই করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এক বিন্দু সরানোর উপায় নেই। খেলা দেখানোর আগে একটু সতর্ক হলেই এমনটা হত না। কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। গণপতির হাত বেয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। কিন্তু দর্শকদের সেদিকে লক্ষ নেই। তারা নানারকম টিপ্পনী কাটতে ব্যস্ত। অনেকে তো আবার পয়সাও ফেরত চাইছে। এমন অপমানিত আগে কোনও দিন হয়নি গণপতি। এবার হাতকড়ার

কাঁটা মাংস ভেদ করে সোজা হাড়ে বিঁধছে। আজকের মতো হাত খুলতে পারলেও এই হাতে জীবনে আর কোনও দিন জাদু দেখাতে পারবে না গণপতি। চিরকালের মতো তার হাত দুটো অকেজো হয়ে যাবে।

এরই ফাঁকে অন্য এক চিন্তা খেয়ে ফেলছিল তাকে। কে এই সাহেব? আচমকা যেন মাটি খুঁড়ে উদয় হয়ে গণপতিকে সবার সামনে উলঙ্গ করে দিতে বদ্ধপরিকর। এ কী চায়? যেন তার মনের কথা বুঝেই সাহেব ফিসফিসিয়ে কাটা কাটা ইংরাজিতে তাকে বললেন, "মুক্তি চাই?"

গণপতি কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল না। শুধু ধীরে ধীরে মাথা উপরে নিচে নাড়াল।

"তাহলে আমার কথা শুনতে হবে। রাজি?"

গণপতি সাহেবের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছিল না। কিন্তু এখন সে সময় নেই। সেসব পরে বোঝা যাবে। প্রায় কিছু না ভেবেই আবার উপরে নিচে মাথা নাড়াল সে। সাহেব যেন পালকের মতো হালকা একটা হাত বুলিয়ে দিলেন হাতকড়ায় আর খট শব্দ করে দুটো কড়াই খুলে গেল। দর্শকরা ফেটে পড়ল জয়ধ্বনিতে। গণপতির হাত দিয়েঝরে পড়া রক্ত লেগে আছে গোটা হাতকড়া জুড়ে। সেটাই কুড়িয়ে নিয়ে নিজের পকেটে ঢুকিয়ে সাহেব আর কোনও কথা না বলে নেমে গেলেন। যাবার আগে শুধু বলে গেলেন, "তোমায় আমি খুঁজে নেব।"

এত কিছুর মধ্যে সাহেবের একটা জিনিসই চোখে পড়েছিল গণপতির। সাহেবের অদ্ভুত ভাবলেশহীন চোখ। চোখের একটা মণি নীল, আর অন্যটা ধূসর।

২।

গণপতি ছুটছিল। তীব্র বৃষ্টির ফলা তার শরীরকে বিধে ফেলছে ক্রমাগত। তার এই মরিয়া দৌড়ের সামনে কিছু নেই, কোনও উদ্দেশ্য নেই, কোনও চাওয়া

পাওয়া নেই। তবু সে ছুটে চলছে। হাঁচড়েপাঁচড়ে। সে জানে না সে ছোটা বন্ধ করলে কী হবে? ছুটেই বা যাচ্ছে কোথায়? তবু এক অশনির অমোঘ টানে তার এই ছুটে চলা। সামনেই এক রুম বাঁশের সেতু। এই সেতুতে চেপে ইস্কুলে যেত একেবারে ছোটোবেলায়। সেতুর অন্যদিকে প্যাদনা দাঁড়িয়ে হাসছে। কোন এক অলীক মন্ত্রে প্যাদনা আবার সেই বছর দশেকে ফিরে গেছে। খালি গা, কোমরে ঢোলা ইজের। প্যাদনা সুর করে গান গাইছে, "ও ললিতে, চাঁপাকলিতে একটা কথা শুন সে/রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়া বাঁধা এক মিনসে।" গণপতি সেই সেতু দিয়ে ওপারে পৌঁছাতেই দেখল প্যাদনা আর নেই। সে এক অন্ধকার গুহার ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। অনেক দূরে এক বিন্দুর মতো একটু আলো দেখা যাচ্ছে। গণপতি ছোটার বেগ কমাল না। সেই অন্ধকার গুহাতেও চোখ সয়ে গেছে অনেকটাই। গণপতি দেখতে পেল টকটকে লাল শালু পরনে, হাতে একটা ত্রিশূল নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে হাসছেন পিণ্ডারী বাবা... "বেটা তাকত হ্যায়? হিম্মত হ্যায়?" না, সে ভুল দেখেছে, লাল শালু না, লাল রক্ত পিণ্ডারী বাবার বুকের তলা থেকে ভেসে যাচ্ছে রক্তে, পাঁজর থেকে নিচ অবধি দেহটা দুফালা, বেরিয়ে আছে অস্ত্র। তবু বাবা হা হা করে হাসছেন। গণপতি ছোটা থামাল না। সেই অবস্থাতেই কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করে বলে, "হাজতে যাবি, না আমাদের কথা শুনবি?" গণপতি সভয়ে দ্যাখে সামনের দাঁত উঁচু ছেলেটার হাতের একটা আঙুল নেই। সেই হাতেই সে বাড়িয়ে ধরেছে অদ্ভুত এক বাক্স। গণপতি জানে এই বাক্সে ভূত আছে। গণপতি হাত বাড়িয়ে বাক্স নিতে যায়। আর তখনই খেয়াল করে তার হাতে হাতকড়া বাঁধা। স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, যার একদিক ঝালাই করে আটকে দেওয়া হয়েছে। গণপতি বুঝতে পারে না সে কী করবে? মাথার ভিতর অজস্র কথামালা জাল বুনে চলে। গোটা গুহা ভরে যায় মহিলা কন্ঠের এক হাসিতে। এ হাসি গণপতির খুব চেনা। সোনাগাজির লক্ষ্মীমতি হাসছে। মরে গিয়েও হাসছে। আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটা। লখন যাকে নিজের দিদি বলে ডাকে। মায়াবী চোখে গণপতির দিকে

তাকিয়ে আছে সে। গণপতি তার দিকে এগিয়ে যেতেই দেখল সে ভুল দেখেছে। এ অন্য মানুষ। এ নারী না। পুরুষ। শৈল। শৈলচরণ সান্যাল। শৈলর হাতে একটা পাতলা ছাপা রঙিন কাগজ। গণপতি হাতকড়ায় বাঁধা হাত বাড়িয়ে সে কাগজ নিতে যেতেই শৈল ছুট লাগাল। ধাওয়া করল গণপতি। গুহার ছাদ ভেঙে যাচ্ছে। আর সেখান থেকে খুব ধীরে নিচে এসে পড়ছে একটা মৃতদেহ। হ্যালিডের মৃতদেহ। শৈলর সেদিকে নজর নেই। সে দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে দুজন চলে এল গুহার একেবারে শেষে। এখানে অপার্থিব এক নীল আলোয় ভরে আছে চারদিক। শৈল দৌড় থামাল না। সামনেই অতলস্পর্শী এক খান। শৈল গিয়ে সোজা লাফ দিল সেই খাদে। গণপতিকে সে ডাকল "আয়আয়" বলে। গণপতি দ্বিধা করে। বুঝতে পারে না তার লাফানো উচিত কি না। ততক্ষণে খাদের ধারে ওরা সবাই এসে গেছে। প্রিয়নাথ দারোগা, সাইগারসন সাহেব, বড়লাট, এমনকি হীরালাল-ও। কেউ কিন্তু বলছে না। সবাই অপেক্ষা করছে গণপতির মহাপতনের। ভিড়ের মধ্যে থেকেই এগিয়ে এলেন এক সাহেব। সেই সাহেব, যার এক চোখ নীল, আর অন্য চোখ ধূসর। গণপতিকে কিছু বুঝতে না দিয়েই সাহেব হালকা হাতে মারলেন এক ঠেলা। গণপতি দেখল কোন আজব মন্তবলে সে আবার চলে এসেছে ছোট্টুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাটে। ডুবে যাচ্ছে। জল বেড়ে উঠছে গলা, কান, মাথা... আর ঠিক সেই সময়ই একটা হাত এগিয়ে এসে তার চুলের মুঠি ধরল দৃঢ়ভাবে...

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল গণপতি। সারা গা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। যেন সদ্য স্নান সেরে এসেছে। ধীরে ধীরে তাঁবুর পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গোটা মেলা যেন শ্মশানভূমি। একটা মানুষও জেগে নেই। দুই-একটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। তাদেরই একজন গণপতিকে দেখতে পেয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। শেষ রাত। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় ঢলঢল। এখনই সময়। আর বেশি দেরি করলে অবস্থা হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

পরনের ধুতিটায় মালকোঁচা মেরে, একটা ফতুয়া চাপিয়ে সেই রাতেই গণপতি ক্লাইভ স্ট্রিটের দিকে পা বাড়াল।

লক্ষ্মীমতি মারা যাবার পরে বেশ কিছুদিন তার ঘর ফাঁকা ছিল। যতই হোক, অপঘাত মৃত্যু। বেশ্যাদের মধ্যে আর কিছুর ভয় থাক না থাক, ভূতের ভয় প্রবল। কিন্তু এতদিন পরেও যখন কোনও উপদ্রব হয়নি, তখন সবাই ধরে নিল লক্ষ্মীমতি এই ঘরের মায়া কাটিয়ে অন্যলোকে জমিয়ে বসেছে। এখন তার ঘরের দখল নিয়েছে জুঁই নামের অল্পবয়সি এক বেশ্যা। গায়ের রং কালো হলেও মুখশ্রী সুন্দর, আর খদ্দেরকে বশ করার ছলাকলা এর মধ্যেই ভালো আয়ত্ত করেছে। এক সাহেব ইদানীং তাঁর বাঁধা বাবু। প্রায় প্রতিদিন একটু রাতে সাহেব এসে হাজির হন। এ সাহেব অন্যদের মতো না। দেখলেই কেমন যেন ভয়ভয় করে। বিশেষ করে চোখের দিকে তাকালে। সাহেবকে খুশি করতে অনেকসময় তার নিজের ঘরেই আরও দুই-চারটি মেয়েকে বসাতে হয় জুঁইয়ের। একা জুঁইতে সাহেবের সুখ হয় না। ইদানীং সাহেবের নতুন শখ হয়েছে। সোনাগাজির অলিতে গলিতে বেশ্যাদের ছোটো ছোটো ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়। এরা সবচেয়ে হতভাগা। মায়ের এদের থেকে কোনও আশা নেই। বড়ো হয়ে হয় দালাল হবে, নয়তো গুণ্ডা বদমাশ। এই সাহেব আসার পরে এদের ভাগ্য কিছুটা খুলেছে। সাহেবের আদেশে জুঁই এদের মধ্যেই দেখতে শুনতে ভালো এমন সাত-আট বছরের দুই-একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে আসে। প্রচুর টাকা বকশিশ দিয়ে বলা হয় কাউকে কিছু না বলতে। সাহেব এদের নিয়েই ফুর্তি করেন। জুঁই দরজার কাছে পাহারা দেয়। এদের মায়েরা খেয়াল রাখে না ঠিক, কিন্তু যদি জানে, জুঁই তাদের ছেলেদের দিয়ে এইসব কাজ করাচ্ছে, তবে অনর্থ হবে। এখন প্রায় শেষরাত। এখনও সাহেব বিছানায় ল্যাংটা হয়ে শুয়ে আছেন। দুটো বাচ্চা ছেলে ক্লান্ত হয়ে পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে। জুঁই মুখ ফিরিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল।

মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা তারিণীর। সেই যবে হাসপাতাল থেকে বাড়ি এসেছে, রাত গভীর হলেই ব্যথা বাড়ে। প্রথমে মাথার ঠিক মাঝখানে চিড়িক করে একটা ঝিলিক দিলেই তারিণীর ঘুম ভেঙে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে গোটা মাথাজুড়ে। আর শুয়ে থাকা যায় না। তারিণী পাগলের মতো ঘরে পায়চারি আরম্ভ করে। মাথা টিপে ধরে বসে থাকে। মাঝে মাঝে অন্য কথা ভেবে ব্যথাকে ভুলে থাকতে চায়। আজই যেমন। রাত প্রায় শেষ হয়ে গেলেও সে জেগে আছে। টেবিলের কেরোসিন ল্যাম্পের মাথায় কালি জমে প্রায় নিভুনিভু। একমনে তারিণী ডায়রি লিখে চলেছে। এসব করলে বরং মনটা অন্যদিকে যায়। শৈলর লেখা সেই ভয়ংকর নাটকে যদি বিন্দুমাত্র সত্যিও থেকে থাকে, তবে ইংরেজ রাজত্বে এত বড়ো দুঃসময় আগে আর আসেনি। ম্যাসনিক ব্রাদাররা পরিষ্কার দুইভাগে ভাগ হয়ে গেছেন। এক দল রানির পক্ষে, অন্য দল রানিকে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। আর সেই সরানো একেবারেই গণতান্ত্রিক উপায়ে হবে বলে মনে হয় না। তবে উপায় কী? আর রানি চলে গেলে নতুন রাজা কে হবেন? বেশ কয়েকবার পড়ে শৈলর সেই নাটক তারিণীর মুখস্থ হয়ে গেছে। মাথার দুদিকের রগ চেপে সে আবার লাইনগুলো মনে করার চেষ্টা করল। বিজ্ঞাপন... প্রথম অঙ্ক.... দ্বিতীয় অঙ্ক... আর তার শেষে...। গোটা ষড়যন্ত্র এতক্ষণে তারিণীর সামনে ধীরে ধীরে একটা রূপ নিতে শুরু করেছে। এ যদি সত্যি হয়, তবে তা ঠেকানোর সাধ্যি তার মতো ছাপোষা মানুষের নেই। 'ভারতভিক্ষা' ছবির প্রতিটা সংকেত এবার তার কাছে পরিষ্কার। মাথার তীব্র যন্ত্রণা ভুলে ভূতগ্রস্তেরমতো তারিণী ডায়রিতে সবকিছু লিখে যেতে লাগল।

আপিসে ছুটি মঞ্জুর হয়েছে। প্রিয়নাথ দেশের বাড়ি যেতে পারেন। কিন্তু এই প্রথমবার প্রিয়নাথের বাড়ি যেতে ইচ্ছেই করছে না। এমন ভয়ানক এক বিপদ গিলোটিনের মতো গলার কাছে ঝুলে রয়েছে, এই অবস্থায় বাড়ি গেলেও শান্তি পাবেন না তিনি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এইসবই সাতপাঁচ ভাবছিলেন। গোটা

কেসটা যেভবে শুরু হয়েছিল, এখন সবকিছু ঘুরে গিয়ে একেবারেই অন্য রূপ নিচ্ছে। ব্রাদারহুড, জাবুলন, মহারানি, ষড়যন্ত্র- এত কিছু এই এক জীবনে তাঁকে দেখে যেতে হবে বলে ভাবেননি প্রিয়নাথ। সাইগারসন সাহেব যা ইঙ্গিত দিলেন, তাতে খুব তাড়াতাড়ি এরা কিছু একটা করবে। কী করবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা যদি তাঁর থাকত! আর এই ভূত ব্যাপারটাই বা কী? হাতে শৈলচরণের নাটকটা নিয়ে উলটেপালটে দেখছিলেন। হঠাৎ একেবারে পঞ্চম অঙ্কের শেষের দিকে চোখ পড়ল তাঁর। তোয়াজি হিলি ভূত, সেনাপতি, কতা শুনবে না, সেনাপতির বিলাপ.... গোটা ব্যাপারটাই কেমন চেনাচেনা লাগছে। আর যদি তাই হয়, তবে এতদিন যেসব সমস্যা নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে গোটা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, সেটা আসল সমস্যাই না। সমস্যার পূর্বাভাস মাত্র। ভয়ানক একটা বড় আসে কাল যে করেই হোক তারিণী আর সাইগারসনের সঙ্গে দেখা করে তাঁর এই ধারণার কথা বলতে হবে। আজ রাতে আর ঘুম হবে না। পূর্ণিমার চাঁদের আলোতে ঘরে ভেসে যাচ্ছে, তবু টেবিলের আলোটা উসকে দিলেন প্রিয়নাথ। টেবিলে সদ্যপ্রকাশিত এক গোয়েন্দার আত্মজীবনী। আসল লেখকের নাম নেই। নামটা দেখেই আগ্রহী হয়ে বইটা কিনেছিলেন তিনি। ঘুমই যখন আসবে না, পরে দেখ যাক কী লিখেছে তাঁর সিরিজের সমনামী এই "বাঁকাউল্লার দপ্তর" -এ।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের কোনও ঘরে কোনও আলো জ্বলছে না। সবাই যেন রাত্রির সুষুপ্তির ঘোরে ক্লান্তির আলোয়ান মুড়ে অচৈতন্য। শুধু দোতলার এক ঘরে একটা লোক জেগে আছে। তাঁর টেবিলে গ্যাসোজিনের পাত্র, তাঁর ঘর খন তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছা, চক্ষু দুটি মুখে তিনি দুই পা টান করে ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে ভেবে চলেছেন। যে দায়িত্ব নিয়ে দ্বিতীয়বার ইংরেজ রাজত্বের এই দ্বিতীয় লন্ডনে পা রেখেছেন তিনি, জানেন না, সেই কাজে সফলকাম হবেন কি না। আজ, একাকী, এই ভিনদেশে এই হোটেলের ঘরে বসে প্রথমবার তাঁর মনে হল এককালের গৃহসখা সেই ডাক্তারের কথা, লন্ডনের লাইসেনিয়াম

থিয়েটারের কথা, চোরা গলিখুঁজিতে ঘুরে বেড়ানো উইগিল আর তার দলবলের কথা। যে দায়িত্ব পালনে তিনি এই দেশে এসেছেন তার শেষ কোনও রোমান্টিক গল্পের মতো সুখদায়ক হবে না তিনি জানেন। তিনি জানেন এই পথের শেষে রয়েছে এক রক্তঢালা করুণ পরিসমাপ্তি। যে পক্ষের জয়ই আসুক না কেন, তা আসবে প্রাণের বিনিময়ে। চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায় নেই। শুধু যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেই কাজটুকু ঠিকভাবে করে সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু যারা পড়ে থাকবে? কী হবে তাদের? কী হবে তারিণী, গণপতি কিংবা প্রিয়নাথের? যদি বেঁচেও থাকে, এদের জীবন আর আগের মতো থাকবে না। একমাত্র তিনিই জানেন এই অপরাধের পিছনে যে দীর্ঘ ছায়া আছে, সেই ছায়া ঠিক কতটা দীর্ঘ। তাঁকে আন্দাজ করা যায়, কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। শৈল স্পর্শ করতে চেয়েছিল হয়তো। আর তাই তাকে চিরশান্তির দেশে চলে যেতে হল। তবে একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তাঁদের কার্যকলাপে এদের টনক নড়েছে। সব সম্ভাবনা থেকে অসম্ভবকে বাদ দিলে যা পড়ে থাকে সেটাই সত্য। তিনি জানেন সত্য কী। কিন্তু যতক্ষণ না চাকা ঘুরতে শুরু করছে, তাঁর কিচ্ছু করার নেই। আলগোছে হাতের পাশে রাখা স্টাডিভারিয়াস বেহালাটা হাতে তুলে নিলেন সাইগারসন। আর একটু বাদেই ভোর হবে। চাঁদের আলো ক্রমে আবছা হয়ে আসছে। আর সেইদিকেই তাকিয়ে বেহালার ছড়ে মেন্ডেলসনের Leider De One Worter, শব্দহীন গানের মূর্ছনা তুললেন সাহেব। দুইজন সুরে মাতাল রাস্তা দিয়ে গলা জড়াজড়ি করে হেঁটে যাচ্ছিল। তারাও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আলো জ্বলা সেই জানলার দিকে।

গ্রেট ইস্টার্নের জানলা দিয়ে ভেসে আসা সেই সুরে পঙ্কিল কলকাতা যেন একলহমায় লন্ডন হয়ে গেল।

৩।

মাঝরাত পেরিয়ে গণপতি যখন নিমতলা শ্মশানে ঢুকল, তার গা থেকে ভকভক করে বাংলা মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। এই একটি অভ্যেস কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেনি সে। ভেবেছে ছেড়ে দেবে, তারপরেই কিছু না কিছু একটা ঘটে যায়। মদ আর ছাড়া হয় না। খালাসিটোলার ঝাঁপ বন্ধ হতে তবেই সে পদব্রজে এসেছে এখানে। অন্য কোনওভাবে না। তেমনটাই তারিণীর নির্দেশ ছিল। সেদিন ভোররাতে তারিণীর কাছে গিয়ে সব খুলে বলেছিল গণপতি। কিন্তু লুকায়নি। শুনে তারিণী ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "এই ব্যাপার আর তোমার-আমার মধ্যে নেই। দারোগাবাবু আর সাহেবকেও জানাতে হবে। তোমার কথা যদি সত্যি হয়, হাতে মাত্র সাতদিন আছে।"

তারিণীই বলেছিল, এই মুহূর্তে চারজনের একসঙ্গে দেখা করা বিপজ্জনক। কার পিছনে কে বা কারা ফেউ হিসেবে লেগেছে বলা মুশকিল। তারিণীর অফিস ওরা চেনে। না হলে তারিণীর মাথায় বাড়ি মেরে শৈলর নাটক নিয়ে পালাতে পারত না। প্রিয়নাথ দারোগা বা সাইগারসন সাহেবের হোটেলে একসঙ্গে গেলে একই ব্যাপার। যে কিচ্ছু জানে না, তারও সন্দেহ হবে। শেষে অনেক ভেবে এই নিমতলা শ্মশানে, মধ্যরাতে তাদের অধিবেশনের ব্যবস্থা করেছে তারিণী। তাও সবাই একসঙ্গে আসবে না। এক এক করে। আলাদা আলাদা জায়গা থেকে। এসে বসে থাকবে নিজেদের মতো। এ কিছু আশ্চর্য নয়। নিমতলার শ্মশানে গেলে দেখা যায়, চারিদিকে মৃত্যুর দৃশ্য আর শোকের ভিতরে দিব্য এক নিশ্চিন্ত আড্ডা জমে আছে। আড্ডাটা দিনের চেয়ে রাত্রেই বেশি জমে ওঠে। বড়োগির্জার ঘড়িতে মাঝরাতের ঘন্টা বাজবার পরেই চারমাথা এক হবে। এইসবই তারিণী যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করেছে।

গণপতির একটু দেরি হয়ে গেছে। শ্মশানে ঢুকেই সে দেখতে পেল চারদিকে দাউদাউ চিতা জ্বলছে। পুত্রহারা মা, স্বামীহারা স্ত্রী আর বাপ-মা-হারা সন্তান অশ্রান্ত স্বরে কেঁদে কেঁদে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে। কাঙাল ও ধনী, মনিব

ও চাকর, পণ্ডিত ও মূর্খ, শিশু ও বুড়োর শব এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। পুরুত মন্ত্র পড়ছে, বালবিধবা উন্মাদিনীর মতো স্বামীর মুখে আগুন জ্বেলে দিচ্ছে, কেউ চিতায় শান্তিজল ঢালছে, সদ্য-পিতৃহীন পুত্র অশ্রুভেজা চোখে, গঙ্গাপুত্রদের সঙ্গে তাদের প্রাপ্য নিয়ে দু-চার পয়সার জন্য দর কষাকষি করছে, শ্মশানেশ্বরের মন্দিরে স্তব আরাধনার ধ্বনি উঠছে, স্থানে স্থানে এক-এক দল লোক বসে মদ আর গাঁজা খাচ্ছে, উচ্চস্বরে গল্প-হাসি-মশকরা নিয়ে মত্ত হয়ে রয়েছে, এক প্রান্তে এক সন্ন্যাসী আস্তানা গেড়ে বসেছে সামনে একদল ভক্ত জোড়হাতে বসে সমস্ত বিচারবুদ্ধি হারিয়ে তার ধাপ্পাবাজি শুনছে আর একদিকে এক পাহারাওয়ালা নাচারের মতো বসে ঢুলছে আর পানওয়ালির টিপ পরা হাসি-হাসি মুখের কথা ভাবছে। গঙ্গার সামনে একদল ফকড় ছোকরা নানানরকম ইয়ার্কি মারছে, কেউ বা ঘাটের ওপরে বসে চক্ষু মুদে ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েছে। কেউ বা মোটা গলায় চেঁচিয়ে গান ধরেছে। এদের মাঝেই এক কোণে চেনা তিনজনকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল গণপতি। একটু দূরেই চিতা জ্বলছে। তার আগুনে তিনজনকেই কেমন অদ্ভুত লাল বর্ণের দেখাচ্ছে। ওরা খুব মৃদুস্বরে কী যেন বলছিল। গণপতিকে দেখে তারিণী একটু হেসেই বলল, "যাক ভাই, তুমি এলে অবশেষে। দেরি দেখে ভাবছিলেম বোধহয় আজ আর আসতে পারলে না।" গণপতি স্পষ্ট দেখলে তার গায়ের বাংলা মদের গন্ধে দারোগাবাবুর নাক কুঁচকে গেল। সামান্য জড়ানো গলায় গণপতি উত্তর দিলে, "এসব নিয়ে ভাববেন না দারোগাবাবু। এই কারণসুধা মা কালীর পেসাদ। এই পেসাদে আমার নেশা হয় না। বরং বুদ্ধি টনটন করে", বলেই আচমকা দারোগাবাবুর কানের কাছে হাত দিয়ে একটা আট আনার কয়েন বার করে নিয়ে এল গণপতি।

"এসব ছেলেমানুষি এখন রাখো", ধমকে উঠল তারিণী, "শিয়রে শমন, আর তুমি...."

গণপতি লজ্জিত হল। মদের নেশায় সে একটু বেশিই প্রগলভ হয়ে উঠেছিল।

কথাবার্তা মূলত ইংরাজিতেই হল। গণপতি যেখানে বুঝতে পারছিল না, তারিণী বাংলায় তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। গোটা আলোচনার মুখ্য বক্তা ছিল তারিণীই।

"শৈল মারা যাবার পর আমি অনেক ভেবেছি। কেন এমন আচমকা তাকে চলে যেতে হল। শৈল ব্রাদারহুডে আমার পরে এসেছিল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ব্রাদারহুডের একেবারে ঘনিষ্ঠ মহলে সে ঠাঁই পায়। অবশ্যই নিজ গুণে। আমি যদি খুব ভুল না করি, তবে ব্রাদারহুডের গোপনতম আর-এক শাখা জাবুলনদের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল। ন্যাশনালে তাকে যে চারজন ধর্ষণ করেছিল প্রত্যেকে অপঘাতে মারা যায়। ব্রাদারহুড নিজে এই ধরনের কাজ করে না, জাবুলন করে। আর সেখান থেকেই সমস্যার শুরু। শৈলর প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হয়, কিন্তু জাবুলন শৈলকে রেহাই দেয় না। খুব সম্ভব এই ঋণ চোকাতেই শৈল সবার আড়ালে জাবুলনদের হয়ে কাজ করছিল। তবে আমি তাকে যতটা চিনি, অন্যের অধীনে কাজ করার লোক সে নয়। একসময় পর তার শিল্পীমন স্বাধীনতা খুঁজতে চাইবেই। আর যে-কোনো সংগঠন চায় প্রশ্নহীন সমর্পণ। আমি প্রায় নিশ্চিত ছিলাম, শৈলকে জাবুলন হত্যা করেছে। শৈলর লেখা সেই নাটক পড়ে আমি আরও নিশ্চিত হই। কিন্তু এরা কারা কিংবা ঠিক কী করতে চায়, কীভাবে করতে চায় আর কেন করতে চায়, সে বিষয়ে অনেক ভেবেছি, কোনও দিক খুঁজে পাইনি। পেতামও না, যদি না সেদিন ভোররাতে গণপতি এসে আমায় সব খুলে বলত।

"কী বলেছিল গণপতি?" প্রিয়নাথ কৌতূহলী হলেন।

"সেটা গণপতি নিজের মুখেই বলুক।"

একটু ইতস্তত করে গণপতি বললে, "আমি বাংলায় বলছি। তারিণী... সাহেবকে ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিয়ো।" প্রথমেই সে হিন্দুমেলায় শেষ দিনের হাতকড়ার অভিজ্ঞতা বললে। এটাও বললে যে সেই সাহেব বলে গেছিলেন উনি নিজেই গণপতিকে খুঁজে নেবেন।

“তারপর খুঁজে নিয়েছিলেন?”

“সেটাই বলছি। সেদিন সবে ম্যাজিকের খেলা শেষ হয়েছে। শেষ দিন। তাই দলের সবাইকে ছুটি দিয়েছি। তারা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি একা একখানি কেলনারের হুইস্কির বোতল আর বাদামভাজা নিয়ে বসে ভাবছি এমন কেন হল। ঠিক এই সময় সেই সাহেব আমার তাঁবুতে ঢুকলেন। তাঁর চেহারার মধ্যেই এমন একটা ব্যাপার আছে যে দেখলেই বুকের রক্ত শুকিয়ে আসে। সাহেব প্রথমেই জামার হাতা গুটিয়ে আমায় হাতের উল্কি দেখিয়ে বললেন তিনিও ব্রাদারহুডের সদস্য। তবে এখানের না। লন্ডনের। এখানের ব্রাদারহুড নিজেদের মতো কাজ করছে। কাউকে মানছে না। তাই লন্ডনের লজ থেকে তাঁকে এখানে পাঠানো হয়েছে এসব দেখভাল করতে। আমি বললাম, তা বেশ তো, করুন। তখন উনি আসল কথা বললেন। আমাদের ব্রাদারহুডের এক সদস্য আছে, ল্যানসন, অ্যাংলো। কিন্তু নিজের নাম বলে লখন। ওর বোনের এক অবৈধ মেয়ে সন্তান আছে। এই সাহেবের সেই মেয়ের খোঁজ চাই। যে-কোনো মূল্যে। আমি বললাম, আমি কোনও দিন সেই মেয়েকে দেখিনি। সাহেব বলল, বাচ্চা মেয়ে। বছর দশেক বয়স। নীল চোখ। মেমসাহেবের মতো দেখতে। আমি দেখেছি কি না। বললাম, দেখিনি। সাহেব বিশ্বাস করল না। শেষে বলল, তোমার বন্ধু শৈল দেখেছে, আর তুমি দেখোনি! আমি ওসব জানতে চাই না, তুমি সেই মেয়ের খোঁজ এনে দাও, নইলে....” এইটুকু বলে গণপতি একটু চুপ করল।

সাইগারসন সোজা গণপতির দিকে তাকিয়ে। তাঁর কানে নিজের মতো করে তর্জমা করে দিচ্ছে তারিণী। প্রিয়নাথ আবার প্রশ্ন করলেন, “নইলে কী হবে?”

গণপতির গলা তখন কাঁপছে, বলল, নইলে আমার অবস্থা শৈলর মতো হবে। আমি বললাম, আমি মরতে ভয় পাই না। তখন সাহেব যা বলল, তাতে আমি ভয় না পেয়ে পারলাম না”, গণপতি চুপ। প্রিয়নাথ আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তারিণী ইশারায় তাঁকে চুপ করতে বলল।

খানিক সামলে গণপতি আবার যখন শুরু করল, তার দু-চোখে জল, "আমাদের গ্রামে একটা মেয়ে ছিল। সত্যভামা। ছোটো থেকে তাকে চিনতাম। বামুনের মেয়ে। আমায় দাদা দাদা বলে ডাকত। আমি বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর পর অনেকদিন তার কোনও খবর নেই। কিছুদিন আগে দেখলাম রাস্তায় নেমে এসেছে। বালবিধবা। এক নাগর জুটিয়েছিল। সেই নাগর তাকে ভোগ করে। কলকাতায় এসে সোনাগাজিতে বেচে দিয়েছে। ওর যে মাসি, সে ওকে দিনরাত খাটায়, মারে। ওই পাড়ায় আমার কিছু চেনাশোনা আছে। লক্ষীমতি নামের এক বেশ্যা মরার পর সেই বাড়ি খালি পড়েছিল। আমিই ওকে ওই বাড়িতে বসিয়ে স্বাধীন ব্যবসা করতে বলি। মেয়েটা বড্ড ভালো। এখন নাম নিয়েছে জুঁই। সোনাগাজির পুঁটি গত বছর বুকের ব্যামোতে ম'ল। তার অপোগণ্ড মেয়েটাকে ও-ই মানুষ করে। সাহেব কীভাবে যেন জুঁইয়ের খোঁজ পেয়েছে। বলল, আমি মরতে ভয় না পেলেও ওরা পায়। আর আমি কথা না শুনলে ওদের এমনভাবে মারবে, যে, আমি ভাবব এর থেকে আমি মরে গেলে ভালো হত", শেষটায় গণপতির গলা কান্নায় ধরে আসে।

বড্ড হতাশ লাগে প্রিয়নাথের। সব জেনেও তাঁর হাত পা বাঁধা। ওই পাড়া নিয়ে ইংরেজ পুলিশ বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন। প্রায়ই এমন খুন জখম ঘটে। রুটিন তদন্ত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পিছনে কোনও বড়োমানুষের হাত থাকে। ব্যস! সব শেষ। ত্রৈলোক্য রাঁড়কে ধরা গেছিল, তার একমাত্র কারণ, সে নিজেও বেশ্যা ছিল।

"ভূতের বাক্স এখন কোথায়?" সাইগারসন সরাসরি গণপতিকে প্রশ্ন করেন।

"আমার কাছে ছিল। আমি খুলে দেখেছি। তাতে চার বোতলে চারটে আরক আছে। আর এক বোতলে ভরা সাদা সাদাবড়ি। প্রতিটায় লেবেল লাগানো।"

"কী লেবেল?"

"আরকে চারটে অক্ষর। B, H, U আর T। বড়িটাতে অবশ্য কোনও অক্ষর নেই। ছবি। একটা মড়ার খুলি আর হাড়ের তলায় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা, হেল ফায়ার। নরকের আগুন। বাইবেলে পাপীদের জন্য চরমতম অভিশাপ। আমি অবশ্যি বাংলায় নাম দিয়েছি অগ্নিনিরয়।"



"ওটা তোমার কাছে কেন?"

"জানি না। লখন আমাকে বলেছে এটা সাবধানে রাখতে। প্রাণের চেয়েও বেশি দামি। ওর উপরে নাকি অনেকের নজর। এটা বেশ কয়েকবার চুরির চেষ্টাও হয়েছে। আমি ভবঘুরে মানুষ, তাই নিজের দখলে রাখিনি। তারিণী লুকিয়ে রেখেছে।"

"কোথায়?" উত্তর তারিণীই দিল, "আমার আপিসে। ডিরেক্টরের কাছে। যেখানে সেই তৈমুরের কাব্যগাথা আছে।"

সাইগারসন বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "স্ট্রেঞ্জ! তোমায় এ জিনিস একেবারে দিয়ে দিল!"

"একেবারে দেয়নি। বলেছে এক বছরের জন্য রাখতে। এক বছর পরে ও নিজেই চেয়ে নেবে।"

"কেন, এক বছর পরে কী?" প্রিয়নাথ জানতে চাইলেন।

উত্তর দিলেন সাইগারসন, "রানির সিংহাসনে বসার ডায়মন্ড জুবিলি। গোল্ডেন জুবিলিতে রানি এ দেশে আসেননি। ক্ষমতা নেবার পর একদিনও না।

এই নিয়ে খোদ ইংল্যান্ডেই কথা উঠছে। সামনের বছর ২০ জুন রানির এ দেশে আসার কথা।”

“আর ৩রা জুলাই ম্যাসনিক হলের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। প্রথমে ডিনার, তারপর অনুষ্ঠান।”

এবার সাইগারসনের চমকে যাবার পালা, তুমি এ কথা জানলে কেমন করে?”

“লাটভবনে লখনের নিয়মিত যাতায়াত। ওখানে ওর লোক আছে। সব খবর থাকে ওর কাছে। এই বছর ভাই ৩রা জুলাই আমাকে ম্যাজিক দেখাতে হবে। যে সে ম্যাজিক না। ভূত নামানোর ম্যাজিক। সত্যিকারের ভূত। এবার ভালো হলে সামনের বার এটাই আবার দেখাব। রানির সামনে।”

“সত্যিকারের ভূত? সেটা কীভাবে সম্ভব?”

গণপতি বুঝিয়ে দিতেই উত্তেজনায় হাতে হাত ঘষতে লাগলেন সাহেব।

“বেশ। এবার তোমাদের যা বলব ঠিক তাই করবে। একটুও ভুলচুক হলে মহা বিপদ। এতে সাপ মরবে, লাঠিও ভাঙবে না।” বলে সাইগারসন একে একে বলে যেতে লাগলেন আগামী সাত দিন, কে, কবে, ঠিক কী করবে। বারবার করে বললেন। সব চলবে একেবারে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে।

“এবার আমার একটাই প্রশ্ন সাইগারসন সাহেবকে”, সাইগারসন থামতে না থামতে তারিণী বলে উঠল, “এক বেশ্যার মেয়ের জন্য এই সাহেবের এত চিন্তা কীসের? কেন তাকে খুঁজতে গিয়ে শৈলকে প্রাণ দিতে হল? কেন আপনি আচমকা লন্ডন থেকে আবার এই দেশে এলেন? ধাঁধার এই অংশটা না মিললে বাকিটা কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না।”

“প্রথম যেদিন আমি তোমাদের চুঁচুড়ায় ডেকেছিলাম, সেদিন অনেকটা বলেছি। পুরোটা বলিনি। বলেছিলাম আমি এসেছি এখানকার জাবুলনদের কার্যকলাপ দেখার জন্য। এ কথা সত্য, যেটা বলিনি, সেটা হল হিলি দ্বিতীয়বার

এই দেশে পালিয়ে আসার সময় সেই ভূতের বাক্সর সঙ্গে আরও মহামূল্যবান এক সম্পদ এ দেশে নিয়ে চলে আসে। আমি এসেছিলাম দ্বিতীয়টার সন্ধানে।

"সেটা কী?" প্রিয়নাথের উত্তেজনা বাঁধ মানে না।

"কী না, কে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। অ্যালিস।"

তিনজনেই এত অবাক হয়ে যায় যে কারও মুখে কথা জোগায় না।

"আমাদের রানি ভিক্টোরিয়া মহানুভব, কিন্তু সময়ে সময়ে নিষ্ঠুর। নিজের ইচ্ছের বাইরে যে-কোনো কিছু হলেই কড়া হাতে তাকে দমন করতে দুবার ভাবেন না তিনি। সেই দমনপন্থা যতই কঠিন হোক না কেন। আর সেইজন্যেই তাঁর বিরোধীরা বেছে নিয়েছে কলকাতাকে। দ্বিতীয় লন্ডন। যেখানে রানির শাসন খাতায় কলমে চললেও আসলে চলে বড়োলাটের কথা। বড়োলাট পক্ষে থাকলে অনেক কাজ রানি জানতেও পারেন না। শুধু জানতে পারে আমাদের গুপ্তচর বিভাগ। প্রথমবার আমি এসেছিলাম হিলি আর সেই ভূতের খোঁজে। আর এইবার অ্যালিসের জন্য।"

"অ্যালিস কে?" তারিণী শুধায়।

"রানির নাতি, প্রিন্স এডি বড়ো অদ্ভুত ছেলে। ছোটো থেকেই। তাঁর আচরণে তাঁর বাবা প্রিন্স এডওয়ার্ড থেকে ঠাকুমা ভিক্টোরিয়া, সবাই বিরক্ত। তিনি নিজের মর্জির মালিক। সমাজের নিচুতলার মানুষরা তাঁর বন্ধু। এদেরই একজন চিত্রকর ওয়াল্টার সিকার্ট। ১৮৮৪ সালের গ্রীষ্মে এই সিকার্ট এডির সঙ্গে তাঁর মডেল অ্যানি এলিজাবেথ ক্রুকের পরিচয় করান। মেয়েটি এমনিতে খারাপ না, কিন্তু বস্তিবাসী এবং অশিক্ষিত। পরিচয় প্রেমে গড়ায়। সিকার্ট বাদে এই প্রেমের কথা কেউ জানত না। অ্যানিকেও শুরুতে এডির পরিচয় জানানো হয়নি। মুশকিল হল, সিকার্টকেও না জানিয়ে এক বছরের মাথায় তাঁরা গোপনে বিয়ে করেন। এবং বিয়ের ফল হিসেবে তাঁদের এক মেয়ে জন্মায়। সমস্যার শুরু তখনই। খবর রানির কাছে পৌঁছে যায়, তিনি কিছুতেই নিজের উত্তরাধিকারী হিসেবে

এই মেয়েকে মেনে নেবেন না। এই মেয়ের খোঁজ চলে। অ্যানিকে পাগল সাজিয়ে বেডলামে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তবু আসল লোক, মানে অ্যালিসের খোঁজ পাওয়া যায় না।

অ্যানি জানত এমন বিপদ আসবে। তাই নিজের একেবারে কাছের পাঁচ বন্ধুকে অ্যালিসের খবর জানিয়ে যায়। সে খবরও রানির কাছে পৌঁছায়। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক উইলিয়াম গলের নেতৃত্বে হোয়াইট চ্যাপেলের এই পাঁচ মহিলাকেই অত্যাচার করে খুন করা হয়। কিন্তু দেখুন বন্ধুত্বের কত বড়ো শক্তি, শত অত্যাচারেও এরা মুখ খোলেনি। রানি জানতেন এই অপরাধ চাপা থাকবে না। ফলে এক কাল্পনিক চরিত্রের সৃষ্টি করা হল। নাম দেওয়া হল 'জ্যাক দ্য রিপার'। এই মহিলাদের কেউ দেহোপজীবিনী ছিলেন না। তাঁদের চরিত্রস্খলন করা হল। অ্যালিস তখনও অধরা।

"তবে আপনি কীভাবে অ্যালিসের খোঁজ পেলেন?"

"সম্পূর্ণ কাকতালীয়ভাবে। ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ রানির আদেশে চলে না। তাদের কাছে খবর ছিল, বেডলামে গোপনে কিছু কাজকর্ম চলছে। সেখান থেকেই আমরা এলি হেনকি জুনিয়ার আর রিচার্ড হ্যালিডের সন্ধান পাই। এরা ব্রিটিশ ম্যাসনিক লজের সদস্য এবং রানির সমর্থক। রানির প্রজাদের বশে রাখার জন্য নানারকম কাজকর্ম করত এরা। কিন্তু যতদূর জানি, রানির পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, খবর বাইরে বেরোলে রানি নিজে এই সংযোগ অস্বীকার করবেন। গোটা ব্যবস্থাটা দেখাশোনা করতেন ডাক্তার গল। সেই ল্যাবরেটরিতেই কাজ করত এই হিলি। কিন্তু হিলি একেবারে বস্তি থেকে উঠে আসা, এবং এর সঙ্গে অ্যানি আর তার বান্ধবীদের যোগাযোগ ছিল। হিলিকে প্রথম থেকেই আমরা নজরে রেখেছিলাম। হিলি দ্বিতীয়বার এ দেশে পালিয়ে আসার সময় অ্যালিসকে গোপনে ভাগিয়ে আনে। আমরা যেহেতু হিলিকেই অনুসরণ করছিলাম, তাই রানির আগে আমাদের কাছে খবর আসে।"

"কিন্তু আপনারা রানিকেজানাননি?"

“না। আমার দাদা মাইক্রফটের কড়া নির্দেশ ছিল। ওয়েট অ্যান ওয়াচ। কারণ রানি যা করেন সবকিছুই যে সঠিক, তা তো নয়। হিলিকে গুম করে গুপ্তচর বিভাগ অন্য লোককে আদালতে হাজির করে, যাতে রানির লোক তার নাগাল না পায়। এদিকে ব্রাদারহুডে রানির পক্ষের লোকেরাও চুপ করে বসে নেই। তারাও অ্যালিসের খোঁজে এই দেশে একজনকে পাঠিয়েছে। এই লোকের আসল নাম কী, কেউ জানে না। কেউ বলে ম্যানুয়েল ডিব্যাসি, আবার কেউ বলে হিউড রাডি। এই লোকের উদ্দেশ্য ভালো নয়। তাই আবার আমাকে এই দেশে আসতে হয়। যদি অ্যালিস সত্যিই রানির উত্তরাধিকারী হয়, তবে তাকে বাঁচানো আমাদের কর্তব্য।”

“সাহেব, একটা কথা বলি?” তারিণী মৃদুস্বরে বলল। “আপনি আগে যা বলেছিলেন, আর আজ যা বলছেন, সব শুনে কেমন যেন বোকা বোকা লাগছে। আপনি কি মহারানির পক্ষে না বিপক্ষে?”

“আমি ইংল্যান্ডের পক্ষে”, হেসে বললেন সাইগারসন।

৪।

২৭ জুন, ১৮৯৬, শনিবার

তারিণীর আপিসে বসে রীতিমতো কাঁপছিল গণপতি। এমন বিপদে সে আগে কোনও দিন পড়েনি।

“আমার তো জলে কুমির ডাঙায় বাঘ দশা হে। সেই মেয়ে, যাকে কোনও দিন চোখেই দেখিনি, তাকে না চিনিয়ে দিলে সাহেব আমার সব্বনাশ করবেন, আবার দেখাতে গেলে, আর লখন টের পেলে কী হবে বুঝতে পারছ?”

“এত ভেবো না”, তারিণী তাকে ভরসা দেয়। “সাইগারসন সাহেব যা বললেন, তা নেহাত মন্দ বলেননি। সেইমতো চললে উনি বলেছেন কিছু হলে দায়িত্ব। আর চেনার কথা বলছ, এই দ্যাকো”, বলে একটা ছাপা কাগজ বার করে আনে তারিণী। “যদি খুব ভুল না হয়, তবে সেই মেয়ে কতকটা এই

বাচ্চাটার মতো দেখতে। আর সেদিন সাহেব মেমসাহেবের বাচ্চারা অনেকে থাকবে। তাদের দলে এই মেয়ে মিশে থাকতে পারে। তুমি একটু খেয়াল রাখবে লখন কোনও বিশেষ বাচ্চার দিকে নজর রাখছে কি না।"

"ছবির একজন তো রানিমা, পাশে এই বুড়িটা কে?"

"সেসব তোমায় পরে বোঝানো যাবে। এ ছবি এখন তোমার কাছেই রাখো। তবে খবরদার! কারও হাতে না পড়ে। আর এই মেয়েকে কীভাবে চেনাবে তা নিয়ে কিছু ভাবলে?"

"বোধহয় ভেবেছি। কিন্তু তুমি বাইরে তাকিয়ে দেখেছ?"

"অনেক আগেই। রাস্তার উলটো দিকে দাঁড়িয়ে লোক দুটোর খবরের কাগজ পড়া আর শেষ হচ্ছে না। নজর রাখছে। ভালো, ভালো। এবার ওদেরকেই কাজে লাগাতে হবে।"

"কেমন করে?"

"বলছি শোনো...."

২৮ জুন, ১৮৯৬, রবিবার

ম্যাসনিক লজে আজ অনুষ্ঠানের আগের শেষ রবিবার। প্রায় সবাই এসেছে। লজের গ্র্যান্ডমাস্টার সকালের মাসের প্রার্থনার পরে সবাইকে নিজের নিজের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এক কোণে বসে গণপতি লখনকে খুঁজছিল। প্রথমে দেখতে পায়নি। তারপর পেল। সভার একেবারে পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একা। ভিড় ঠেলে লখনের পাশে দাঁড়িয়ে সোজা গ্র্যান্ডমাস্টারের দিকে তাকিয়ে লখনকে বলল, "সামনে বিপদ। সাবধান।" লখন চমকে দেখল গণপতি একমনে মাস্টারের কথা শুনছে। ঠোঁট নড়ছে না। ভেন্ট্রিলোকুইজম। লখন এটা জানে। সেও একইভাবে উত্তর দিল, "কী হয়েছে

গণপতি ঠিক সেটাই বলল, যেটা সেদিন রাতে সাইগারসন তাকে বলতে বলেছিল। একটা শব্দ বেশি না, একটা শব্দ কম না।

কাজ হল। লখনের ঠোঁটের কোণে মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল।

"তবে তাই হোক। সাহেব আসবে, কিন্তু ফিরবে না।"

"খুন!"

"এত সোজা না ব্যাপারটা", লখনের চোখ সামনের দিকে, ঠোঁট চেপে বন্ধ। গ্র্যান্ডমাস্টারের কী একটা কথায় সবাই হাততালি দিতে সেও তালি দিয়ে উঠল।

"এই সাহেব লজের সদস্য। তাও লন্ডনের। শুধু সন্দেহের বশে একে কিছু করলে এখানের লজও আমায় ছেড়ে কথা বলবে না। তাই আগেভাগে কিছু করা যাবে না। সাহেবকে দিয়ে প্রথম আঘাত হানাতে হবে। আমরা তারপর আত্মরক্ষা করব। আমার শুধু একটা জিনিস লাগবে", বলে গণপতির দিকে তাকিয়ে গণপতির হাতে কাপড়ে প্যাঁচানো কাঠের বাক্সটা দেখে একটা অবাক হাসি ফুটে উঠল লখনের মুখে।

গ্র্যান্ডমাস্টার তাঁর বক্তৃতা শেষ করার আগেই সবার অজান্তে 'অগ্নিনিরয়' আবার ফিরে গেল লখনের কাছে।

২৯ জুন, ১৮৯৬, সোমবার

মেডিক্যাল কলেজের সামনে অ্যাম্বুলেন্সটা থামতেই চারজন সাদা পোশাক পরা কর্মী এসে ভিতর থেকে এক সাহেবকে টেনে বার করল। গতকাল রাত থেকে সাহেবের পেটে অসহ্য যন্ত্রণা আর ভেদবমি। যন্ত্রণায় পেট চেপে ধরে দেহ কুঁকড়ে যাচ্ছে, মুখের একদিক বেঁকে লাল ঝরছে, গোটা দেহ সদ্য কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করছে। ছটফটানির চোটে সাহেবকে আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। কোনওক্রমে দোতলায় এক কেবিনে সাহেবকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। সাহেব চিকিৎসক ডাক্তার টেলর রোগীকে দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন। রোগীর চোখ কোটরাগত, ঠোঁটের দুই কোণে কালচে ফেনা জমে গেছে, চোখ ঘোলাটে, বিকারের চোটে হাতের রোগা রোগা আঙুলগুলো থরথর করে কাঁপছে। থেকে থেকে গলা দিয়ে কোঁ কোঁ আওয়াজের কাতরানি ঠিকরে আসছে। ডাক্তার

একটু এগিয়ে যেতেই রোগী চিলচিৎকার করে উঠল। ডাক্তার টেলর রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন।

"বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও, বেজন্মার বাচ্চারা। আমাকে খুন করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছ?"

ডাক্তার বুঝলেন এ রোগীর মাথা কাজ করছে না। তবুও তিনি বললেন, "আপনি ভুল বুঝছেন, আসলে... "

"দূরে থাকো। আমার থেকে যতটা পারো দূরে থাকো। তোমার এই নোংরা হাত আমার গায়ে লাগাবে না বলছি। জানো আমি কে? তুমি সেদিনের জুনিয়ার ডাক্তার, আমায় দেখতে এসেছ কোন সাহসে? মেডিক্যাল সায়েন্সের তুমি কী জানো?"

ডাক্তার টেলর এবার বেশ অপমানিত বোধ করলেন। তাও মাথা ঠান্ডা রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি তবে এখানে চিকিৎসা করাবেন না?"

"করাব না বলেছি?" আবার কাতরে উঠে বললেন সাহেব। "তবে তোমার কাছে না। তোমাদের ওই ইন্ডিয়ান ডাক্তার গোপাল দত্তকে ডাকো। এই প্রাচ্যদেশের রোগ সম্পর্কে তুমি কী জানো হে?"

"কিন্তু উনি তো অনেক সিনিয়ার..."

"তবে ঠিক আছে হে ছোকরা। তুমি আমার হাত জানো না। আমায় একটু ধাতস্থ হতে দাও। তোমার মেডিক্যাল লাইসেন্স যাতে চিরকালের মতো বাজেয়াপ্ত হয় সে ব্যবস্থা করছি।"

কেনেথ টেলর একেবারেই সদ্য যুবক। এবার সে ভয় পেল। কিন্তু ডাক্তার দত্ত কি আসবেন এই সামান্য কাজে? উনি তো রোগী দেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। বেশিরভাগসময়ই গবেষণা করেন।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে গোপাল দত্তকে এসে সবটা জানাল টেলর। ইদানীং খুব বেশি রোগী দেখেন না ঠিকই, কিন্তু এই ঘটনা শুনে আগ্রহী হয়ে নিজেই কেবিনের দিকে গেলেন। কেবিনের বাইরে থেকেই কাতরানোর শব্দ

শোনা যাচ্ছে। ঢুকে দেখলেন দুজন কেবিনবয় কী করবে বুঝতে না পেরে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। রোগী খাটে বালিশে মুখ গুঁজে গোঙাচ্ছে। গোপালচন্দ্র ঘরে ঢোকা মাত্র রোগী চিৎকার করে বলল, "ডাক্তার, ডাক্তার, প্লিজ আপনি সবাইকে ঘর থেকে চলে যেতে বলুন। শুধু আপনি থাকুন। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।"

গোপাল ইশারায় দুজনকে বাইরে যেতে বললেন। তারা বাইরে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিতেই রোগী তড়াক করে বিছানায় উঠে বসল। সারা দেহে রোগের কোনও চিহ্ন নেই। রোগীকে দেখে চমকে উঠলেন গোপাল দত্ত। "আপনি? কিন্তু এভাবে?"

"পিছনে লোক লেগেছে। তাই এ ছাড়া উপায় ছিল না। সামনে ঘোর বিপদ।"

"কী হয়েছে?"

"সব বলব। কিন্তু আগে আপনাকে কয়েকটা কথা বলতে হবে। বহু মানুষের প্রাণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এতে।"

"বলুন।"

পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে প্রশ্ন করলেন সাহেব, "মাঝে বেশ কিছুদিন আপনি প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে ক্যানিংহ্যাম ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছিলেন। সত্যি করে বলুন দেখি, আপনাকে ঠিক কী করতে হয়েছিল?"

গোপালচন্দ্র এতটাই অবাক হয়ে গেলেন যে, হাসপাতালের কেবিনে সিগারেট ধরানো উচিত না, সেটাও সাইগারসনকে বলতে তাঁর মনে ছিল না।

৩০ জুন, ১৮৯৬, মঙ্গলবার

বর্ষাকাল। কিন্তু এই বৎসর বৃষ্টি বিশেষ হইতেছে না। এইরকম চলিলে আগামী বৎসর খরা অনিবার্য। অন্যদিকে শুনিতেছি বোম্বাই প্রদেশে প্লেগের উপদ্রব

বাড়িতেছে। মহারাণীর ডায়মন্ড জুবিলীর পূর্বে এই সমস্ত লক্ষণ বিশেষ শুভ নয়। পত্রিকায় এই জুবিলী লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছে, "মহারাণীর জুবিলী উৎসব ভারতীয় জনগণের প্রদেয় খাজনায় বিলাস ব্যতীত আর কিছু নহে। উহাদের নিকট জুবিলী হইলেও আপামর ভারতবাসীর নিকট এই অনুষ্ঠান জুজুবিলির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। আমরা সকলে সেই জুজুর ভয়ে ভীত হইয়া আছি।" কিন্তু কাল রাত হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে। অরুণদেব আপন কিরণজাল বিকীর্ণ না করিতে পারিয়া নিতান্ত বিষন্ন হইয়া রহিয়াছেন। পর্জ্জন্যদেব টিপি টিপি বৃষ্টির সহিত উপস্থিত হইয়া রহিয়া রহিয়া মহা গর্জন করিতেছেন। সেই ভীষণ গর্জনে আজ লালবাজারে মনুষ্য আনাগোনা নিতান্ত কম। দেখিলাম এই সুযোগ। ধীরে ধীরে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া টমসন সাহেবের কামরার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এক অদ্ভুত ত্রাসে আমার বুক কাঁপিতেছে। আর্দালী জানাইল কামরায় সাহেব ব্যতীত কেহ নাই। কামরায় প্রবেশের অনুমতি মিলিল। সাহেব একলা বসিয়া ধূম্রপান করিতে করিতে একখানি ফাইল উলটাইতেছিলেন। মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট। মাথা না উঠাইয়াই আমায় বলিলেন, "বল কেন আসিয়াছ?"

"সাহেব, আমাকে কিছুদিন পূর্বে যে দায়িত্ব দিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। চটকলে সেই শ্রমিকের মামলার সমাধান হইয়াছে।"

সাহেব ফাইল হইতে মুখ তুলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিলেন।

"বল কী! আসন গ্রহণ কর। আমি সম্পূর্ণটা শুনিতে ইচ্ছুক।"

আমি আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে সাইগারসন সাহেব যেমন শিখাইয়াছিলেন, তেমনটাই বলিলাম।

১ জুলাই, ১৮৯৬, বুধবার

সোনাগাজিতে জুঁইয়ের ঘরে ঢোকার আগেই ঘরের ভিতর গণপতি সেই সাহেবকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যেতে চাইছিল। পারল না। আচমকা যমদূতের মতো দুটো মুশকো জোয়ান এসে গণপতিকে প্রায় চ্যাংদোলা করে

ঘরে ঢোকাল। জুঁই খাটের এককোণে বসে থরথর করে কাঁপছে। গণপতিকে এই অবস্থায় দেখবে, সে কোনও দিন ভাবেনি। বাধা দিতে গিয়ে গণপতির ধুতি বিস্রস্ত। ফতুয়ার একদিক ছিঁড়ে গেছে। যণ্ডা দুইজন গণপতিকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে। তখনও গণপতি কাঁপছে।

"কী ব্যাপার? জুঁইকে সাবধান করতে এসেছিলে?"

গণপতি কোনও উত্তর দিল না।

"আর আমি যে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সেটার কী হবে?"

মাটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে গণপতি বলল, "আমি রাজি।"

"কবে?"

"পরশু। অনুষ্ঠানের দিন।"

"কীভাবে?"

গণপত্তি বলে চলল। সাইগারসন সেদিন বারবার বলে দিয়েছেন। এই জায়গায় কোনওরকম ভুলচুক হওয়া যাবে না। একটা শব্দ বাড়তি বলা যাবে না। প্রায় তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি আউড়ে গেল গণপতি।

"ঠিক আছে। এবার তুমি যাও", বলতে সে বেরোতে যাচ্ছে, এমন সময় "জুই আছিস নাকি?" বলে ঘরে ঢুকতে গিয়েই থেমে গেল একটা মেয়ে। পরমা সুন্দরী। গণপতি একে দেখেছে। সেই মসজিদবাড়ি স্ট্রিটের ঘরে, লখনের সঙ্গে। ঘরে লোকজন দেখে "আমি পরে আসছি" বলে চলে গেল মেয়েটা। গণপতি দেখল সাহেব তাকে ছেড়ে ঠায় মেয়েটার দিকে দেখছেন। মেয়েটার চলে যাওয়া দেখছেন।

সেইদিন মাঝরাতে ম্যাসনিক লজে প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া, দশ ফুট উঁচু একটা কাচ নামানো হল। প্রায় জনা দশেক লোক লাগল সেটাকে হলে ঢোকাতে।

হীরালাল তার কোডাকের মুভি ক্যামেরাটা খুলে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখল। মাঝে আর একটা দিন। তারপর এটা কাজে লাগবে। গণপতি বলেছে।

২ জুলাই, ১৮৯৬, বৃহস্পতিবার



মোকাম কলিকাতায় এই বৎসর মহাধুমধামের সহিত সকল গীর্জায় যীশু ভক্তি উৎসব পালিত হইবেক। প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত লার্ড বিশপ ও অন্য২ পাদরি সাহেবেরা একত্র হইয়া গত বৎসর এই সিদ্ধান্ত লইয়া এক প্রস্তর তাহাতে পিত্তলের পত্র তাহাতে সন তারিখ সুড়কী দ্বারা গ্রথিত করিয়াছেন। পাঠকদের জানাই এই দিবস ভারতীয় ক্রিস্তানগণের নিকট এক অতি পবিত্র ক্ষণ। তাঁহাদের অন্যতম অবতার প্রেরিত থোমা, যিনি দিদিমুস নামেও পরিচিত, ছিলেন নূতন নিয়ম অনুযায়ী যীশুর একজন প্রেরিত। থোমাকে সাধারণভাবে অভিশঙ্কী থোমা হিসেবে অভিহিত করা হয় কেননা তিনি যীশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে সন্দেহ পোষা করিয়াছিলেন; পরবর্তীতে যীশুর ক্রুশারোপণজনিত জখম দেখিয়া তিনি আমার প্রভু ও আমার ঈশ্বর কহিয়া তাঁহার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি জানান। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি ক্রিস্টধর্ম প্রচারে রোমান সাম্রাজ্যের বাহিরে আসিয়া এই ধর্ম প্রচারে আগ্রহী হন। ৫২ খৃস্টাব্দে তিনি কেরল প্রদেশে আগমন করেন এবং বিশ বৎসর ধর্মপ্রচারের পর অধুনা মাদ্রাজের নিকটবর্তী মাইলাপুর নামক স্থানে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তাঁহার হত্যার দিন স্মরণ করিতেই ভারতীয় ক্রিস্টানরা এই দিবস পালন করিয়া থাকেন। পূর্বে কলিকাতায় এই উৎসব বড় সামান্য উৎযাপিত হইত। ইদানীং শ্রীযুত লার্ড বিশপ সাহেব এবং কলিকাতার ফ্রিম্যাসনরা একত্রে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই প্রসঙ্গে জানাই, আগামীকল্য

প্রভাতফেরী, উপাসনা ইত্যাদি সমাপ্ত হইলে কলিকাতার ফ্রিম্যাসন হলে এক মহতী অনুষ্ঠানে গীত বাদ্য সহ জাদুবিদ্যা প্রদর্শিত হইবে। আগামী বৎসরের জুজুবিলির ভালই তৈয়ারি চলিতেছে একরকম বলা চলে।

৫।

৩ জুলাই, ১৮১৬, শুক্রবার

আজ সকাল থেকেই কলকাতার গ্র্যান্ড ম্যাসনিক লজে সাজ সাজ রব। গোটা হল সাজানো হয়েছে সাদা আর নীল ফুল দিয়ে। ফরগেট-মি-নট ফুল হল ম্যাসনদের প্রতীকী ফুল। সেই ফুলের গুচ্ছে গোটা হল যেন আলো হয়ে আছে। সকালে সূর্যের আলো ফুটতে না ফুটতে ম্যাসন হল থেকে বিরাট শোভাযাত্রা বার হল সেন্ট জন'স চার্চের উদ্দেশে। সঙ্গে তাঁদের আর্টিলারি ব্যান্ড, ম্যাসনিক চিহ্নখচিত লম্বা লম্বা পতাকা, ব্যানার আর ম্যাসনিক টাই পরে ব্রাদাররা প্রায় সবাই সেই শোভাযাত্রায় অংশ নিলেন। সবার সামনে গ্র্যান্ডমাস্টার হ্যালিফ্যাক্স নিজে। তাঁর হাতে ম্যাসনিক রুলার আর কম্পাস। শোভাযাত্রা গির্জায় পৌঁছাতেই লর্ড বিশপ নিজে গ্রান্ডমাস্টারকে অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এলেন। তারপর একত্রে মাস অনুষ্ঠিত হল। লর্ড বিশপ তাঁর ধর্মানুশাসনে জানালেন, "আগে চার্চ ও ব্রাদারহুডের আদর্শের বিরোধ ছিল। কিন্তু ইদানীং তা মিটেছে। এভাবেই চার্চ এবং ব্রাদারহুড একত্রে মিলেমিশে এই দেশের সাধারণ জনগণের উন্নতিসাধনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। চার্চ চায় আরও বেশি মানুষ প্রভু যীশুর করুণাছায়াতলে আশ্রয় পাক, আর তাই শুধু চার্চ না, ব্রাদারহুডেরও বর্ধিত দায়িত্ব এই ধর্মাচরণে চার্চকে সাহায্য করা।" উত্তরে গ্র্যান্ডমাস্টার হ্যালিফ্যাক্স বললেন, শুরু থেকেই তাঁরা চার্চের পক্ষে, চার্চের সঙ্গে কাজ করছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা ধর্মীয় সংগঠন না, তাই সরাসরি কোনও ব্রাদারকে ধর্ম পরিবর্তনের কথা ব্রাদারহুড বলতে পারে না। তবে আলোচনার শেষে তিনি এও জানালেন, তাঁর বয়েস হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন। নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার

হবেন দলের অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্য ডাক্তার জোসেফ গ্রান্ট। সামনের বছর রানি এই দেশে আসবেন জুবিলি উপলক্ষ্যে। সেই মহতী অনুষ্ঠান পরিচালনায় যে তরুণ পরিচালকের প্রয়োজন, একমাত্র ডাক্তার গ্রান্টই পারবেন সেই দায়িত্ব নিতে।

এই ঘোষণায় মৃদু গুঞ্জন শুরু হল দর্শকদের মধ্যে। হ্যালিফ্যাক্স দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এমন খবর কারও কাছে ছিল না। মৃদুভাষী, সদাহাস্যময় এই মানুষটি অনেকের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সবাই ভেবেছিল, আগের গ্র্যান্ডমাস্টারদের মতো ইনিও এই দেশেই থেকে যাবেন চিরকালের মতো। ডাক্তার গ্রান্ট নবীন, চটপটে, অভিজাত পরিবারের সন্তান। এককালে লন্ডন লজের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। শোনা যায় রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর নাকি বিশেষ যোগাযোগ আছে। সেটা ঠিক কীরকম তা অবশ্য কেউ জানে না। গ্রান্ট নিজেও খোলসা করে বলেন। না। পাঁচ বছর হল এ দেশে এসেছেন গ্রান্ট, কিন্তু ব্রাদারহুডের সবাই তাঁকে পছন্দ করে। প্রতিটি ব্রাদারের নাম জানেন, তাদের পারিবারিক সমস্যায় সবার আগে পাশে দাঁড়ান, তাই গ্রান্টের নির্বাচনে অগুলি হল না কেউ। সবাই "আমেন, আমেন" বলে লজের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল। গোটা দল দ্বিপ্রহরের কিছু আগে লজে ফিরে এল। আজ লজে ভোজের ব্যবস্থা আছে। লখন সকালে শোভাযাত্রায় যায়নি। লজের কাজকর্মের দেখাশোনার ভার তার উপরে। আজকের বিরাট ভোজসভায় খাবারের মধ্যে প্রধান জিনিস 'বোরস্ হেড' বা শুয়োরের মাথা। রোজমেরি, তেজপাতা, আপেল আর অন্যান্য নানা উপকরণ দিয়ে সাজিয়েগুছিয়ে টেবিলে পরিবেশন করা। নানারকম খাদ্য, পানীয় ধরে ধরে রাখা একদিকে। আছে টার্কি, ডাক রোস্ট, গ্রাম, পুডিং, যত রাজ্যের জিনিস দিয়ে তৈরি বিরাট বড়ো পাই, ট্যাকারিন, খেজুর, বাদাম, কিশমিশ, চকোলেট, আরও কত কী!!

ভোজ শেষ হতেই কেউ কেউ লজের রেস্টরুমে চলে গেলেন একটু জিরিয়ে নিতে, আর যাঁদের কাছেই বাড়ি তাঁরা সেই পথে পা বাড়ালেন। সন্ধেবেলা গান,

জাদু ইত্যাদি হবে। আগেভাগে এসে আসন দখল না করলে ভালো জায়গা পাওয়া যাবে না। ম্যাসনিক হলটা খুব বেশি বড়ো না। ফলে লোকের ভিড় বাড়লে বসার সমস্যা হতেই পারে।

ভোজ শেষ হতে না হতে লখনের ডাক পড়ল। লজের এক ঘরে মাস্টার ম্যাসন এসে অপেক্ষা করছেন। তাঁর আসল পরিচয় লখন বাদে খুব কম ব্রাদারই জানেন। ঘরে ঢুকতে মাস্টার ম্যাসন প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন আজকের ব্যবস্থা কেমন চলছে। লখন পুঙ্খানুপুঙ্খ জানাল তাঁকে। দেখে মনে হল তিনি খুশি হয়েছেন।

"এবারের অনুষ্ঠান সেমিফাইনাল। ঠিকভাবে করতে হবে। যাতে আসল দিনে ভুলচুক না হয়।"

"হবে না মাস্টার।"

"হলের গ্র্যান্ডমাস্টার বদলে যাবেন কাল থেকে। খবর পেয়েছ?"

"হ্যাঁ, মাস্টার।"

"তাতে অবশ্য তোমার বিশেষ কিছু আসে যাবে না। তুমি এখন যেমন কাজ করছ, সেভাবেই করে যাবে।"

"হ্যাঁ মাস্টার।"

"আর সেই জাদুকর? সে কেমন কাজ করছে?"

"তার উপরে আমার ভরসা আছে মাস্টার।"

"ঠিক আছে, যাও।" বলার পরেও লখন যখন নড়ল না, মাস্টার ম্যাসন একটু বিরক্ত হলেন যেন।

"কিছু বলবে? যা বলার তাড়াতাড়ি বলো। আমাকে অন্য কাজে যেতে হবে।"

"একটা সমস্যা হয়েছে মাস্টার", বলে লখন গণপতির থেকে যা যা শুনেছিল সব খুলে বলল। মাস্টার ম্যাসনের মুখে একটা কালো ছায়া পড়ল যেন।

"তোমাকে ধাওয়া করে এসেছে কেন?"

"জানি না। খুব সম্ভব শৈলকে এই লোকই মেরেছে। শৈল হয়তো মারা যাবারআগে আমার নাম বলেছে।"

"এই যে গণপতির কথা বলছ, এ বিশ্বাসযোগ্য?"

"আগেই বললাম মাস্টার। আমি ওকে চিনি। ও মিথ্যে বলবে না।"

"তুমি কী ভেবেছ এই নিয়ে?"

লখন নিজের পরিকল্পনা খুলে বলল। মাস্টার শুনছিলেন আর মাথা নাড়ছিলেন, "না, না... এ তো নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। তোমার কিছু হলে মহা মুশকিল। আমাদের সব পরিকল্পনা আবার অন্যরকম ভাবে ভাবতে হবে।"

"অতর্কিত আক্রমণ হলে বিপদের সম্ভাবনা থাকত মাস্টার, কিন্তু আমি যখন নিশ্চিত আক্রমণ আসবেই, আমিও তৈরি থাকব। আত্মরক্ষার উপায় আমার জানা আছে।"

"আসলে আমি আজকের অনুষ্ঠানে কোনও ঝামেলা চাইছিলাম না।"

"কিন্তু মাস্টার, এই লোক প্রেতের মতো। একে এমনিতে ধরা প্রায় অসম্ভব। কখন কোথায় থাকে, কেউ জানে না। অতি কষ্টে ফাঁদ পেতে একে ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি অমত করবেন না।"

"ঠিক আছে। যা ভালো বোঝো করো। কিন্তু আমার নাম যেন কোনওভাবে কোথাও না উঠে আসে। যদি আসে...."

"আমাকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হবে। জানি মাস্টার।"

"তুমি যাও এখন।"

লখন মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল।

দুইদিন ধরে প্রাণান্ত পরিশ্রমের পরে কাচটা গণপতির ঠিক মনমতো লাগানো গেছে। একটা অস্থায়ী মঞ্চ বানাতে হয়েছে। চড়া বৈদ্যুতিক আলোর

ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সব মাপে মাপে। একটুও এদিক ওদিক হলে গোটা ম্যাজিক মাঠে মারা যাবে। এত কঠিন, এত গুটিল জানু আজ অবধি মঞ্চে দেখায়নি গণপতি। তাই বারবার নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছিল। বেলা গড়িয়ে গেছে। সকাল থেকে পেটে দানাপানি পড়েনি। বুকের ভিতরে টিপ টিপ আওয়াজ যেন বাইরে থেকেই শোনা যাচ্ছে। প্রতিটা শো-এর শেষে কী হবে সেটা গণপতি ঠিক করে। আজকের কার্টেন কল গণপতির হাতে নেই। কারও হাতে নেই। আজকের কার্টেন কল নির্ধারণ করবেন একমাত্র মহাকাল।

সন্ধ্যা আটটা থেকে অনুষ্ঠান শুরু। শুরুতে গান, তারপর কিছু বক্তব্যের পরেই আসল আকর্ষণ। গণপতির জাদু। মুখে মুখে রটে গেছে গণপতি নাকি আজকে মঞ্চে সত্যিকারের ভূত নামাবে। সে ভূত দেখা যাবে, হেঁটে চলে বেড়াবে। এমন আজব খবর আগে কেউ শোনেনি। তাই অনেকেই আজ উপস্থিত হচ্ছে। প্রিয়নাথ চলে এসেছেন অনেক আগেই। পরনে অবশ্য পুলিশি উর্দি নেই। সাইগারসন মানা করেছিলেন। এসেই দেখতে পেলেন হলের এক কোণে সাইগারসন চুপটি করে বসে আছেন। যেমনটা কথা ছিল। প্রিয়নাথ হলের মাঝামাঝি এক জায়গায় আসন দখল করে বসলেন। গোটা হল আলোতে আলোতে ভরা। স্থায়ীমঞ্চতে কীসব কারুকার্য করে অনেকটা উঠিয়ে কাঠের একটা অস্থায়ী মঞ্চ বানানো হয়েছে। নিশ্চিতভাবে ম্যাজিক দেখানোর জন্য। গোটা অনুষ্ঠানের ছবি তোলার জন্য হলের প্রবেশদ্বারের পাশেই বিরাট বেঢপ একটা ক্যামেরা নিয়ে, মাথায় কালো চাদর ঢাকা দিয়ে হীরালাল কী যেন করছে। সব একেবারে হিসেবমতো হচ্ছে, শুধু কোথাও তারিণীর দেখা নেই। প্রিয়নাথের মন এক অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠল।

হাতে একটা লোহাবাঁধানো বেতের লাঠি দোলাতে দোলাতে ম্যাসনিক হলের দিকে হেঁটে আসছিলেন বেঁটেখাটো এক সাহেব। মাথায় টপ হ্যাট। সেন্ট আন্ড্রুজ

চার্চ পেরিয়ে লালবাজারের আগে অবধি বেশ কয়েকটা অন্ধকার গলি। শুধু মোড়ের মাথায় এক-একটা করে বাতিস্তম্ভ। সন্ধের পর বেশ কিছু দেহোপজীবিনীরা এসে এখানে দাঁড়ায়। আপিসফেরতা বাবুরা, বিশেষ করে শুক্র-শনিবার দেশের বাড়ি ফেরার আগে একটু ফুর্তি করে যান। এদের কোনও বসার জায়গা নেই। দরদাম ঠিক হয়ে গেলে অন্ধকার গলির এক কোণে খদ্দেরকে টেনে নিয়ে সেখানেই যা হবার হয়। তাই এদের দর কম। আবার কম সময়ে দেহের জ্বালাও মেটে। পুলিশ সব জানে। হপ্তা নেয় বলে কিছু বলে না।

সাহেব এদের দিকে তাকাতে তাকাতেই যাচ্ছিলেন। সবই মামুলি। লালবাজার পার হবার ঠিক আগে মেয়েটাকে চোখে পড়ল সাহেবের। লাল চুল, গোলাপি চামড়া। দেখলে প্রথমে সাহেবের মেয়ে মনে হয়। কিন্তু মুখের যে লালিত্য, তা একমাত্র ভারতীয়দের মধ্যেই সম্ভব। হাফব্লাড। একেই না দুদিন আগে জুঁইয়ের ঘরের সামনে দেখেছিলেন সাহেব! না ঢুকে চলে গেল। তারপর সাহেব অনেক জায়গায় খুঁজেছেন একে। পাননি। জুঁই কিছু বলতে পারেনি। সেও নাকি অনেকদিন পরে ওকে দেখেছিল। আজ সেই মেয়ে ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে। এ যে মেঘ না চাইতেই জল! সাহেব ট্যাঁকঘড়ি বের করে দেখলেন, এখনও আধঘণ্টা সময় আছে। দ্রুত পায়ে তিনি মেয়েটার কাছে গেলেন। পাঁচ টাকায় রফা হল। এইসব মেয়েদের তুলনায় পাঁচ টাকা একটু বেশিই। তবু এই মেয়ের জন্য এটুকু খরচ করাই যায়। মেয়েটা তাঁকে টেনে নিয়ে গেল রাস্তার এক কোণের অন্ধকারে। সেখানে খড়, চাদর পেতে একটা অস্থায়ী বিছানার ব্যবস্থা হয়েছে। সাহেবের তর সইছিল না। হামলে পড়লেন মেয়েটার উপরে। কোনওমতে ওকে মাটিকে ফেলে তিনি পাগলের মতো তার টুকটুকে লাল ঠোঁটে মুখ ডুবিয়ে দিলেন।

শুরুতেই যখন ম্যাসনিক সংগীত “হেইল ইটারনাল” শুরু হল, গণপতি উইংসের একদিক থেকে উঁকি মেরে দেখল অনেকেই উপস্থিত। সাইগারসন

আর প্রিয়নাথ দুই জায়গায় বসে আছেন, একদিকে ক্যামেরা নিয়ে হীরালাল দাঁড়িয়ে, লখন এদিক ওদিক তদ্বির করছে। কিন্তু সেই সাহেবের দেখা নেই। তাহলে এত আয়োজন, সব কি বৃথা যাবে? একগাদা বাচ্চাদের নিয়ে একজন ব্রাদার এলেন। গণপতি দেখল অবিকল সেই ছবির শিশুটির মতো এক মেয়ে। আলাদা করে চিনিয়ে দিতে হয় না। একেবারে সামনের সারিতে বসিয়ে দেওয়া হল তাদের। লখন মাঝে মাঝেই কাজের ফাঁকে গণপতির দিকে তাকাচ্ছে। সাহেব এলেই লখনকে ইশারা করতে হবে। গণপতির নজর দরজার দিকে। অনুষ্ঠান শুরু হবে। হবে, এই সময় প্রায় হস্তদন্ত হয়ে সাহেব হলে ঢুকলেন। হাতে একটা বেতের ছড়ি। লখনও সাহেবকে দেখেছিল। গণপতির দিকে তাকাতেই সেও মাথা নাড়ল। ঠিক এখানেই লখন এমন একটা কাজ করল যা গণপতির হিসেবের বাইরে। সোজা সাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সাহেবের মুখ ভাবলেশহীন। লখন কী যেন বলল সাহেবকে। সাহেব মাথা নাড়লেন। গণপতি বুঝল লখন নিজের পরিচয় দিচ্ছে- এটা বাড়াবাড়ি রকম দুঃসাহস। লখন যদি টের পায় গণপতি মিছে কথা বলেছে, তাকে খুঁজতে না, সাহেব এসেছেন যাতে গণপতি অ্যালিসকে দেখিয়ে দেয় সেজন্য, তবে সে তো বেইমানির সামিল! সাহেব লখনের সঙ্গে করমর্দন করলেন। লখন সাহেবকে পথ দেখিয়ে একটা আসনে বসিয়ে দিল। এসব কী হচ্ছে? এসব হবার তো কথা ছিল না!

অনুষ্ঠানের শুরুর প্রথম দশ মিনিট গেল গান আর বক্তৃতায়। বিদায়ী গ্রান্ডমাস্টার হ্যালিফ্যাক্স সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আশা করলেন সামনের বছর মহারানির উপস্থিতিতে আরও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হবে। নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার সেই দায়িত্ব নেবেন। লখন নিজে একটা চেয়ারে বসে সব শুনছিল। সবকিছু একেবারে হিসেবমতো চলছে। সাহেব ঢোকা মাত্র সে নিজের পরিচয় দিয়ে দিয়েছে, যাতে কোনও ভুল না হয়। সাহেব যাকে খুঁজতে এসেছেন, সে-ই

নিজে এসে ধরা দিচ্ছে— সাহেব হয়তো অবাক হবেন, তবে খুশিও হবেন নিশ্চয়ই। গণপতিকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না কষ্ট করে। গণপতির যা করার সে করেছে। বাকিটা লখন সামলে নেবে। ফতুয়ার পকেটে রিভলভারটা হালকা হাতে একবার অনুভব করে নিল লখন। এদিকে মঞ্চে গণপতি এসে গেছে। প্রথমেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান, তারপর তাসের যেসব ম্যাজিক সে দেখায় তা দ্রুত দেখিয়ে সরাসরি চলে এল আসল কথায়।

"আজ এই মঞ্চে আমি প্রথমবার এমন কাজ করতে চলেছি, যা ভূভারতে কেউ করেনি। এর আগে আমি আপনাদের ভূতের গলার আওয়াজ শুনিয়েছি। ভূতের কার্যকলাপ দেখিয়েছি ভৌতিক বাক্সে। দেখিয়েছি ভূতের বাক্সে হাত পা বাঁধা অবস্থায় থেকেও কীভাবে আত্মাদের আহ্বান করে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র বাজানো যায়। কিন্তু অনেকেই মনে করেছেন ওসব জালিয়াতি। ম্যাজিশিয়ানের কায়দা। তাই এই প্রথমবার, এই ম্যাসন হলের মঞ্চে আমি এক সত্যিকারের ব্রাদারের আত্মাকে আহ্বান করব। ব্রাদার ডেভিড শৈলচরণ সান্যালকে আপনাদের অনেকেই চিনতেন। এই লজের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল সে। দুঃখের বিষয়, কিছুদিন আগে নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয়। আরও দুঃখের বিষয়, আজ অবধি সেই খুনের কোনও কিনারা হয়নি। ব্রাদার শৈলর আত্মা কাল রাতে এসে আমায় বলেছিল আজ সেই খুনি এই অনুষ্ঠানে আসবে। ব্রাদার শৈল নিজে তাকে চিনিয়ে দেবে।"

গোটা হল জুড়ে গুনগুন এতটাই বাড়ল যে গ্র্যান্ডমাস্টার নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ করলেন। লখন বেশ অবাক। এমন তো কথা ছিল না! শৈলচরণ!! এও সম্ভব!

দ্রিম দ্রিম আওয়াজে খুব ধীরে একটা ডাক বাজতে থাকল। হলের আলো প্রায় নিভু নিভু। গণপতি বিচিত্র ভাষার এক মন্ত্রে শৈলকে ডাকছে। সে ভাষা চেনা কোনও ভাষা না। যেন কোনও আদিম মন্ত্রে জেগে উঠবে রসাতলের

প্রেতাত্মারা। হলের দর্শকদের মধ্যে হঠাৎ একটা চাপা শ্বাস টানার শব্দ হল। লখন দেখতে পেল মঞ্চে গণপতির ঠিক পাশেই একটা উজ্জ্বল আলো আলেয়ার মতো কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে আলো বেড়ে উঠছে আর ধীরে ধীরে তা এক মানুষের চেহারা ধারণ করছে। এ কোনও মরমানুষের চেহারা না। প্রায় স্বচ্ছ, যেন সদ্য নরক থেকে উঠে এসেছে। খানিক পরে আর কারও চিনতে বাকি রইল না। ধুতি আর ফতুয়া পরা, লম্বা চুল, রোগা, খাটো দেহের এই মানুষটা বেঁচে থাকতে ম্যাসন হলের প্রায় সবাই একে দেখেছে। শৈলর ভূত এবার মঞ্চের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত হেঁটে যেতে লাগল। ঠিক হাঁটা না, যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। যাদের মনে তখনও সন্দেহ ছিল, এই হাঁটা দেখে তাও রইল না। শৈলরহাঁটায় এক নারীসুলভ কোমলতা ছিল। মৃত্যুর পরেও সে তা ছাড়তে পারেনি। শৈলর মুখ চোখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এ যে শৈলই, তাতে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। স্বয়ং গ্র্যান্ডমাস্টার হ্যালিফ্যাক্স হাতে ক্রুশ ধরে চোখ বন্ধ করে "Our Father, who art in heaven. Hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven" বলতে লাগলেন বিড়বিড় করে। শুধু লখন ভুরু কুঁচকে রইল। এ তো পিপার'স গোস্ট! জাদুকরদের কঠিনতম ইলিউশান। কিন্তু শৈলকে এনে ঠিক কী করতে চাইছে গণপতি?

গণপতি এবার শৈলচরণের ভূতের দিকে ফিরল। কাটা কাটা গলায় বলল, "ব্রাদার শৈল, আমি জানি তোমার সঙ্গে যা হয়েছে তার কোনও মাফ নেই। আমি এটাও জানি, খুনি আজও এই সমাজে বিনা বাধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গতকাল তুমি বলেছিলে, সে আজ এখানে আসবে। সে কি এসেছে?"

লখন দেখল সেই সাহেব এবার যেন একটু উশখুশ করে উঠলেন। দুই-একবার ঘাম মুছলেন কপালের। হাতের তেলোর।

মঞ্চে শৈলর ভূত উপরে নিচে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এসেছে।

দর্শকদের মধ্যে আবার গুনগুন শুরু হল।

"তুমি কি তাকে দেখাতে পারবে?"

আবার উপরে নিচে মাথা নাড়ল শৈলর ভূত।

"তবে দেখাও।"

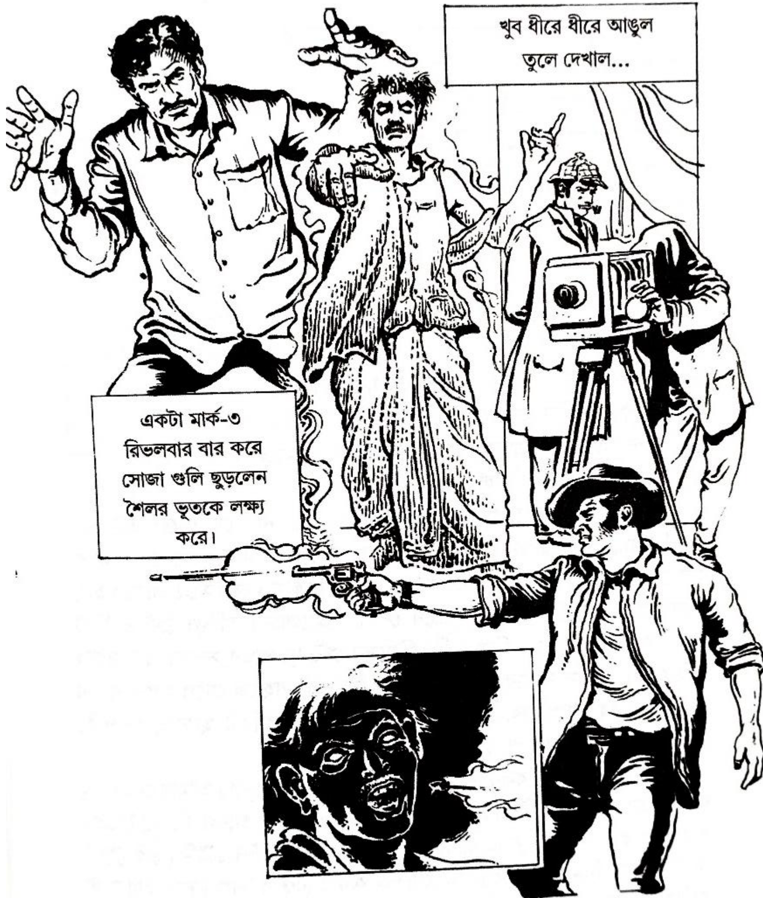
শৈলর ভূত খুব ধীরে ধীরে আঙুল তুলে দেখাবার আগেই অনেকগুলো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল। সেই সাহেব আচমকা উঠে দাঁড়ালেন নিজেই। মুখে অদ্ভুত এক হাসি। হাসি বাড়তে লাগল। হাসতে হাসতেই তিনি পকেট থেকে একটা মার্ক-৩ রিভলবার বার করে সোজা গুলি ছুড়লেন শৈলর ভূতকে লক্ষ্য করে। ভূতের গা ভেদ করে গুলি চলে গেল। শুধু প্রচণ্ড কান ফাটানো কাচ ভাঙার আওয়াজ এল মঞ্চ থেকে। লখন জানে সাহেব এরপরে তাকেই নিশানা করবে। তাকে খুঁজতেই তো সাহেবের আজ এখানে আসা। গণপতি বলেছে লখনকে। পকেটের পিস্তলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবে, এমন সময় দুই দিক থেকে দুই বজ্রমুষ্টি তার দুই হাত চেপে ধরল। পিছন থেকে ঘাড়ে ঠেকল ঠান্ডা ধাতব নল ।

"পুলিশ। একদম চুপ করে বসে থাকো।"

হলের পিছন দিক থেকে তিন-চারজন ব্রাদার সাহেবকে নিরস্ত্র করতে ছুটে এল। এসব গণ্ডগোল দেখে মাস্টার ম্যাসন উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। লখন দেখল সাহেব তার দিকে না, বন্দুক তাগ করেছেন সোজা মাস্টার ম্যাসনের দিকে। ভয়ে লখনের চোখ বড়োবড়ো হয়ে গেল। মাস্টার ম্যাসনের পরিচয় সাহেব পেল কী করে? তবে কি শৈল... মরার আগে মাস্টার ম্যাসনের পরিচয়... একবারও এটা ভেবে দেখেনি লখন। কেন ভাবেনি?

কিছু বোঝার আগেই পরপর তিনটে গুলি মাস্টার ম্যাসনের বুক, মাথা আর গালা বিঁধে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন মাস্টার ম্যাসন কিংবা গোপন গ্র্যান্ডমাস্টার ডাক্তার জোসেফ গ্রান্ট। আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা পরেই যাঁর লক্ষের গ্র্যান্ডমাস্টার হবার কথা।

আরও একটা গুলির আওয়াজ। এবার আর সাহেব না। নিজের পুলিশি রিভলবার থেকে অভ্রান্ত টিপে এক গুলিতে সাহেবের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছেন। প্রিয়নাথ দারোগা। তাঁর চাকরিকালে এই প্রথম এনকাউন্টার।



গোটা হলে শিশুদের চিৎকার, হুড়োহুড়ি আর বারুদের ধোঁয়ার গন্ধে অবিচলিত একজনই শুধু কোনওমতে সেই ভিড়ের মধ্যে হ্যালিফ্যাক্সের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "গ্র্যান্ডমাস্টার, আমার নাম শার্লকহোমস। আপনাকে আমার অনেক কিছু বলার আছে, একটু সময় হবে?"

৬।

"অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়ে ভয়ানক। আর এই গোটা কেসে বারবার সেটাই হয়েছে। কেউ কাউকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। প্রত্যেকে নিজেদের মতো ষড়যন্ত্র করেছে আর অন্যদের অর্ধসত্য বলেছে। ফলে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যে, আলাদা করা কঠিন হয়ে গেছে। আমি নিজেও সত্য গোপন করেছি", যিনি বলছিলেন, তাঁর নাম এতকাল সবাই সাইগারসন মোহেলস বলে জানত। আজ জানল তাঁর আসল নাম শার্লক হোমস।

"এই ছদ্মনাম আর বয়ে বেড়ানোর মানে হয় না। যে কাজে এই নাম নিয়েছিলাম, সে প্রয়োজন মিটেছে। আর হয়তো কোনও দিন এই দেশে আমাকে আসতে হবে না। তবে হ্যাঁ, এ দেশে এসে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপ হল, যাদের আমি চিরটাকাল মনে রেখে দেব।" আলোচনা হচ্ছিল ক্লাইভ স্ট্রিটে তারিণীর আপিসে বসে। যিশু ভক্তি দিবসের সেই দুঃস্বপ্নের সন্ধ্যার এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত। হোমস সাহেব আগামী কাল আটলান্টা জাহাজে চেপে লন্ডন রওনা হবেন। যাবার আগে সবাইকে একসঙ্গে ডেকেছেন। তারিণী ছাড়াও, গণপতি, প্রিয়নাথ আর হীরালাল-ও উপস্থিত।

"এখন আমি যা যা বলব, তা সরকারিভাবে বলার এক্তিয়ার আমার নেই। তবু বলি। আমাদের মহারানির বিরুদ্ধে আমাদের দেশেই নানা জায়গায় চাপা বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। কেউ তাঁকে মহামারি রানি বলে, কেউ বা ব্রিটিশ ডাইনি। এই মুহূর্তে যুদ্ধবিগ্রহ সব মিলিয়ে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভালো

না। প্রধানমন্ত্রী রানির কথায় ওঠেন বসেন। না চাইলেও বাধ্য হন। এদিকে রানি প্রায় শুরু থেকেই ম্যাসনিক হলকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছেন। যেহেতু ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স তাঁর তাঁবেদার নয়, তাই তিনি ম্যাসনদের এক অংশকে ব্যক্তিগত ইন্টেলিজেন্স টিম হিসেবে ব্যবহার করে চলেছেন ক্রমাগত। এরা রানির জন্য যে-কোনো কিছু করতে দুবার ভাবে না। এখন সমস্যা হল রাজপরিবারেই রানির বিরোধী তৈরি হয়েছে। স্বয়ং রাজকুমার এডির বিবাহ রানি মেনে নেননি, তাঁর স্ত্রীকে পাগলা গারদে পুরে দেওয়া হয়। তাঁর মেয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। যারা সেই মেয়ের সন্ধান জানত তাদের রানির ডানহাত ডাক্তার গল একে একে খুন করে। এই এক সমস্যা। পাশাপাশি ডাক্তার এলি হেনকি এমন এক আরক তৈরি করলেন, যা হাতে এলে যে-কোনো শত্রুকে বশে আনা যাবে। ম্যাসনদের মধ্যে দুইভাগ হয়ে যায় এই আরকের দখল নিয়ে। এক দল রানির পক্ষে, অন্য দল বিপক্ষে। এই লড়াইতে কী হত জানি না। মাঝখান থেকে সব হিসেব গুলিয়ে দিল একেবারে ছাপোষা এক কর্মচারী। হিলি। সে এমন দুটো জিনিস সঙ্গে নিয়ে ভারতে চলে এল যে, ইংল্যান্ডের সংঘ সব ছেড়ে আগে সেই দুই অমূল্য সম্পদ উদ্ধারে নামল। তাও একত্রে না। নিজেদের মতো করে। ফলে যা হয়। দুই দলের এই যুদ্ধে বহু সৈনিক প্রাণ দিল। হ্যালিডে, কার্টার, শৈল থেকে সেদিনের ম্যানুয়েল ডিব্যাসি। আসল মাথাদের টিকিটিও ছোঁয়ার সাধ্য কারও নেই।”

“সেদিন যা যা হল, আপনি কি তা আন্দাজ করেছিলেন?” প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

“কিছুটা অনুমান করেছিলাম। আন্দাজ না। আন্দাজ খুব বাজে স্বভাব। এতে ভুল হয় বেশি। এটুকু বুঝেছিলাম শৈল মরার আগে গোপনতম কিছু বলে গেছে, নইলে ওকে ওভাবে মরতে হত না। বুঝেছিলাম লখন কোনওভাবে ম্যানুয়েলকে ‘হেল ফায়ার’ খাওয়াবে, যাতে প্রথম আক্রমণ ও-ই করে। কিন্তু কীভাবে সেটা বুঝিনি।”

“কীভাবে?”

"এখানে অদ্ভুত চালাকি করেছিল লখন। আমি ভুলেই গেছিলাম গোটা খেলায় ওর এক পার্টনার-ইন-ক্রাইম আছে। ওর দিদি মারিয়ানা। ম্যানুয়েলের মহিলাদের প্রতি দুর্বলতা ছিল। ইচ্ছে করেই একদিন মারিয়ানা জুঁইয়ের বাসায় গিয়ে সাহেবকে মুখ দেখিয়ে আসে। জানত সাহেব তাকে একবার দেখলে ভুলবে না। সেদিন অনুষ্ঠান শুরুর আগে সে লালবাজারের পাশে ম্যানুয়েলকে টেনে নিয়ে গেছিল আমোঘ কামের টানে। আর সেখানেই..."

"কিন্তু সাহেবের শরীরে হেল ফায়ার প্রবেশ করাল কী উপায়ে?"

"মারিয়ানার ঠোঁটের চারদিকে গুঁড়ো করে হেল ফায়ার মাখানো ছিল। সে নিজে থুতুটাও গেলেনি। ম্যানুয়েল তাকে চুম্বন করা মাত্র তার ঠোঁট থেকে হেল ফায়ার সরাসরি সাহেবের দেহে ঢুকে যায়।"

"কিন্তু সাহেব আচমকা গ্রান্টকে মারলেন কেন?" তারিণী শুধাল।

"এটাও লখন স্বীকার করেছে। গ্রান্ট ছিলেন জাবুলনদের প্রধান। গোপন গ্র্যান্ডমাস্টার। যাকে ওরা মাস্টার ম্যাসন নামে ডাকত। খুব সম্ভব শৈল মরার আগে গ্রান্টের নাম বলে গেছিল। তা না হলে এই পরিচয় কারও জানার কথা না।"

"কিন্তু আইন তো লখনকে কিছু করতে পারবে না।"

"জানি। তাই অন্য উপায় নিতে হয়েছে। আর এইজন্যেই গণপতিকে দিয়ে হীরালালকে ডাকা। হীরালালের ক্যামেরায় সেদিনের সবকিছুর ছবি তোলা আছে। এমনকি শুরুতে লখন যে উপরচালাকি করে ম্যানুয়েলকে বসার জায়গা দেখিয়েছিল সেটাও। এই ভুল লখন করবে আমি ভাবিনি। যাই হোক, আমি লখনকে বলেছি, ও যদি কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি করে তবে লজের গ্র্যান্ডমাস্টারের কাছে সেই ছবি চলে যাবে। লজ এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে, কে ডিব্যাসিকে সেদিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ছবি দেখলে যে কেউ ভাববে লখনই এই কাজ করেছে। তখন ও কিংবা ওর পরিবার কাউকেই ব্রাদারহুড শান্তিতে থাকতে দেবে না। তবে আশার কথা একটাই, আপাতত জাবুলনদের প্রকোপ এই দেশে কিছু

হলেও কমবে। হ্যালিফ্যাক্সের আর এযাত্রা দেশে ফেরা হবে না। গ্র্যান্ডমাস্টার তিনিই থাকছেন। তিনি এসবের কিছুই জানতেন না। তাঁকে অন্ধকারে রেখেই...”

“লখনের তবে কী হবে?” গণপতির প্রশ্ন।

“ওর কোনও পরিচয়পত্র নেই। ইংরেজ শাসনে ওকে আর রাখা যাবে না। নতুন জায়গায়, নতুন পরিচয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে ওকে।”

“কোন পরিচয়?”

“ম্যানুয়েল ডিব্যাসির দুটো পরিচয়পত্র ছিল। একটা ডিব্যাসি নামে, ফরাসি নাগরিক। অন্যটা হিউড র‍্যাডির নামে, ইংরেজ। প্রথম পরিচয়টা লখনকে দিয়ে ওকে চিরকালের জন্য চন্দননগরে ফরাসি শাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।”

“আর মারিয়ানা? অ্যালিস?” জিজ্ঞাসা করল তারিণী।

এবার প্রিয়নাথ উত্তর দিলেন, “সেটা আমরাও সঠিক জানি না। টমসন সাহেব এই ব্যাপারটা একেবারে গোপন রেখেছেন। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। তবে এটা কথা দিয়েছেন ওরা যেখানেই থাক, ভালো থাকবে। সুরক্ষিত থাকবে। প্রয়োজনে অ্যালিসের পরিচয় প্রকাশ করা হবে। নচেৎ নয়। আর হ্যাঁ, খুব সম্ভব এ দেশে সামনের বছর জুবিলি হচ্ছে না। রানির নিরাপত্তাভঙ্গ হতে পারে।”

“ওদের প্ল্যানটা ঠিক কী ছিল? জানা গেছে?”

“তা সঠিক বলা মুশকিল। লখন নিজেও সবটা জানে না। তবে যা মনে হয়, আগামী বছর যিশু ভক্তি দিবসে ম্যাসন হলে খাওয়াদাওয়ার পর ম্যাজিক শো ছিল। সেখানেই রানির দেহরক্ষী বা অমন কারও খাবারে হেল ফায়ার মিশিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। পরে হয়তো প্রচার করত ভূতের আক্রমণে রানি মারা গেছেন। এই সবই আমার অনুমান। তবে পুরো ক্ষমতা দখল করার জন্যেই গ্রান্ট ক্ষমতা লাগিয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার হতে চেয়েছিল, এটা স্পষ্ট।” বললেন হোমস।

খানিক সবাই চুপ। প্রথম কথা বললেন প্রিয়নাথই।

“তারিণীকে শৈল সাজিয়ে মঞ্চে আনার বুদ্ধিটা কার? গণপতির?”

"না, আমার", বলল তারিণী। "শৈলর ওভাবে মারা যাওয়াটা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। আমি ছাপোষা মানুষ। ক্ষমতা খুবই কম। কিন্তু বন্ধুর খুনিকে হাতের সামনে পেয়ে ছেড়ে দেব? আপনিই বলুন? গণপতি প্রথমে রাজি হয়নি। আমি বললাম ওই ছায়া ছায়া আকারে কেউ পষ্ট বুঝতে পারবে না। আমি শৈলর চলাফেরা অবিকল নকল করতে পারি। আমার মধ্যে দিয়ে হলেও, শৈল তো একদিনের জন্যেও বেঁচে উঠেছিল", তারিণীর চোখ জলে ভরে আসে।

"তাহলে গণপতি, তুমি এখন কী করবে?"

"আর জাদু দেখাব না। জাদুর শখ আমার গেছে। পুঁটির মেয়েকে নাকি প্রফেসর প্রিয়নাথ বোস তাঁর বেঙ্গল সার্কাসে নিতে চান। আমিও সেই সার্কাসে যোগ দেব ভাবছি। এই পাপের শহরে আর মন টিকছে না।"

"সার্কাসে ম্যাজিক দেখাবে?"

"না। আমি অল্পবিস্তর ছবিও আঁকতে পারি। ওদের ওখানে জীবজন্তু আঁকার লোক খুঁজছে। দেখি একবার বলে। যদি আমায় নেন।

হোমসকে গোটাটাই তর্জমা করে বলে দিলেন প্রিয়নাথ।

"বেশ। এবার কয়েকটা জরুরি কথা। যে কদিন বেঁচে আছ, ভুলবে না। তারিণী, তোমায় আগের বার একটা বই দিয়েছিলাম মনে পড়ে? একটু নিয়ে এসো দেখি। সঙ্গে গণপতির দেওয়া ভূতের বাক্সটাও।"

ডিরেক্টর খুলে দুটোই নিয়ে এল তারিণী।

"এবার দ্যাখো। হ্যালিডে নিজেই জানত না কী মহাসম্পদ আছে তার কাছে। টেমারলেনের মলাটের এই তলাটা ভালো করে খেয়াল করো। কী দেখছ?"

সবকটা মাথা এক হয়ে দেখতে থাকে। তারিণাই উত্তর দেয়, "আজ্ঞে হিজিবিজি কিছু লেখা।"

"হিজিবিজি না। কেমিষ্ট্রির ফর্মুলা। একদিন বেখেয়ালে বইয়ের এই অংশে পাইপের হলকা লেগে লেখা ফুটে উঠেছিল। তখনই বুঝেছিলাম। এলি হেনকি

নিজে ভূত বানাতে ভুলে গেছেন, কিন্তু তার আগে অদৃশ্য কালিতে এখানে লিখে গেছিলেন। আমি চাইলে গোটাটাই উদ্ধার করতে পারতাম। করিনি। লেট দ্য জায়ান্ট স্লিপ। তোমরাও একে জাগিয়ো না। আর এখানেই আমার ভয়। এই বাক্স আর এই ফর্মুলা একসঙ্গে থাকলে, আর কোনও দুষ্টু লোকের হাতে পড়লে মহা বিপদ। তাই দুটো দুই জায়গায় থাক। তোমার কাছে বইটা আর হেল ফায়ার সহ বাক্সটা বাবু প্রিয়নাথের কাছে", বলে কাপড়েমোড়া কাঠের বাক্সটা প্রিয়নাথের হাতে দিয়ে বললেন, "লখনের কাছেই ছিল। আমি চাইতেই দিয়ে দিল। এখন আপনার কাছে থাক। আপনার কাছে ধড়, আর মুণ্ডু তারিণীর কাছে।"

"কিন্তু এ জিনিস তো নষ্ট করে ফেললেই হয়!"

"বিজ্ঞানের এত বড়ো আবিষ্কার নষ্ট করে ফেলবেন?" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন হোমস। "কে জানে আজ থেকে একশো বছর পরে মানুষ এর কোনও কল্যাণময় দিক আবিষ্কার করবে কি না।

তারিণী তার কাছে এই কেসের যাবতীয় যা কিছু ছিল প্রিয়নাথকে দিয়ে দিল। এমনকি এই কেসের যতটুকু বিবরণ তার ডায়রিতে লেখা ছিল, সেটাও ছিঁড়ে দিয়ে দিল প্রিয়নাথকে। এই অভিশপ্ত কেসের সঙ্গে সে আর কোনও যোগ রাখতে চায় না।

সবাই চলে গেছে। ঘরে বসে একা তারিণী। সে শুধু একটা জিনিস নিজের কাছে রেখে দেওয়ার আবদার করেছে। সবাই মেনেও নিয়েছে। শৈলচরণের ম্যাগনাম ওপাস "বিষম ভূত ও পুষ্পসুন্দরীর পালা", বাকি কপিগুলো সেই রাতে কে নিল, কেন নিল, উত্তর হয়তো জানা যাবে না কোনও দিন। তারিণী শৈলর লেখা পাতলা বইটাতে হাত বোলায়, হাত বোলায়। এই তো প্রথম পাতায় তার আর শৈলর নাম একসঙ্গে আছে। দুজনে একসঙ্গে এভাবেই থেকে যাবে চিরকাল।

কী মনে হওয়ায় তারিণী টেমারলেনের বইটা হাতে তুলে নেয়। মলাটটা রেখে ভিতরের বইটা খুলে বার করে নিয়ে আসে। তারপর সেই জায়গায় শৈলর লেখা রেখে দেয়। সাহেব বলেছিল এই বই নাকি পৃথিবীর অন্যতম দামি বই। কিন্তু তারিণীর কাছে শৈলর লেখার চেয়ে দামি কিছু নেই। মোটা সুতো দিয়ে বইটা মলাটের সঙ্গে সেলাই করে, বইকে লাল শালুতে মুড়ে দড়ি বেঁধে ডিরেক্টরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল তারিণীচরণ। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ভিতরের অন্ধকারের দিকে। তারপর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিরেক্টরের ডালা বন্ধ করে দিল।

উত্তরখণ্ড- সংখ্যাপন

প্রথম পর্ব- গাঢ়ধূম্রের কুণ্ডলী

ক্রিং ক্রিং ক্রিং... একটা অ্যালার্ম ঘড়ির ধাতব শব্দে ঘুম ভেঙে গেল প্রশান্ত মজুমদারের। খুব জোরে না, কিন্তু বেজেই চলেছে আওয়াজটা। প্রশান্ত জানেন তাঁকে এবার উঠে যেতে হবে। না হলে এই আওয়াজ থেকে মুক্তি নেই। আর প্রতিবার এই আওয়াজ তাঁকে ছোটোবেলায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ডালহৌসি স্কোয়ারে আজ থেকে একশো বছর আগে জেমস মুরের ঘড়ির দোকান ছিল। সাহেবসুবোদের ঘড়ি কেনার একমাত্র জায়গা। একবার নেটিভ হিন্দুদের জন্য অদ্ভুত একটা অ্যালার্ম ঘড়ি বার করল তারা। নাম দিয়েছিল "বৃন্দাবন ক্লক"। ডায়ালে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি খোদাই করা। মাত্র তিনশোখানা অমন ঘড়ি বাজারে আনার পর বৃন্দাবন ক্লক বন্ধ হয়ে যায়। প্রশান্ত মজুমদারের বৃন্দাবন ক্লক খুব সম্ভব সারা বিশ্বে এই ঘড়ির একমাত্র চালু প্রতিনিধি। তিনি এটাকে নিজের হাতে অয়েলিং করেন, কাচ মোছেন, পাতলা সাদা কাপড় ঘষে ঘষে পরিষ্কার করেন। এই ঘড়ি তাঁর ঠাকুর্দা নিশিকান্ত মজুমদারের। ছোটোবেলা থেকেই তাঁকে বোঝানো হয়েছিল এ ঘড়ি বড়ো সামান্য জিনিস না। সত্যি বলতে কি, পুরোনো জিনিসের উপরে তাঁর এই অদম্য আগ্রহের শুরু হয়েছিল এই ঘড়িটা থেকেই।

সাদার্ন অ্যাভিনিউর বিরাট চারতলা 'মজুমদার ভবন'-এ সময় আজকাল বড্ড ধীর গতিতে চলে। বিরাট বাড়িতে প্রশান্তবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। গোটা বাড়ি জুড়ে কেমন একটা অভিশাপের হাওয়া ঘুরে বেড়ায়। এ বাড়িও নিশিকান্তের তৈরি। নিশিকান্তকে কে যেন অভিশাপ দিয়েছিল দুই প্রজন্মের মধ্যে তাঁদের বংশ নির্বংশ হবে। বাবা খুব বলতেন। প্রৌঢ় প্রশান্ত মজুমদার জানেন অভিশাপ সত্যি হোক কি মিথ্যে, বংশ শেষ হবে তাঁর সঙ্গেই। প্রশান্ত বিয়ে করেননি। করার ইচ্ছেও জাগেনি কোনও দিন। বরং সারাজীবনের আয়ে বাড়িটাকে সাজিয়েছেন

একেবারে মিউজিয়ামের মতো করে। অনেকেই জানে না, কলকাতার অ্যান্টিক কালেকটরেদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতেই আছেন তিনি। কী নেই তাঁর কাছে? এইচ বোসের সিলিন্ডার রেকর্ড, ফুলমণি ও করুণার বিবরণের প্রথম সংস্করণ, আবোলতাবোলের সুকুমারের নিজের করা খসড়া খাতাখানা, গণপতির ম্যাজিকের পোস্টার, হীরালাল সেনের তোলা স্টিল ফটোগ্রাফ। তবু এখন, এই বয়সে এসে অদ্ভুত এক হতাশা জুড়ে থাকে তাঁকে। ঘুম থেকে জেগে উঠলেই সেই হতাশাটা যেন কামড়ে ধরে। দিন বাড়লে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

ব্যক্তিগত কাজে দিন দু-একের জন্য এলাহাবাদ গেছিলেন প্রশান্ত। সেখানেও অফিস থেকে সামুইবাবুর ফোন এসেছিল। জরুরি তলব। কোথায় নাকি অ্যাকুইজিশানের প্রয়োজন। আগে এইসব কাজে বলার আগেই লাফিয়ে পড়তেন প্রশান্ত। কলকাতার পুরোনো ঘরবাড়ি তাঁকে টানে। এ টান অমোঘ। এ টান উপেক্ষা করা যায় না। বড়োবড়ো হল, পোর্টিকো, ডোরিক থাম, দরবার ঘর, জলসাঘর, গোমস্তাখানা, ঠাকুরদালান আর দেওয়ালে টাঙানো বিরাট সব সাহেবি তৈলচিত্র যেন এক লহমায় প্রশান্তকে টাইম মেশিনে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায় উনিশ শতকে। পরম যত্নে এক-একটা জিনিস ধরে ধরে দেখেন তিনি। মিং আমলের পোর্সেলিনের ফুলদানি, ঝাড়লণ্ঠন, মার্বেলের মূর্তি, অ্যান্টিক আসবাব। এদের কিছু খোলা বাজারে বিক্রি হবে, কিছু দান করা হবে মিউজিয়ামে, আর সবচেয়ে সরেস বস্তুগুলো চলে যাবে অকশন হাউসে। আর এখানেই প্রশান্তের আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। বহুদিন হল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের স্টেনার এন্ড কোং কিংবা পার্ক স্ট্রিটের ভিক্টর ব্রাদার্স বন্ধ। সবেধন নীলমণি বলতে রাসেল স্ট্রিটে সেলিম ভাইদের রাসেল এক্সচেঞ্জ। প্রশান্ত মজুমদারের ব্যক্তিগত সংগ্রহের অনেকটাই এসেছে এই দোকান থেকে। এককালে পাগলের মতো সংগ্রহ করে যেতেন। ক্যাটালগ বানাতেন। এখন আর সেই বয়স নেই। উৎসাহেও ভাটা পড়েছে। তাই সামুইবাবুর ফোনে আর উত্তেজিত হন না তিনি।

নিজের পুরোনো প্রিমিয়ার পদ্মিনী গাড়িটা নিয়ে যখন অফিসের দিকে রওনা হলেন তখন নটা বেজে গেছে। আগের ডিরেক্টর মিসেস রত্না সেন আসা যাওয়ার সময়টা খুব মেনটেন করতেন। তিনি রিটায়ারের পর সামুইবাবু চার্জে আছেন। তিনি জানেন এই পদ কদিনের মাত্র। কিছুদিন পরেই নতুন অর্ডার বেরোবে, আর চিফ আর্কাইভিস্ট প্রশান্ত মজুমদার ডিরেক্টর হয়ে তাঁর মাথায় চেপে বসবেন। ফলে একটু যেন কাছাখোলা হয়েই অফিস চলছে। কেউ কোনও কিছুতে বিশেষ গা করে না।

পার্ক স্ট্রিট পেরোনোর সময় প্রশান্ত খেয়াল করলেন এখনও এক মাসের মতো বাকি, কিন্তু বড়দিনের বিজ্ঞাপন আর ফেস্টুন লাগানো শুরু হয়ে গেছে। গাড়ি ঘুরিয়ে শেক্সপিয়র সরণির বিরাট বাড়িটার পার্কিং-এ ঢুকলেন প্রশান্ত। আগে বাড়ির রং হলুদ ছিল। এক বছর হল সরকার বদলেছে। এখন রং নীল-সাদা। গাড়ি থেকে অ্যাটাচি কেসটা বার করে সোজা লিফটে চড়ে চলে গেলেন টপ ফ্লোরে। এখানেই সামুইবাবু বসেন।

অলক সামুই মানুষটা ছোটোখাটো। সর্বদা হাসিমুখ। প্রশান্তকে দেখেই একগাল হেসে বললেন, “আরে আসুন আসুন। দারুণ একটা খবর আছে। আপনার জন্যেই এতদিন চিঠিটা চেপে রেখে দিয়েছি। জানি আপনি এই ধরনের কাজে উৎসাহ পান। এই দেখুন...” বলে লম্বা বাদামি একটা খাম বাড়িয়ে দিলেন প্রশান্তর দিকে। খাম খুলতে মোটা কাগজে টাইপ করা একটা চিঠি বেরোল। আদ্যোপান্ত চিঠিটা মন দিয়ে পড়লেন প্রশান্ত। তারপর চিঠি থেকে মুখ তুলে বললেন, “এ তো অবিশ্বাস্য!”

“না হলে আর বলছি কী!”

“গোটাটাই স্টেট আর্কাইভে দেবে?”

“গোটাটা কি আর দেয়? দামি জিনিসগুলো সব বেচে দিয়েছে। সেই টাকাতেই বিদেশ যাচ্ছে। ঝড়তিপড়তি কিছু পড়ে আছে, সেগুলো দিতে চাইছে।

তা আপনার চেয়ে যোগ্য আর কে-ই বা হতে পারে। দেখুন গিয়ে, যদি কিছু দরকারি জিনিস থাকে।"

"ওহহ। তাই বলুন। ইনভেনটরির লিস্ট পাঠিয়েছে? "

"তা পাঠিয়েছে একটা। কিন্তু সে থেকে কিছু বুঝে নেওয়া মুশকিল। না, না, আপনি নিজে তদারক করে অ্যাকোয়ার করুন।"

"এদের পরিবারেই সেই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ছিলেন না? যাঁর 'কলকাতার ইতিবৃত্ত' বিখ্যাত?"

"তাঁরাই। তবে এ অন্য গুষ্টি। গোপালচন্দ্র দত্ত। ইনি ডাক্তার ছিলেন। এই যে। এই কাগজটা দেখুন। এখানে একটা সংক্ষিপ্ত বংশতালিকা পাবেন।"

"সে ঠিক আছে, কিন্তু আমার আর এসব পোষায় না। অন্য কাউকে যদি......"

"কী বলছেন মশাই! এই কাজে আপনার চেয়ে উপযুক্ত আর কে আছে! আজ অবধি যে কটা বড়ো অ্যাকুইজিশান হয়েছে, সবেতেই আপনি ছিলেন। সে দ্বারকানাথের বেলগাছিয়া ভিলাই হোক কিংবা খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়ি। আপনি না করলে কে করবে এই কাজ?"

"আসলে স্যার, সত্যি কথা বলি। তখন বয়স কম ছিল, উৎসাহ বেশি ছিল, সারাদিন দাঁড়িয়ে এসব করতাম। এখন সেই উৎসাহও নেই। শরীরও সায় দেয় না। সবচেয়ে বড়ো কথা, এরা সব বেচে আমাদের জন্য যা ফেলে রাখে তাতে দরকারি খুব বেশি কিছু থাকে না। তাও আপনি আমাকে মার্কা করে দিন। দেখি, যদি পারি নিজে যাব। নয়তো কাউকে পাঠাব। চিন্তা নেই, অযোগ্য কেউ হবে না।"

মার্কামারা চিঠিটা হাতে নিয়েই নিজের কামরার ঢুকলেন প্রশান্ত। এই কামরাটা অন্য সব কামরা থেকে আলাদা। পিছনে একটা দাগারোটাইপ ছবি ঝুলছে। টেবিলে ছোটো শ্বেতপাথরের পিরামিড। জানলায় ভারী পর্দা। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে রুমটাকে সাজিয়েছেন তিনি। ঘরে ঢুকলেই আবছা

একটা ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। চন্দনের গন্ধ। এই গন্ধটা তাঁর খুব প্রিয়। ঢাকা ধূপদানে নতুন ধূপকাঠি জ্বেলে টেবিলের ঘন্টাটা বাজালেন তিনি। কাঠের ধূপদানের ফাঁক দিয়ে মৃদু মৃদু ধোঁয়া উঠছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিয়ন এসে ঢুকল।

"ডাকছিলেন স্যার?"

"হ্যাঁ, অরুণ, আজকে দেবাশিস এসেছে?"

"কে? গুহবাবু? দেখলাম তো একটু আগেই। পাঠিয়ে দেব?"

"হ্যাঁ, বলো একটু জরুরি।"

মিনিট পাঁচেক পরেই দরজায় নক করে দেবাশিস এসে ঢুকল।

"আসছি।"

"হ্যাঁ এসো। দ্যাখ তো এই চিঠিটা..."

চিঠি পড়তে পড়তে দেবাশিসের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"হাটখোলার দত্ত বাড়ির অ্যাকুইজিশান! এ তো দুরন্ত খবর!"

"শোন, ইনভেনটরির যে লিস্ট পাঠিয়েছে, তাতে চোখ বোলালাম। এতে তেমন কিছু নেই। আর এইসব কাজ বড়ো ঝামেলার। সারাদিন নষ্ট। ইন ফ্যাক্ট একদিনে হবেও না। তুমিই তো একদিন বলছিলে ভালো অ্যাকুইজিশান পেলে তোমায় জানাতে। শুরু হিসেবে মন্দ হবে না।"

"কিন্তু এতে তো আপনাকে মার্কা করা।"

"সে আমি সামুইবাবুকে বলে ম্যানেজ করে দেব। তোমাকে উনি স্নেহ করেন। তোমার নাম বললে না করবেন না। যাবে তো বলো...."

ঠিক চারদিন পরে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের এক খুপরি ঘরের দরজা খুলে প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকল এক যুবক। পরিশ্রম না। উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে সে। ডিসেম্বরের শীতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ঘরে একটা হলদে আলো জ্বলছে। একটা টেবিল আর গোটা তিন-চার চেয়ার ছাড়া গোটা ঘরে কোনও আসবাব নেই। টেবিলের ওদিকে গম্ভীর মুখে বসে চুরুট টানছিলেন এক

ভদ্রলোক। মুখে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। যুবককে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে তিনি প্রায় কড়কেই উঠলেন, "আচমকা আমাকে এখানে ডাকার মানে?"

"মাস্টার", কোনওমতে বলল যুবক, "এ কথা অন্য কোথাও বলা যেত না।"

"কী এমন কথা?"

"যা আপনি এতদিন ধরে আমাদের সবাইকে বলে আসছেন। সংঘের কেউই আপনাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। আমিও না। কিন্তু আজ আমি জানি, আপনি যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আমি ক্ষমা চাইছি।"

"কী বিষয়ে বলছ সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"ভূত বিষয়ে।"

এবার একটু চমকে গেলেন টেবিলের অন্য দিকের মানুষটা।

"কী বলছ?"

"হ্যাঁ মাস্টার। আমি প্রমাণ পেয়েছি ভূত একেবারেই একটা মিথ না। ভূত জলজ্যান্ত ইতিহাস। সে ইতিহাস এতদিন লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।"

"এ কী শোনাচ্ছ হে দেবাশিস! ভূত যে সত্যিই ছিল তার পাথুরে প্রমাণ পেয়েছ তুমি! এ যে অবিশ্বাস্য! "

"আরও কিছু বেশি পেয়েছি মাস্টার। ভূত শুধু ছিল না। ভূত আছে। আর ভূতকে আবার জাগানো সম্ভব।"

দ্বিতীয় পর্ব- গৌরবের লক্ষ মুসাফের

"আমি এখন তোমাকে যা যা বলব, তুমি শুনতে প্রস্তুত তো?"

এত কিছুর মধ্যেও আমার হাসি পেল। গত দু-তিন দিন ধরে আমার সঙ্গে যা ঘটেছে, ঘটছে, তারপরে আর কিছুতেই অবাক হচ্ছি না। সিরিয়াসলি। অপর্ণা গুহ আমার প্রেমিকা উর্ণার দিদি, দেবাশিস গুহ আসলে ডিব্যাসি, উর্ণার বাবা নিজের প্রাক্তন জামাইকে খুনের দায়ে পুলিশের কাছে বন্দি, বিশ্বজিৎ এমন কিছু জেনে গেছিল যার জন্য ওইভাবে খুন হতে হল তাকে। তাও কীভাবে? না, যেভাবে একশো বছর আগে শৈলচরণ খুন হয়েছিল। কে শৈলচরণ? আমার প্রপিতামহের বন্ধু। সবকিছু ঘুরেফিরে আমার কাছেই চলে আসছে, আর আমি ভ্যাবলার মতো সবকিছু দেখে চলেছি। গোয়েন্দাগিরি অনেকটা ডাক্তারির মতো। অন্যের রোগ হলে সারাতে ভালো লাগে। কিন্তু নিজে তাতে জড়িয়ে গেলে চরম অস্বস্তি হয়। আমি হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি। উর্ণার বাবাকে গতকাল পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আজকে বেইল পাবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে হবে। ভেবেছিলাম আমিও সঙ্গে থাকব। থাকলে হয়তো উর্ণা মনে একটু জোর পেত। কিন্তু সেটা হল না।

সাতসকালে অধীশ বিশ্বাসের ফোন এল, “খুব জরুরি দরকার। এখুনি চলে এসো আমার বাড়িতে। ব্রেকফাস্ট এখানেই করবে।”

“আসলে অধীশদা, কাল সারারাত তেমন ঘুম হয়নি। ভাবছিলাম...”

“আমিও সারারাত ঘুমাইনি। শৈলচরণের সেই নাটক... ভাবতেও পারছি না কী ভয়ানক.... উফফ.....”

“কেন, কী হয়েছে অধীশদা?”

“সব কথা ফোনে বলা যাবে না। তুমি এসো তাড়াতাড়ি।” বলেই ফোন রেখে দিলেন।

আমিও ঊর্ণাকে বলে অধীশদার বাড়ির দিকে বাইক ছোটালাম। আসলে এখানে আমার তেমন কোনও জরুরি কাজ নেই। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল, উর্ণার বাবার গ্রেপ্তারের সঙ্গে ওই নাটকের একটা কানেকশান থাকলেও থাকতে

পারে। রাস্তায় ভিড় বেশি নেই। সাড়ে আটটার মধ্যে অধীশদার বাড়ি পৌঁছে গেলাম।

দরজা খুললেন অধীশদা নিজেই। দেখেই বুঝলাম রাত জাগার কথাটা মিথ্যে না। চোখ লাল, চুল উশকোখুশকো। তাঁর স্ত্রী বুঝি রান্নাঘরে ছিলেন। গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। আমাকে প্রায় হাত ধরে টেনে আগের দিনের সেই বসার ঘরে নিয়ে বসালেন অধীশদা।

"বলুন অধীশদা, কী জন্য ডেকেছেন?"

"সে তো বলবই। কিন্তু তুমি প্লিজ আর-একবার বলো দেখি, এই নাটক ঠিক কীভাবে পেলে তুমি?"

আমি আগাগোড়া সমস্তটা বললাম। কিচ্ছু না লুকিয়ে। এমনকি পো-এর বইয়ের কথাটাও।

"সে বই তুমি এনেছ? কাছে আছে?"

জানতাম এমনটাই হবে। তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। শৈলর বই। পো-র বইয়ের মলাট। অধীশদা খুব মন দিয়ে সেটাকে দেখলেন। পিছনের আঁকিবুকি অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। তবুও দেখা যাচ্ছে। সেটাকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করলেন। বিশেষ করে গোলমতো সিলটাকে। তারপর মাথা উঠিয়ে আমার কাছে জানতে চাইলেন উনি যা বলবেন আমি সেটা শুনতে প্রস্তুত কি না। এইসব প্রশ্নের উত্তর না হয় না। আমি মাথা নাড়তেই অধীশদার মধ্যে আবার সেই মাস্টারিটা ফিরে এল।

"শৈলর লেখা এই নাটকটা আমি বারবার পড়েছি। বুঝতে পারছিলাম কোথাও একটা ক্লু আছে। কিন্তু সেটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না দেখে ধাঁধার সমাধান হচ্ছিল না। কাল আচমকা বিজ্ঞাপন অংশটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে গোটাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।"

"রিভার্স রিড? ওটা পেনসিলে দাগানো আছে।"

অধীশদা দৃশ্যত অবাক হয়ে গেলেন। "তুমি জানো! গ্রেট! এবার বিজ্ঞাপনের প্রতি লাইনের শুরুর অক্ষরটা দ্যাখো। বি-ক-তো-রি-আ। আমার আর কোনও সন্দেহই রইল না। আমি মহারানি ভিক্টোরিয়াকে ক্লু ধরে নাটকের সমাধান করতে বসলাম। কাল সারারাত জেগে সমাধান করেও ফেলেছি।"

"কীরকম?"

সামান্য হেসে একটা সিগারেট ধরালেন অধীশদা। এসব গল্পের গোয়েন্দারা করে। সাসপেন্স বাড়ানোর জন্য। লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন, "রানি ভিক্টোরিয়ার আসল নাম কী জানো? কিংবা ডাকনাম?"

মাথা নাড়লাম। জানি না।

"আলেকজান্দ্রিনা। সংক্ষেপে দ্রিনা। সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি নাম বদলে নেন। তাঁর এ ছাড়াও গোটা দশেক ডাকনাম ছিল। ঠাকুমা তাঁকে ডাকতেন মে-ব্লুম বলে। যার বাংলা ফুলের মতো সুন্দর। পুষ্পসুন্দরী।" এইটুকু বলে অধীশদা খানিক চুপ করলেন। আমি কোনও রি-অ্যাকশান দিই কি না দেখার জন্য। দিলাম না।

"আবার দ্যাখো, রানির অন্য নাম ছিল Duck, মানে হাঁস। আদর করে পরিবারের অনেকে এই নামে ডাকতেন তাঁকে। এবার মলাটের প্রথম লাইন দ্যাখো, 'হংসকে হত্যা করার কিবা এ কী ছল'। পরিষ্কার বুঝলাম এতদিন গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে যা মিথ বলে মানা হত, সেটা বাস্তবে ঘটেছিল। এবার গোটা নাটক সহজ হয়ে এল। রানির স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট অফ স্যাক্স কোবার্গ অ্যান্ড গোথা। অ্যালবার্ট অর্থ Bright। এই নাটকের দীপ্তবর্ষ। রানির বড়ো ছেলে রাজকুমার এডওয়ার্ড। মানে ইংরাজিতে Wealth। এখানে ধনবর্মা। নাটকের কম্বুদ্বীপ আসলে জম্বুদ্বীপ। ভারতবর্ষ। যেখানে রানিকে ফ্যামিন কুইন বা দুর্ভিক্ষের রানি বলা হত। এই অবধি নাটক সোজা চলছিল। এবার এল কাপালিক। আমার বিশ্বাস এই কাপালিক কোনও একজন মানুষ না। কোনও গোষ্ঠী। আর কাপালিকের গৃহে যে ধরনের কথাবার্তা চলছে, তাতে আমি যদি খুব ভুল না

হই, তবে এই গোষ্ঠী হয় ফ্রিম্যাসন, তা না হলে ম্যাসন ঘনিষ্ঠ কোনও গোষ্ঠী। বড়ো ছেলের সঙ্গে রানির সম্পর্ক ভালো ছিল না। বড়ো নাতি অ্যালবার্ট দ্য ভিক্টর তো পৃথিবীবিখ্যাত এক কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েন। জানো নিশ্চয়ই?"

পাশাপাশি মাথা নাড়লাম। জানি না।

"তুমি জ্যাক দ্য রিপারের নাম শোনোনি! রানির নাতি গোপনে এক শপগার্লকে বিয়ে করেন। তাঁদের এক মেয়েও জন্মায়। খুব স্বাভাবিকভাবেই রানি সেই বিয়ে মেনে নেননি। অ্যালবার্টকে একরকম বন্দি করা হয়। মেয়েটির পাঁচ বান্ধবী এই সন্তানের কথা জানত। সবাইকে একে একে নৃশংসভাবে খুন করা হল। বলা হল, কে এক জ্যাক দ্য রিপার এদের খুন করছেন। পাঁচজন খুন হতেই রিপার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এটা সবাই জানে। যেটা জানে না, তা হল, এর প্রতিশোধ নিতে খোদ রাজপরিবারে রানিকে হত্যার চক্রান্ত হয়।"

"বলেন কী?"

অধীশদা এবার উঠে গিয়ে বইয়ের গাদা হাঁটকে একটা খুব পুরোনো লাল চামড়া বাঁধানো বই নিয়ে হাজির হলেন। "কলেজ স্ট্রিটে সাজেদের সেকেন্ডহ্যান্ড বইয়ের দোকান থেকে বেজায় সস্তায় পেয়েছিলাম। রেয়ার বই। এই দ্যাখো", বলে বইটা আমার সামনে খুলে দিলেন। বইয়ের নাম "The Secret Life of Queen Victoria"। লেখকের নামের জায়গায় কোনও নাম নেই। শুধু "A Historian" লেখা।

"বেনামি বই?"

"হ্যাঁ। এবার ছাপার সালটা দ্যাখো। ১৯০১। রানি সেই বছরই জানুয়ারিতে মারা গেছেন। লেখক নিজের নাম জানানোর রিস্ক নেননি। তবে লেখক যিনিই হোন, তিনি হয় ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের কেউ, আর নয়তো এমন কেউ, যাঁর কাছে তখনকার ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের সব খবর ছিল। থ্যাকার অ্যান্ড স্পিংস থেকে বইটা বেরিয়েছিল। মাত্র একশো কপি। খুব সম্ভব আর এই বই প্রকাশ

পায়নি। কোনও ক্যাটালগে এই বইয়ের উল্লেখ নেই। অবশ্য তার কারণও আছে।”

“কী কারণ?”

“এই দ্যাখো। একেবারে শেষ অধ্যায়। The Hidden Spirit। এখানে লেখা, ১৮৯৭ সালে রানির জুবিলি অনুষ্ঠানে তিনি স্বয়ং ভারতে আসবেন বলে স্থির হয়। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফ্রিম্যাসনদের এক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে রাজকুমার এডওয়ার্ড নিজে মহারানিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। রানি যতদিন সিংহাসনে থাকবেন, তিনি রাজা হতে পারবেন না। এখন চার্লসের যা দশা। আর ভিক্টোরিয়া তো নিজের সন্তানদেরও রেয়াত করতেন না। সে যাই হোক, ম্যাসনদের হাতে নাকি এমন এক অস্ত্র আসে, যাতে খুনের কোনও প্রমাণ থাকবে না। এখানে সেই অস্ত্রকে বলা হয়েছে spirit, যার একটা মানে মদ বা আরক জাতীয় কিছু। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু একটু আগে পো-র মলাটটা দেখে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার কাছে। স্পিরিট মানে আরক, স্পিরিট মানে সাহস, স্পিরিট মানে নেতা, স্পিরিট মানে উদ্দীপনা, আবার স্পিরিট মানে প্রেতাত্মা, ভূত। এক শব্দের কত মানে! শৈলর ভাষায় ‘হিলি ভূত, বিলি ভূত’।”

“তারপর কী হল?”

“ওহ হ্যাঁ। এই আমার এক বদ অভ্যেস। অন্য কথায় চলে যাই। তারপর ঠিক কী হল সেটা এই বইতে নেই। শুধু এটুকু আছে যে এই ষড়যন্ত্র শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে যায়। কীভাবে, সেটাও বিস্তারিত লেখা নেই। রানির আর এ দেশে আসা হয়নি। আমি গতকাল ন্যাশনাল লাইব্রেরি গেছিলাম। রানি আসার আগের বছরের সব পত্রিকা ঘেঁটেছি। কিচ্ছু নেই। শুধু দু-একটা ছেঁড়াছেঁড়া ক্লু ছাড়া।”

“কেমন?”

“রানি আসার বছরখানেক আগে থেকেই ফ্রিম্যাসনরা আচমকা খুব অ্যাকটিভ হয়ে ওঠে। সেটাই কাল হয়। ১৮৯৬তে ওদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এক

অজ্ঞাত আততায়ী এসে ওদের নতুন গ্র্যান্ডমাস্টারকে গুলি করে। এই আততায়ী বিষয়ে পত্রিকায় একটা কথাও নেই। শুধু আছে আমাদের প্রিয়নাথ দারোগা এই আততায়ীকে এনকাউন্টার করে মারেন।”

এতক্ষণ আমি ক্লাস করার মতো শুনে যাচ্ছিলাম। প্রিয়নাথের নামটা কানে আসামাত্র নড়েচড়ে বসলাম। আবার প্রিয়নাথ! এই লোকটা কত কী করে গেছে।

“আমি এতকাল ভাবতাম এই হিস্টোরিয়ান নামের বেনামি লেখক বানিয়ে বানিয়ে একটা কনস্পিরেসি প্লট লিখেছেন। কিন্তু শৈলর নাটক দেখে যা বুঝি এর সবই সত্যি! আর যদি তা হয়, তবে...”

“তবে কী?”

“বইয়ের শেষে লেখক বেশ সজ্ঞানে ভয় দেখিয়েছেন। বলেছেন আততায়ী শেষ হলেও এই স্পিরিট বা ভূতের নাকি বিনাশ হয়নি। ভূতকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। যে-কোনো দিন ভূত জেগে উঠবে। তখনকার অনেক লেখক বইয়ের কাটতির জন্য এমন রোমহর্ষক একটা শেষ করতেন। এতে বই শেষ হয়ে গেলেও পাঠকের সাসপেন্স শেষ হত না। আমিও তেমনই ভেবেছিলাম। কিন্তু আজ তুমি যা দেখালে..... মানে পো-র বইয়ের মলাটের পিছনে যা যা লেখা... আমি এর অর্থ বলতে পারব না হয়তো, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র নই... তবে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত।“

“কী ব্যাপারে?”

“এই চিহ্ন, যা বইয়ের উপরে আছে, তা ফ্রিম্যাসনদের গোপনতম চিহ্ন। জাবুলন নামে এক জঙ্গি গোষ্ঠীর। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও এটার কথা কেউ জানত না। সম্প্রতি ন্যাশনাল জিওগ্রাফির এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। সেদিন টিভিতে দেখছিলাম। তাই বলছি, একশো বছর পরে ভূত সত্যিই জেগেছে। তুমিই হয়তো জাগিয়েছ। এবার সেই ভূত কীভাবে নৃত্য করবে, সে ব্যাপারে, বিলিভ মি, আই হ্যাভ অ্যাবসোলিউটলি নো আইডিয়া।”

তৃতীয় পর্ব- কত শত যোনিচক্রস্মৃতি

গোটা জগৎটাই কেমন যেন অলীক বলে বোধ হচ্ছে। আজন্মলালিত যে জ্ঞান, যে চেতনা, যে সত্যমিথ্যা শিক্ষায় নিজেকে বড়ো করে তোলা, সব কেমন কাচের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে দ্রুত। দুচোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। ঘুম আসছে না। মাথার মধ্যে অজস্র শব্দের বিনবিনুনি। সদ্যবিবাহিতা স্ত্রী বারবার জানতে চাইছে, “কী হয়েছে? চাকরিতে কিছু সমস্যা?” বলতে পারছে না। শুধু যে অস্তিত্বটুকু নিজের বলে জানত, এক অন্যরকম হাওয়া এসে তাকে বয়েনিয়ে যাচ্ছে। কোথায়? সে জানে না। এ যদি সত্যি হয়, তবে সব সত্যি। রূপকথার মতো, ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো, ফেলে আসা গল্পরা কোন এক জাদুবলে প্রাণ পেয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়ে যেন চিৎকার করে নিজেদের জানান দিচ্ছে। সে বুঝতেও পারেনি এত কিছু ঘটতে পারে।

চার বিঘে জমির উপরে বিরাট এক বাড়ি। কলকাতা শহরে এমন বাড়ি আগে দেখেনি সে। ম্যাকিনটশ বার্নের নকশা গায়ে। সামনে বড়ো বড়ো ডোরিক খাম আর পোর্টিকো। যেন গ্রিক স্থাপত্যের কোনও অট্টালিকা। খিলান দেওয়া সিঁড়ি একতলা থেকে উঠেছে দোতলায়। মেঝেতে রংবেরং-এর কাচ। দেওয়ালে সাহেবদের আঁকা বড়ো বড়ো অয়েলপেন্ট। গলায় স্টেথোস্কোপ, গোলগাল মুখের মানুষটি ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্ত। চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি। মুখে মৃদুমৃদু হাসি। কাঠের ফ্রেমে বসানো পিতলের তকমা ধুলোয় ভরা। সেই খুলো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে শিল্পীর নাম খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছিল সে। জড়ানো অক্ষরে লেখা এল জি বার্টন। আর্কাইভের লোকেরা একদিকে দলিল দস্তাবেজ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে, অন্যদিকে নামানো হচ্ছে দামিদামি সব জিনিসপত্র, পিতল আর রুপার বাসন। এগুলো সব যাবে নিলামে। এতে ওর আগ্রহ নেই বিশেষ।

দলিলগুলো বহু পুরাতন। কিছু কিছু প্রায় কলকাতা নগরের পত্তনের সময়কার। সেগুলো খুঁটিয়ে দেখাই ওর কাজ। ধৈর্য ধরে বসে বসে আলাদা করতে হয় পাট্টাপত্র, ইজারা, দানপত্র, ফারখতিপত্র আর ডিক্রিগুলোকে। এগুলোই ভবিষ্যতে ইতিহাস লিখতে কাজে আসবে। এদের ভাষা অদ্ভুত ফারসি আর বাংলা মেশানো। কাজের খাতিরে এই ভাষার সঙ্গে পরিচিত সে। সহজেই আলাদা করে দিতে পারে এক দলিল থেকে অন্য দলিলকে। সাধে কি স্টেট আর্কাইভিস্ট তার উপরে এত ভরসা করেন! দলিলগুলো আলাদা আলাদা করে রাখতে গিয়ে একটা কাগজে চোখ পড়ে গেল তার। কোনও দলিল নয়। চিঠি। তারিখ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চিঠির প্রেরকের নাম দেখেই একটু থমকে গেল। এই প্রিয়নাথ কি সেই প্রিয়নাথ, যিনি 'দারোগার দপ্তর' নামে এক ধারাবাহিক সিরিজ লিখতেন? আগ্রহভরেই চিঠিটা পড়তে লাগল। চিঠিতে লেখা-

মান্যবরেষু ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্ত সমীপে,

মহাশয়,

বহুকাল আমাদিগের কোন যোগাযোগ নাই। আজি হইতে পনেরো বৎসর পূর্বে যে ভয়ানক ঘটনাবলী আমাদিগকে এক বিন্দুতে আনিয়াছিল, সে কারণও বিগত হইয়াছে। নদীতে জোয়ার আসিলে নূতন পলি, পুরাতনকে ঢাকিয়া দেয়। তেমনই গত কয়েক বৎসরে দেশের পরিস্থিতি যা হইয়াছে বা হইতেছে, তাহাতে মহারাণীর জুবিলির পূর্বে ম্যাসন হলে কি হইয়াছিল, তাহা মনে রাখিবার ইচ্ছা বা সুযোগ কাহারও নাই। এখন পত্রপত্রিকায় মোহনবাগান ক্লাবের শিল্ড বিজয় কিংবা ভারতবর্ষের রাজধানী আদৌ দিল্লী শহরে স্থানান্তরিত হইবে কি না, ইত্যাদি লইয়া বচসা চলিতেছে।

কিন্তু যে দায়িত্ব আমাতে অর্পিত হইয়াছিল, আমি পুরাণের দানব অ্যাটলাসের ন্যায় তাহা নিত্য বহন করিয়া চলিতেছি। ভূত হইতে প্রস্তুত সেই অদ্ভুত বড়ি অগ্নিনিরয়, যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে আপনার আবিষ্কার, তাহা এক্ষণে আমার হেপাজতে রহিয়াছে। শুনিয়াছি অগ্নিনিরয়ের জঠরে আবদ্ধ থাকাকালীন

ভূতের কীর্তি কখনই নাশ বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ফলে এই দ্রব্য বহুযুগ বাদেও আপনার সক্রিয়তা দেখাইতে সক্ষম হইবে। আমি চাকুরি হইতে অবসর লইয়াছি। বহুমূত্র রোগ আর হৃদযন্ত্রের নানা অসুখে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি। আজ প্রভাতে কেন জানি না মনে হইল এই ধরাধামে আমি আর বেশিদিন নাই। ফলে এই বৃদ্ধের অন্তিম ইচ্ছা, এই বড়ি তাহার আবিষ্কারকের নিকট ফিরিয়া থাক। তাহাতে সর্বার্থেই সকলের মঙ্গল হইবে।

এই চিঠির সহিত একটি পাণ্ডুলিপি পাঠাইলাম। সেই অভিশপ্ত দিনগুলিতে যাহা ঘটিয়াছিল, যাহা আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতে সত্য, সবই উহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এ পাণ্ডুলিপি এখনই প্রকাশের যোগ্য নহে। আপনি ইহা গোপনে আপনার কুক্ষিগত করিয়া রাখিলে বাধিত হইব। সঠিক সময় আসিলে মহাকাল নিজেই ইহাকে লোকচক্ষুর সম্মুখে আনিবে ইহাই আমার বিশ্বাস। সঙ্গে কাঠের বাক্সটিতে আপনার আবিষ্কৃত অগ্নিনিরয় রহিয়াছে। আমি নিশ্চিত উহাকে আপনি ব্যবহার করিবেন না। সযত্নে লুক্কায়িত রাখিবেন। কিন্তু যদি কোনদিন পুনরায় অগ্নিনিরয় বা ভূত প্রস্তুতের প্রয়োজন পড়ে, ক্লাইভ স্ট্রিটের গোয়েন্দা তারিণীচরণ রায়ের নিকট সেই প্রস্তুতপ্রণালী রহিয়াছে। কিন্তু আপনার দায়িত্ব তাহাকে খুঁজিয়া লওয়া। সম্প্রতি সে কলিকাতা ও গোয়েন্দাগিরি, উভয়ই ত্যাগ করিয়াছে। পরমেশ্বরের কৃপায় আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

ইতি-

শ্রী প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।

পুনঃ- আপনার এককালে সহযোগী ল্যানসন ওরফে লখন এক্ষণে চন্দননগরের বড়বাজারের সন্নিকটে সপরিবারে স্থিত হইয়াছে। উহার নূতন নাম ম্যানুয়েল ডিব্যাসি।

গোটা চিঠিটা ও একবার পড়ল, দুবার পড়ল, বারবার পড়ল। বিশেষ করে শেষ লাইনটা। ওর গোটা ছেলেবেলা চলে এল ওর সামনে। একবার পাশের

বাড়ির পটুদের দুর্গাঠাকুর ছুঁয়ে ফেলেছিল। পল্টুর বাবা ওকে বেধড়ক মারেন। কেউ প্রতিবাদ করেনি। ওর সঙ্গে টিফিন ভাগ করে খেত না কেউ। আড়ালে ফিসফিস করে বলত ট্যাঁশ, বেজন্মা। ওর কোনও বন্ধু নেই। কোনও বন্ধু ছিল না। উচ্চমাধ্যমিকের পরে ও বুঝল এবার সময় এসেছে। এ দেশে সংখ্যাগুরুদের মধ্যে না থাকলে অশেষ দুঃখ। সে ধর্মই হোক, বা রাজনীতি কিংবা যৌনতা। অন্যরকম মানেই খারাপ। একঘরে। বিদ্রুপ। কোর্টে এফিডেভিট করে নাম আর পদবি বদলে নিল। বদলে নিল এই দেশের সংখ্যাগুরুদের মতো। কলেজে তাই নাম বললে কেউ থমকে যেত না। বিস্মিত হত না। তেরছা দৃষ্টিতে তাকাত না।

বাক্সটা দলিলগুলোর সঙ্গেই ছিল। কাঠের বাক্স। তাতে ধাতুর লাইনিং। কোনও চাবির ছিদ্র নেই। খোলার মতো কোনও ঘাট নেই। এই বাক্স পাশাপাশি খুলতে হয়। ও জানে। এককালে এই বাক্সের রহস্য সবার অজ্ঞাত ছিল। ধনীরা গোপন কিছু রাখতে এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করতেন। হাতে পেলেও খোলা যাবে না। ভাঙতে গেলে ভিতরে পাতলা কাচের লাইনিংয়ের মধ্যে তীব্র অ্যাসিড ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু নষ্ট করে দেবে। কিন্তু এখন এই বাক্সের কৌশল জন্মদিনে বাড়ি বাড়ি ম্যাজিক দেখানো ম্যাজিশিয়ানরাও জানেন।

"আচ্ছা, তোমরা এবার একটু ব্রেক নাও। সকাল থেকে একভাবে কাজ করছ তো", ও বাকিদের বলল। কথাটা মিথ্যে নয়। কয়েকশো বছরের পুরোনো দলিল ধুলো ঘেঁটে বার করা, তাদের নম্বর বসানো, অ্যাকুইজিশান ডকেট করা, সবচেয়ে বড়ো ব্যাপার, প্রায় পাঁপড়ের মতো ভঙ্গুর কাগজগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে নজর রাখা। প্যাশন না থাকলে এ জিনিস চরম বিরক্তিকর। সহকারীদের বেশি অনুরোধ করতে হল না। তারা পত্রপাঠ "আধা ঘন্টার মধ্যেই আসছি স্যার" বলে বিদায় নিল। তন্ময় নামে একটা ছেলে নতুন এসেছে। সে-ই ডকেটিং করছিল।

"তুমি যাবে না?"

"হ্যাঁ স্যার, যাচ্ছি। একটা ম্যানুস্ক্রিপ্ট জাতীয় লেখা পেয়েছি। বেশ মোটা। আলাদা আলাদা কাগজে হাতে লেখা। দড়িদিয়ে বাঁধা। এটার ডকেট করছিলাম।"

"করে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ স্যার, অ্যাকুইজিশানে ঢুকিয়ে দিয়েছি।"

ইশশ! কেন আর খানিক আগে ওর চোখে এটা পড়ল না। এ জিনিষ সরকারি আর্কাইভে ঢোকা মানে আবার একশো বছরের স্মৃতির আড়ালে চলে যাওয়া। যা করার তাকেই করতে হবে। এতকাল মাস্টার বারবার যে কথা বলে এসেছেন, যে কথাকে সবাই উড়িয়ে দিয়েছিল গল্পকথা ভেবে, আদতে সে আছে। আছে ওই পাণ্ডুলিপির পাতায়, এই চিঠিতে, ওই বাক্সে। শীতের দুপুরে সোনালি রোদ জড়িয়ে রয়েছে গোটা দত্তবাড়িতে। যা করার দ্রুত করতে হবে। কাঁধের ঝোলাব্যাগে বাক্স আর চিঠিটা ঢুকিয়ে নিল প্রথমে। এবার পরের কাজ। ইনভেনটরির হিসেব লেখার জন্য আজকেই বেশ কয়েক রিম সাদা পাতা কেনা হয়েছিল। প্রয়োজনের অনেক বেশি। পাণ্ডুলিপিটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একদিকের টেবিলে। শেষ পাতাটা দেখা যাচ্ছে শুধু। তাতে লেখা-

...হৃদয়ের এক অনাবিল তাড়নায় এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলাম। জানি না, উচিতকার্য হইল কি না। তবে যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, ভূত আমার আয়ত্তে বিশ্রামে রহিয়াছে, কিন্তু ধ্বংস হয় নাই। আমি ইহাকে ধ্বংসের সপক্ষে ছিলাম, কিন্তু সাইগারসনের পীড়াপীড়িতে ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সর্ববৃহৎ প্রমাণকে নিজ হাতে নষ্ট করিতে পারি নাই। ভূতের মুণ্ড তারিণীর নিকট, ধড় আমার দখলে। এমন ব্যবস্থা করিয়া সাইগারসন দেশে ফিরিয়াছিলেন। ধড়মুণ্ড একত্র হইলে পুনরায় ভূত জাগিবে। কোন দুষ্কৃতকারীর হস্তে তাহা পতিত হইলে তো মহা সর্বনাশ। ভবিষ্যতে যদি

সেই তৃত জাগ্রত হয়, তবে যে ভয়ানক কাণ্ড ঘটিবে তা ভাবিতেই শোণিত শুখাইয়া আসে...

দড়ি খুলে পড়তে শুরু করল সে। যত পড়ছে, মনে হচ্ছে এক অজানা সত্য যেন সদ্য জেগে ওঠা দানবের মতো তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বাড়ির পিছন দিক থেকে গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা ফিরে আসছে। এসে গেলেই সর্বনাশ। প্রথমেই ও গোটা পাণ্ডুলিপিটা ব্যাগে পুরে নিল। প্রথম পাতাটা বাসে। সেই জায়গায় সাজিয়ে দিল নতুন সাদা পাতা। এমনভাবে বেঁধে দিল যে দেখলে কারও সন্দেহ হবে না।

তন্ময় এসে দেখল তাদের কাজের জায়গা থেকে বেশ খানিকটা দূরে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে তাদের ইনচার্জ। কোনও সাড়া নেই। কাঁধের ভারী ব্যাগটা ধুলায় লুটাচ্ছে। চোখেমুখে জলের ছিটা দিতে কোনওমতে উঠে আবার পড়ে গেল সে। খালি পেটে এতক্ষণ কাজে মাথা ঘুরে গেছে বোধহয়। তন্ময় একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা চন্দননগরে পৌঁছে দিতে বলল তাকে। এক অর্থে ভালোই হল। গাড়িতে বসে পাণ্ডুলিপির অনেকটা পড়া হয়ে গেল। এবার খোঁজের পালা।

খোঁজ করতে বেশ কিছুদিন কাটল। ধরা দিয়েও যেন ধরা যাচ্ছে না। সব কিছু পারদের মতো পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। যখন আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, একদিন আনন্দবাজারে ক্লাসিফায়েড কলামে একটা বিজ্ঞাপন দেখে চমকে উঠল সে। তাতে লেখা, "প্রাইভেট ডিটেকটিভ। রে প্রাইভেট আই অ্যান্ড কোং। প্রো: তুর্বসুরায়। ৩৫ ক্লাইভ স্ট্রিট, কলকাতা।"

ওর ঠোঁটে মৃধু একটা হাসি ফুটে উঠল।

চতুর্থ পর্ব- স্নান ধূপের শরীর

অধীশদার বাড়ি ব্রেকফাস্ট খেয়ে পেট ভরে গেছিল। তাই ফিরে, না খেয়েদেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন জাগলাম, তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। মানে উর্ণারা এখনও বাড়ি ফেরেনি। এই সময় একজনকে খুব মিস করছি। বাবাকে। যত দিন যাচ্ছে, বুঝতে পারছি, আমার বাবা সবকিছু জানতেন। শুধু জানতেনই না, আমি যাতে এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ি, তার চেষ্টা করে গেছেন আজীবন। কিন্তু কী কপাল, হয়তো ভাবতেও পারেননি, তাঁর মৃত্যুর পর এমন এক জটিল রহস্যে জড়িয়ে যাব, যার সন্ধান তাঁর কাছে থাকলেও থাকতে পারত। উর্ণার বাবা সেদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, বাবা নাকি গোপনে ব্যান্ডেল চার্চে কিছু গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন। যদি মিথ্যে কথা না বলেন, আর আমার ধারণা যদি খুব ভুল না হয়, তবে এটা তারিণীর সেই ডায়রি আর ছেঁড়া পাতাগুলো। কিন্তু সেগুলো কি এখনও চার্চেই আছে? ঘরে বসে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। একমাত্র উপায় নিজে সেখানে যাওয়া। প্রথমবার আলাপের সময়ই দেবাশিসদা কিছু আন্দাজ করেই আমায় ব্যান্ডেল চার্চের কথা বলেছিলেন। গা ঝাড়াদিয়ে উঠে পড়লাম। দিল্লি রোড ধরে গেলে বড়োজোর ঘন্টা দুই। বিকেল তিনটের মধ্যে পৌঁছে যাব। বেরোবার আগে উর্ণাকে ফোন করলাম। বেজে গেল। আবার করলাম। কেটে দিল। ব্যস্ত? না রাগ করেছে?

মাঝরাস্তায় সামান্য কিছু খাবার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। তাই পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় সাড়ে তিনটে বাজল। বাঁকানো একটা গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। আজ তেমন কোনও অনুষ্ঠান নেই। তাই ভিড় কম। পিছনে বিরাট ফাঁকা মাঠ, একদিকে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। এককালে এখান দিয়েই সব জাহাজ পাল তুলে রওনা দিত ফ্রান্স, ডেনমার্ক, পর্তুগালে। দুরে জুবিলি ব্রিজ। ১৮৮৭ সালে মহারানি

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের গোল্ডেন জুবিলি উপলক্ষ্যে এই ব্রিজ তৈরি হয়েছিল। আর ঠিক দশ বছর পরের ডায়মন্ড জুবিলি নিয়েই তো দেখছি যত সমস্যা।

ভাবতে ভাবতে মেটে লাল রঙের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে গেলাম উপরের দিকে। প্রবেশপথের দরজার উপরেই কোরক ফোটা এক পদ্মফুল। ফুলের উপরে দাঁড় টানা নৌকা। নৌকার বাঁদিকে ক্রুশ, ডানদিকে সামান্য বেঁকে থাকা দাঁড়। মাঝে মেরি মাতা, লেডি অফ দি হ্যাপি ভয়েজ। দেবশীষদার মুখে প্রথমবার এর নাম শোনা। এইরকম মেরির মূর্তি আমি আগে কোথাও দেখিনি। মেরির এক হাত উঠানো, যেন কিছু নির্দেশ করছেন। অন্য হাতে শিশু যিশুকে কোলে ধরা। এক পাশ করে। যিশুর দুই হাতের আঙুল সেই একইদিকে নির্দেশ করছে। ভিতরে ঢুকে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। বাইরে থেকে বোঝা যায় না ভিতরে এতগুলো গলি। কোথায় যাব, কিছুই বুঝতে পারছি না। চার্চের কর্মীদের দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তাঁরা আমায় বিশেষ গা করছেন না। একজনকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, আমি একটু প্রয়োজনে এসেছি। আর্চবিশপ আছেন?"

আর্চবিশপ অফ কলকাতা যে প্রায়ই এখানে আসেন সেটা খবর নিয়ে নিয়েছিলাম গুগলে। বাকিটা কপাল ঠুকে মেরে দিলাম। যদি ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ে। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের ভুরু কুঁচকে গেল।

"আর্চবিশপের সঙ্গে আপনার কী দরকার?"

মিথ্যে বললাম। "আমার বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তিনি চার্চে একটা বড়ো ডোনেশন করতে বলেছিলেন।"

"কিন্তু ডোনেশনের ব্যাপারে আপনি আমার সঙ্গেই কথা বলতে পারেন। আর্চবিশপকে কী দরকার?"

"সে জানি। কিন্তু উনি মারা যাবার আগে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন। সেটা পারসোনালি ওঁকেই হাতে হাতে দেবার নির্দেশ আছে। বাবার শেষ ইচ্ছে..."

“আচ্ছা। আপনি এখানে একটু দাঁড়ান। আমি বিশপের সঙ্গে কথা বলে আসছি।”

বুঝলাম ওষুধে কাজ হয়েছে। কোনটা অবশ্য বলতে পারব না। ডোনেশন, নাকি বাবার ইচ্ছে?

“অবশ্যই। আর শুনুন, আমার বাবা খুব সম্ভবত বিশপের চেনা ছিলেন। নামটা বলবেন। বিরূপাক্ষ রায়। আমি তাঁর ছেলে তুর্বসু রায়।”

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে-টেড়ে চলে গেলেন।

প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল। ভদ্রলোক আর আসেনই না। আমিও অন্য কোথাও যেতেও পারছি না। এদিকে ভিড় বাড়ছে অল্প অল্প। ছেলেমেয়েরা আসছে জোড়ায় জোড়ায়। বাগানে ঘুরছে। যিশুর মূর্তির সামনে মোমবাতি জ্বালাচ্ছে। এইসব ঝামেলা মিটুক, একদিন উর্ণাকে নিয়ে এখানে ঘুরতে আসতে হবে।

“এই যে... এই যে স্যার। এদিকে আসুন। আর্চবিশপ তাঁর কামরায় আপনাকে ডাকছেন”, দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন ভদ্রলোক।

বিরাট সেগুন কাঠের দরজা। ভাতে নানারকম নকশা আঁকা। এত চকচকে, দেখলেই বোঝা যায় রোজ পরিষ্কার করা হয়। পিতলের তবকে আর্চবিশপের নাম লেখা। টমাস ডি’সুজা। দরজার হাতল দেখলে মনে হয় যেন সোনা। ভদ্রলোক দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে একটা বাও মতো করে দাঁড়ালেন। আমিও দেখাদেখি তাই করলাম। দেখলাম সামনে বসে আছেন হাসিমুখ, সাদা চুলের এক ভদ্রলোক। বড়ো অমায়িক চেহারা। তিনি আমার সঙ্গীকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারপর ভাঙা বাংলা ইংরাজি মিশিয়ে আমায় বললেন, “দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।”

আমি সামনের চেয়ারে বসতে খুব খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন আমায়। মুখে কোনও কথা নেই। আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। খানিক বাদে উনিই প্রথম কথা

বললেন, "আশ্চর্য! অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ। তুমি যে বিরূপাক্ষর ছেলে তা আর বলে দিতে হয় না। দাও কী চিঠি দেবে বলছিলে?"

"আমার ক্ষমা করবেন। এই মিথ্যেটা না বললে আমাকে আপনার কাছে আসতে দিত না হয়তো। আপনার সঙ্গে আমার খুব প্রয়োজন।"

মৃদু হাসলেন বিশপ। "ঈশ্বরের বাড়িতে মিথ্যে বলা পাপ। যাই হোক, প্রয়োজনটা বলো।"

"আপনি আমার বাবাকে চিনতেন?"

"খুব ভালোভাবে। তোমার বাবাদের একটা এনজিও ছিল। নীবার নাম। এককালে খুব অ্যাক্টিভ ছিল। আমাদের চার্চের সঙ্গে কাজ করত। তারপর যেমন হয়, নীবারের নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বাধল। আমরাও দূরে সরে এলাম।"

"ঝামেলাটা ঠিক কী নিয়ে?"

"সঠিক তো জানি না। তবে যেমন হয় সব সংগঠনে, তেমনই কিছু একটা। পুরাতনপন্থী বনাম নব্যপন্থী। তোমার বাবা পুরাতনপন্থীদের দলে ছিলেন।"

"এদের কথা বিশেষ কেউ জানে না কেন?"

"বেশিরভাগ খ্রিস্টান পরোপকারী সমিতিরাই নিজেদের আড়ালে রাখতে চায়। তবে এদের অন্য কোনও কারণ ছিল। এরা নিজেরা কখনোই সামনে আসত না। পরে শুনেছি, এঁদের অনেকে ছিলেন ম্যাসনিক ব্রাদারহুডের সদস্য। ম্যাসনদের সঙ্গে আমাদের আদর্শের তফাত আছে। আমরা তাই নীবারের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করি।"

"নীবার কবেকার সংগঠন?

"বহু পুরাতন। ওরা তো বলে ওদের জন্ম একশো বছরেরও বেশি আগে। তবে হ্যাঁ, মূলত হুগলি জেলাতেই এদের বাড়বাড়ন্ত। অন্য কোথাও এদের শাখা আছে বলে জানি না।"

"এটা কি কোনও গুপ্ত সমিতি?"

“কাইন্ড অফ। কিন্তু এদের রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি আছে। এনজিও-দের মতো নানা কাজও করে। কিন্তু যাকে বলে মেম্বারশিপ ড্রাইভ, সেটা এদের হয় না।”

“নীবারের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও আমার বাবার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক তো ছিল...”

“তা ছিল। তবে সেটা একেবারেই ব্যক্তিগত। আমি যখন বাগডোগরার বিশপ ছিলাম, তোমার বাবা নকশালবাড়িতে পোস্টিং ছিলেন। তখন থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা। আমৃত্যু সে ঘনিষ্ঠতা বজায় ছিল।“

“কয়েক বছর আগে বাবা একবার আপনার কাছে এসেছিলেন। কিছু একটা জমা রাখতে।”

এতক্ষণ আর্চবিশপ বেশ হাসি হাসি মুখেই কথা বলছিলেন। এবার যেন একটু গম্ভীর হলেন। “তুমি জানতে পেরেছ? কীভাবে?”

“বাবার উপরে আক্রমণ হয়েছিল। কীসের জন্য জানি না। তবে যারা হামলা করেছিল, তারা কিছু খুঁজছিল। তাদের হাত থেকে বাঁচতেই বাবা নিশীথ দত্তের বাড়িভাড়া নিয়ে থাকেন। উনি বাবার বন্ধু। নীবারের সদস্য। ওঁর থেকেই জানতে পেরেছি।”

“কিন্তু...” বিশপের মুখে এবার চিন্তার ছায়া, “আমাকে তো অন্য কিছু বলেছিলেন তিনি। সেই শেষবার আমার সঙ্গে দেখা। চার্চে একটা পুরোনো টেবিল ডোনেট করেছিলেন। তাঁর ঠাকুর্দার আমলের। সঙ্গে আমাকে একটা প্যাকেট ধরিয়ে বললেন, এই জিনিসের অধিকার শুধু আমার ছেলের। কিন্তু কোনও দিন যদি সে কিছু চাইতে আসে, তবে বুঝতে হবে সে ভয়ানক বিপদে পড়েছে। আমি যেন সাধ্যমতো তাকে সাহায্য করি। সত্যি কথা বলো মাই সন, সবকিছু ঠিক আছে তো?”

“ঠিক নেই ফাদার। কিন্তু আমি সত্যিই জানি না বিপদের ধরনটা কেমন। তবে কথা দিলাম, সাহায্যের দরকার হলে আমি অবশ্যই আপনার কাছে আসব।”

বিশপ খানিক শান্তভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর একটা কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "তোমায় আমি জোর করব না। সময় এলে প্রভু নিজেই তোমায় দিয়ে যা উচিত তা করিয়ে নেবেন। এই দ্যাখো না, আজ সকালেই আমার এখান থেকে ভ্যাটিক্যানে চলে যাবার কথা। এক মাসের জন্য। শেষ মুহূর্তে ফ্লাইট ক্যানসেল হয়েছে। তাই যাওয়াও দুইদিন পিছিয়ে গেল। সকাল থেকে এতক্ষণ ভাবছিলাম, কেন এমন হল? এখন বুঝেছি। হয়তো প্রভু যিশু চাইছিলেন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোক। তুমি তোমার বাবার রক্ষিত সম্পদ নিয়ে যাও। তবে হ্যাঁ, তোমাকে কোনও সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের এক কোণের একটা সিন্দুক খুলে ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট বার করে দিলেন বিশপ। প্যাকেটে গালা দিয়ে সিল করা।

আমার হাত কাঁপছিল। "এটা খুলে দেখতে পারি?"

বিশপ মুখে কিছু না বলে ইংরাজিতে যাকে বলে শ্রাগ, তাই করলেন। কাগজের প্যাকেট। ছিঁড়ে ফেলতে সময় লাগল না। ভিতরে কী আছে দেখতে যাব, শেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন বিশপ, "ভিতরে যাই থাক, একে সাবধানে হ্যান্ডল কোরো। এর খোঁজে আগেও এখানে লোক এসেছিল।"

আমি মাঝপথে থেমে গেলাম। "কে এসেছিল?"

"জানি না। তবে আমার সহযোগীরা জানিয়েছে বিরূপাক্ষ এখানে কবে এসেছিল, কেন এসেছিল, এইসব নিয়ে একাধিক লোক জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কেউ আমি অবধি পৌঁছাতে পারেনি। এক তুমিই পারলে। তাও বিরূপাক্ষের ছেলে বলে।"

আমি ততক্ষণে ভিতরের জিনিস বার করে ফেলেছি। কিন্তু এ তো কোনও ডায়রি বা ছেঁড়া পাতা না। কালো চামড়ায় মোড়া একটা বাইবেল। স্পাইনে সোনারজলে লেখা, হোলি বাইবেল। কে জে ভি। মানে, কিং জেমস ভার্সান।

১৬১১ সালে রাজা ষষ্ঠ জেমস সাধারণের পাঠ্য ইংরাজিতে এই বাইবেল অনুবাদ করিয়েছিলেন। কিন্তু এই বই দিয়ে আমি কী করব? সঙ্গে আর-একটা লাল চামড়া বাঁধানো চটি বই। ১৮৯০ সালে ছাপা, লংম্যান, গ্রিনঅ্যান্ড কোং থেকে। এর গল্পও আমার পড়া। বইয়ের নাম, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, রবার্ট লুই স্টিভেনসনের লেখা। কিন্তু যার জন্য আসা, সেটা কোথায়? তারিণীর ডায়রি?

আর্চবিশপ বোধহয় আমার হতভম্ব ভাবটা বুঝতে পেরেছিলেন। মৃদুহেসে বললেন, "আর যাই হোক, প্যাকেটে বাইবেল আশা করোনি, তাই তো? কিন্তু কী বলো তো, মন দিয়ে পড়ে দ্যাখো। বাইবেলেই জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে। তোমাকে শুধু খুঁজে নিতে হবে। তোমার বাবা এটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, আমার ছেলে যদি সত্যিই তারিণীচরণ রায়ের বংশধর হয়, তবে সে বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চাইছি।"

বাইবেলের পাতা ওলটাতেই দেখি, শুরুতেই বাবার হাতের লেখা। গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লিখেছেন, "লেডি অফ দ্য হ্যাপি ভয়েজকে অনুসরণ করো। উনিই পথ দেখাবেন।" মানে কী এর? মাথা তুলতেই মেরি আর যিশুর সেই ছবি চোখে পড়ল। নৌকায় দাঁড়ানো। দুটো আঙুল বাইরে দরজার দিকে নির্দেশ করছে। আমি ঘোর লাগা মানুষের মতো উঠে দাঁড়ালাম। আর্চবিশপকে কোনওমতে বাও করেই বেরিয়ে এলাম বাইরে। বাইরের দেওয়ালে আবার এক ছবি। এবার ফ্রেস্কো। কিন্তু আঙুল এবার নির্দেশ করছে ডাইনে। ডাইনে এক পাদ্রির মূর্তি। জোয়াও দ্য ক্রুজ। এর কথাও দেবাশিসদার মুখে শুনেছি। বাঁ হাতে এক শিশুকে কোলে নিয়ে আছেন তিনি। ডান হাত মেরি মাতার অন্য এক মূর্তির দিকে নির্দেশ করছে। এই প্রথমবার আমি খেয়াল করলাম মা মেরির হাতের দুটো আঙুল তোলা, শিশু যিশুর এক হাতের দুই আঙুল তোলা, অন্য হাতে তিন মাথা ক্রুশ। দুই যোগ দুই যোগ তিন। সাত। ডিভাইন নাম্বার। পরের বাঁকে আবার একটা মূর্তি, কাচে ঢাকা। যেন স্বয়ং মা মেরি আমাকে দিক দেখাতে

দেখাতে নিয়ে চলছেন। একেবারে শেষে প্রার্থনা হলের সামনে এসে অন্যরকম একটা মূর্তি দেখলাম। আবার মেরি আর যিশু। কিন্তু এখানে দুজনেই নির্দেশ করছেন মাটির দিকে, মেঝের দিকে। মেঝেতে কিছু নেই। শুধু আছে একটা প্রণামী রাখার বাক্স। কিন্তু সেটা না। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম বাক্সটা যে টেবিলে রাখা, সেই টেবিলটার দিকে। টেবিলের কারুকার্য আমার খুব চেনা। আমি দেখেছি। কিন্তু কোনও টেবিলে না। চেয়ারে। আমার অফিসের চেয়ারে। চিপ্যানডেল ডিরেকটরে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল। ড্রিসকল সাহেবের সেই ইনভেনটরি অনুযায়ী শুধু চেয়ার না, দুটো টেবিলও পেয়েছিল তারিণী। অফিসে তো কেবল একটা আছে। সেটা সাধারণ। এটা নিশ্চিত ডিরেক্টরের জোড়াটা। এটার অস্তিত্বের কথা এতদিন জানতাম না পর্যন্ত!

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। এদিকটায় ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। ধীর পায়ে চলে গেলাম প্রণামীর বাক্সের সামনে। আমি নিশ্চিত, এই টেবিলটার কথাই আর্চবিশপ বলছিলেন। টেবিলের কাজ করা অংশ অবিকল আমার চেয়ারটার মতো। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করতে করতে ফুলটাকে দেখতে পেলাম। মাঝে ফুল। চারদিকে লতাপাতা। এই ফুল আমার চেনা। একটু নিচু হয়ে আলগোছে ফুলের ঠিক মাঝে চাপ দিতেই খট করে পান্না খুলে হাতে একটা প্ল্যাস্টিক জড়ানো প্যাকেট এসে পড়ল। দেখেই বুঝলাম পুরোনো কোনও কাগজপত্র আছে এতে। পরে খুলে দেখা যাবে। চট করে ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলে ডালাটা আটকে দিলাম।

এবার? হ্যাঁ, ওই ডাক্তার জেকিলের বইটা। ওটা কেন? এদিকে বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হতে চলেছে। একদল খ্রিস্টান ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করছেন। তাদেরই একপাশে বসে আমি ডাক্তার জেকিলের চটি বইটা খুলে বসলাম। ছোটো নভেলা। সঙ্গে আরও দশ পাতার এক ভূমিকা। আগাগোড়া খুঁজে দেখলাম। বাইবেলের মতো কোথাও কোনও নির্দেশ নেই। কিন্তু এই বই

যখন এত যত্নে এখানে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, নিশ্চয়ই তার কোনও কারণ আছে। সেকেন্ড হ্যান্ড বই। গোটা বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় দাগ মারা। নীল পেনসিল দিয়ে। শুধু ভূমিকায় কয়েক লাইন লাল পেনসিলে দাগানো। সেখানে লেখা-

Eventually, the brew began to run out, and Jekyll was unable to find a key ingredient to make more. His ability to change back from Hyde into Jekyll slowly vanished. Jekyll writes that even as he composes his letter, he knows that he will soon become Hyde permanently, and he wonders if Hyde will face execution for his crimes or choose to kill himself. The potion became the brew of Hyde's ultimate transformation.

ঠিক তার পাশেই বাবার হাতের লেখা ছোট্ট একটা নোট। এত ছোটো যে প্রথমবার খেয়ালই করিনি। এবার আমি বুঝেছি কেন এই বই আমার জন্য রাখা হয়েছে।

"আপনি তুর্বসু রায় তো?"

কাঁধে হাত পড়তে চমকে ফিরে তাকালাম। দুজন মুশকো লোক আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে।

"বলুন?"

"আমরা লালবাজার ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে আসছি। দেবাশিস গুহের খুনের ব্যাপারে।" বলেই আইডি কার্ড বার করে দেখালেন। "আমাদের আইজি সুকল্যাণ মিত্র আপনাকে ডেকেছেন। জরুরি দরকার। আপনাকে এখুনি আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

স্বপ্নাদিষ্টের মতো হেঁটে হেঁটে পুলিশের জিপে উঠলাম। আমার বাইক আর একজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে যাবে। গাড়িতে বসে আছি। পুলিশ দুজন চুপ। আমিও কথা বলার অবস্থায় নেই। পিঠের ব্যাকপ্যাক পাশে রাখা। হাতে স্টিভেনসনের

নভেলাটা, যার ভিতরে এখনও বাবার হাতের লেখায় জ্বলজ্বল করছে, “Brew of Hyde’s Ultimate Transformation= **B.H.U.T.**”

পঞ্চম পর্ব- জনবিরল গভীর বাতাস

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুপুর পেরিয়ে গেল অপর্ণার। উর্ণাদের সঙ্গে থানায় গেছিল। ভেবেছিল আরও খানিক থাকবে। কিন্তু কাল প্রায় সারারাত জাগা। সকাল থেকে তেমনভাবে কিছু খাওয়া হয়নি। পেট গুলিয়ে বমি শুরু হল। ঊর্ণা আর তার মা মিলে একরকম জোর করেই বাড়ি পাঠিয়ে দিল তাকে। সুতনু ওকে পৌঁছে দিয়ে নিজে অফিস চলে গেছে। সল্টলেকের এই গোটা ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তে অপর্ণা একা। নিশীথ দত্তকে পুলিশ ধরেছে। তাও আবার যে সে পুলিশ না, অমিতাভ মুখার্জি। আজ থানায় গিয়ে ভেবেছিল অমিতাভর দেখা পাবে। পায়নি। একবার কল করে নেবে? চেনা নম্বরটা ডায়াল করল অপর্ণা। ফোন বেজে চলেছে। যে নিশীথ দত্তের জন্য ফোন করা, সেই লোকটা দুঃখ ছাড়া কিছু এনে দেয়নি তার পরিবারে। মা তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বাবা কিচ্ছুটি করতে পারেননি। তারপরেও যখন নীবারের দরকার হয়েছে, তার বাবাকে ব্যবহার করেছে। কলকাতা ছেড়ে চন্দননগরে প্রতি মাসে বাবাকে যেতে হত নীবারের সভায়। মেনে চলতে হত নিশীথ দত্তের প্রতিটা নির্দেশ। এককালে বাবাকে এই নিয়ে প্রশ্ন করত। প্রতিবাদ করত। একসময় বুঝে গেছিল এসবে লাভ হবে না। নীবারের সূত্রেই দেবাশিসের সঙ্গে আলাপ। প্রথমে ভেবেছিল এতদিনে সুখের দিন শুরু হল। কিন্তু....

বাজতে বাজতে কেটে যাবার ঠিক আগে ফোনটা ধরল অমিতাভ।

“বলুন বউদি।”

অমিতাভ এখনও তাকে দেবাশিসের বউ বলেই ভাবে।

"আমি নিশীথ দত্তদের বাড়ি গেছিলাম। আমাকে মা ফোন করেছিল। সব শুনলাম।"

ওদিকে চুপ।

"আমি শিওর নিশীথ দত্ত খুন করতে পারে না। ওর সেই গাটস নেই। ও অন্যের বউ ভাগাতে পারে। কিন্তু খুন ওকে দিয়ে হবে না।"

"কিন্তু ফুটেজ?"

"আমি ফুটেজের কথা শুনলাম। কিন্তু বাড়ির পিছনেও তো একটা দরজা ছিল। আমি শেষবার যখন গেলাম, দেখি বাথরুম রিনোভেট হচ্ছে। কী হচ্ছিল জানি না। তুমি প্লিজ ওদিকটা আর-একবার দ্যাখো। দেবাশিস শক্তসমর্থ লোক ছিল। ওকে কাবু করা নিশীথ দত্তের কাজ না।"

"হুমম। আপনি এটা আর কাউকে বলেছেন?"

"নাহ, তোমাকেই বললাম। আর ও হ্যাঁ, ওই তুর্বসু নামের ছেলেটাকে বলেছি।"

"ও.কে..."

খানিকক্ষণ দুই পক্ষই চুপ। প্রথম কথা বলল অপর্ণাই।

"কী বুঝছ অমিতাভ? চেনা কেউ?"

"সেটার সম্ভাবনাই বেশি। নীবারের কাজের জন্য দেবাশিসদা অনেক ভুলভাল জায়গায় ঘুরতেন। ঠিক কী করতেন জানি না। জানার চেষ্টা করছি।"

"তুর্বসুকে তোমার কেমন মনে হয়?"

"বুঝতে পারছি না। ছেলেটা হয় একেবারে বোকা, নয় চরম সেয়ানা।"

"আমার তো ভালো বলেই মনে হল। মানে আপাতদৃষ্টিতে।"

"শুনুন বউদি, আমার ধারণা দেবাশিসদার খুনিকে ও সামহাউ চেনে। এটা আমার বিশ্বাস। মে বি বুঝতে পারছে না। সেইজন্যেই আমি ওকে সব জায়গায় নিয়ে ঘোরাচ্ছি। দেবাশিসদা প্রচণ্ড বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। খুব ভেবেচিন্তেই উনি

'তুর্বসু জানে' লিখে গেছেন। ভেবে দেখুন বউদি, প্র্যাকটিক্যালি ওটাই ওঁর শেষ কথা।"

"আমি ইনসিস্ট করছি না, কিন্তু বাই এনিচান্স তুর্বসু কি....."

"খুনি কি না? আমি কোনও চান্সই ছেড়ে দিচ্ছি না, তবে গাঁট ফিলিং বলছে হবে না।"

"নিশীথ দত্তের বেলায় আমার সেম ফিলিং হচ্ছে। আর যদি সেটাই হয়, তবে..." অপর্ণা চুপ করে গেল।

"হ্যাঁ। সেই আননোন ফ্যাক্টর। এক্স। যাকে কেউ দেখেনি, যাকে কেউ চেনে না, শুধু নাম শুনেছে। তাও ছদ্মনাম।"

"বাসু। বাসুকী", বলতে গিয়ে অজান্তেই গলাটা যেন কেঁপে গেল অপর্ণার।

"হ্যাঁ। খুব সম্ভব দেবাশিসদার হেঞ্চম্যান। আপনি বলায় একটা নতুন পয়েন্ট আমার মাথায় এল। সিসিটিভির ফুটেজে আমাকে, তুর্বসুকে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করতে দেখা গেছে। কিন্তু এই লোকটাকে না। সে হয়তো পিছন দিয়েই আসত। চলে যেত। কিন্তু মজার ব্যাপার কী জানেন, দেবাশিসদা মারা যাবার পরে লোকটা যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। যে কটা ক্লুরেখে গেছিল সেগুলোও মিটিয়ে ফেলছে একে একে। এখন তো একেবারে ছায়া হয়ে গেছে লোকটা। আসলে...'

"থাক অমিতাভ, আমার আর শুনতে ভালো লাগছে না। তুমি তো জানো....."

"আয়্যাম সরি বউদি। কিন্তু আপনি কি শিওর, একে দিয়েই আপনার সঙ্গে সেদিন দেবাশিসদা অমন করিয়েছিলেন?"

"আর কে হবে বলো? ওর বন্ধু বা কাছের লোক খুব বেশি ছিল না। তুমি ছিলে। তুর্বসু আমাদের বাড়ি যাতায়াত করত সেটা দেবাশিস মারা যাবার পরে শুনলাম। আর সেই বাসু।"

"নীবারের অন্য কেউ?"

“নীবার একটা বন্ধ কুঠুরির মতো। ওর ভিতরে ঠিক কী হয় কেউ জানে না। বিশেষ করে মহিলারা। ওরা ম্যাসনিক ব্রাদারহুড ভেঙে এসেছে, জানো তো। মহিলাদের কোনও স্থান নেই ওখানে।”

“কিন্তু দেবাশিসদা যে বেশ্যা আর হিজড়াদের সঙ্গে এত কাজ করতেন!”

“এটা আমাকেও জানতে হবে। এতদিন ভেবেছিলাম এড়িয়ে থাকব। এখন আর থাকা যাচ্ছে না।”

“কোথা থেকে জানবেন?”

“আমার মাফ করো অমিতাভ। আমি বলতে পারব না। আমি চিরকাল তোমার কাছে তোমার দেবাশিসদার বউ। এখনও তাই। বউদি বলেই ডেকে যাচ্ছ। আমার সঙ্গে যখন চরম অন্যায় হল, তখন তুমিই বলেছিলে চেপে যেতে, কারণ দেবাশিসের যাতে কোনও ক্ষতি না হয়। তুমি এখনও যে এত দৌড়াদৌড়ি করছ, তার একটাই কারণ, দেবাশিস মারা গেছে। তোমার লয়ালটি দেবাশিসের কাছে। আমার কাছে না। আমি তোমাকে সব বলতে বাধ্য নই।”

ফোন কেটে দিল অপর্ণা। রাগে কান মাথা গরম হয়ে গেছে। ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে ঠান্ডা জল নিয়ে খেল। পাখা চালিয়ে বসে থাকল খানিক। শরীরের আইটাই ভাবটা একটু কমল এতে। সব রাগ অমিতাভর উপরে গিয়ে পড়ল। দরকার ছিল না।

দ্বিতীয় ফোনটা করার আগে প্রায় মিনিট পনেরো নম্বরটার দিকে তাকিয়ে রইল অপর্ণা। সে ছোটোবেলা থেকে জানে, এই নম্বরের ওপারে যিনি আছেন তিনি সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তার বাবা আমৃত্যু এই মানুষটাকে শ্রদ্ধা করে গেছেন। সে শ্রদ্ধা এতই বেশি যে, তাকে ভয় বললে খুব বেশি ভুল হয় না। একই ঘটনা ঘটত দেবাশিসের বেলায়। ও দেখেছে এই নম্বর থেকে ফোন এলেই দেবাশিস কেমন একটা অ্যাটেনশন মোডে চলে যেত। বসা থেকে দাঁড়িয়ে পড়ত। অনেকসময় ঘরের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কথা বলে ফিরে আসত। অবস্থাটা বদলাতে থাকে বিয়ের বছর দু-একের মধ্যে থেকে। অপর্ণা দেখেছে, এই নম্বর

থেকে ফোন এলে দেবাশিস ধরছে না। কেটে দিচ্ছে। অপর্ণা নিজে কোনও দিন একে দেখেনি, শুধু গোপনে দেবাশিসের মোবাইল থেকে এর নম্বরটা নিজের মোবাইলে সেভ করে নিয়েছিল। কিছু ভাবনাচিন্তা না করে। এমনিই। এই নম্বরের মালিকের নাম সে জানে না। তাই যে নামে দেবাশিস সেভ করেছিল, সেই নামেই তার মোবাইলে নম্বরটা জ্বলজ্বল করছে। 'মাস্টার'। আরও মিনিট পাঁচেক ভেবে নম্বরটা ডায়াল করল অপর্ণা। ঠিক দুবার রিং হবার পরেই ফোনটা ধরল এক গম্ভীর গলার পুরুষ। গলা শুনে মনে হয় ভদ্রলোক প্রৌঢ়। অপর্ণা ফোনের রেকর্ডারটা অন করে দিল।

"বলো।"

অপর্ণা একটু চমকে গেল। ভদ্রলোক কি তার নম্বর চেনেন?

"আমি.... আমি অপর্ণা বলছি। অ্যালিস অপর্ণা। ফার্গাস অ্যাভেরির মেয়ে।"

"সেটা আগেই বুঝেছি। বলো কী বলতে চাও? ফোন করেছ কেন?"

"নিশীথ দত্তকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।"

"জানি। তবে ধরে রাখতে পারেনি। পাঁচ মিনিট আগে জামিন পেয়ে গেছে। তুমি এইজন্যে ফোন করেছ?"

অপর্ণা দেখল তার মোবাইলে একটা কল ওয়েটিং দেখাচ্ছে। উর্ণার নম্বর। কারণটা বুঝতে পারল অপর্ণা।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করার ছিল।"

"বলো।"

"দেবাশিসের সঙ্গে নীবারের সমস্যাটা ঠিক কোথায় হয়েছিল?"

"ও তোমায় বলেনি?"

"না। নীবারের ব্যাপারে বাড়িতে কোনও আলোচনাই হত না। বাবাও করতেন না। দেবাশিসও না। তবে আন্দাজ করতে পারছিলাম কিছু একটা সমস্যা চলছে।"

“দেবাশিস নীবারের মূল নীতি থেকে এই হয়েছিল। তাই ওকে বহিষ্কার করা হয়। এতে ও রেগে গিয়ে এমন কিছু করে, যার পরিণামে আজ ওর এই দশা। ও শয়তানকে নিজের সঙ্গী বানিয়েছিল...” ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, ফোনে তাঁর গলা চড়ছে।

“কে শয়তান? বাসু?”

“তুমি বাসুকে চেনো?”

“চিনি না। নাম শুনেছি। দুই-একবার। দেবাশিসের মুখেই।”

“সবাই তাই শুনেছে। কেউ তাকে দেখেনি। তবে আমি বাসুর কথা বলছি না।”

“তাহলে?”

ভদ্রলোক যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। একেবারে ঠান্ডাগলায় কাটা কাটা উচ্চারণে বললেন, “শোনো অ্যালিস অপর্ণা, তোমায় এখন যা বলছি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমি এবার ফোনটা কাটব। কাটার সঙ্গে সঙ্গে পরের ফোনটা করবে তোমার স্বামীকে। ও আধঘণ্টা আগে অফিস পৌঁছে গেছে। ওকে ফোন করে বলবে তোমার শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছে না। তুমি ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছ।”

“কিন্তু আমার ডাক্তার তো....”

“দিল্লি গেছেন। তাই তো? সুতনু তোমাকে ঠিক এই প্রশ্নটাই করবে। তুমি বলবে, তুমি রাসবিহারীতে ডাক্তার অশোক মল্লিকের ‘ব্লু ফ্লাওয়ার’ নার্সিং হোমে যাচ্ছ। ও যেন ফেরার সময় ওখান থেকেই তোমাকে পিক আপ করে। তাড়াহুড়ো করে আগে আসার দরকার নেই। তারপর তুমি সোজা নিচে নেমে এসো। নিচে একটা উবের দাঁড়িয়ে আছে। সেটাতে উঠে চলে যাও। ওখানে তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।”

অপর্ণার হাত পা কাঁপছিল। কারা এরা? প্রতি মুহূর্তে অনুসরণ করছে তার প্রতিটা নড়াচড়া! অপর্ণাকে চুপ থাকতে দেখে আবার সেই গম্ভীর গলা বলে উঠল, "সময়বেশি নেই। তাড়াতাড়ি নেমে এসো।"

ষষ্ঠ পর্ব- সিন্ধুর রাত্রির জল

সাদা স্করপিওটা যখন লালবাজারের মেন গেটের চেকিং-এর সামনে পৌঁছাল, তখন খেয়াল হল, এই আমার প্রথম লালবাজারে আসা। সঙ্গের পুলিশদের মধ্যে একজন মুখ বাড়িয়ে "স্টাফ" বলে আই কার্ড দেখানোতে গেট খুলে গেল। ঢুকতে ঢুকতে মনে পড়ল, এখানেই না এককালে প্রিয়নাথ দারোগার পোস্টিং ছিল! হয়তো আমার মতো একদিন তারিণীচরণও এসেছিল এই ভবনে। গাড়ি এসে থামল মাঝের বিরাট চত্বরে। অন্ধকার হয়ে এসেছে। তবু বেশ বুঝতে পারছি চারিদিকে আমায় ঘিরে রয়েছে কলকাতার কলোনিয়াল যুগের বিরাট এক ইমারত। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে আছে। ঠিক এই কেসটার মতো। মুক্তি কোথায়? জানা নেই। বাঁদিকে বেঁকে সোজা উপরে দোতলার সিঁড়ি। তারপর আবার বারান্দা। সেই বারান্দার একেবারে শেষে বিরাট কাঠের দরজাওয়ালা এক রুমের সামনে আমাকে নিয়ে হাজির করল আমার দুই সঙ্গী। দরজায় পিতলের ফলকে লেখা, "সুকল্যাণ মিত্র, ইনস্পেকটর জেনারেল অফ পুলিশ"। সামনে পিয়ন বসে। একজন তাকে কী যেন একটা বলল। শুনতে পেলাম না। ঘরে ঢুকে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে বলল, "স্যার আপনাদের ডাকছেন।"

বিরাট বড়ো ঘর। একদিকে সেক্রেটারিয়েট টেবিল পাতা। সামনে চেয়ার আছে বেশ কয়েকটা। কিন্তু ওদিকে কেউ নেই। সাদা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা গোলগাল হাসিমুখ এক প্রৌঢ় বসে আছেন চেয়ার টেবিলের ঠিক উলটো দিকের কৌচে। সামনে একটা ছোটো কফি টেবিল। আমাকে দেখেই সামান্য

হেসে বললেন "এসো, এসো। তুমি দেখি একেবারে বাচ্চা ছেলে। আমার ছেলের বয়সি। তাই তুমি করেই বললাম। অসুবিধা নেই তো?"

"না স্যার, ইটস ওকে।"

শুরুতেই আলোচনাটায় একটা ইনফরমাল টোন এনে আমায় অনেকটা সহজ করে দিলেন ভদ্রলোক। প্রথম দেখাতেই ভদ্রলোককে ভালো লাগতে শুরু করেছে। কিন্তু আমায় কেন ডাকা হল, না জানলে শান্তি পাচ্ছি না।

"সুমন, তোমরা যাও এখন। আর হ্যাঁ, বাইরে প্রহ্লাদকে বলে যাও দুটো কফিপাঠাতে", বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "কফি চলে তো?"

না বলার প্রশ্নই নেই। পড়েছি পুলিশের হাতে, কফি খেতে হবে সাথে।

দুজন চলে যাবার পর ভদ্রলোক আমাকে পাশে বসালেন। ওঁর অন্যপাশে প্রচুর ফাইলপত্র আর ব্রাউন কাগজে মোড়া খাম। তাদেরই একটা থেকে এক টুকরো কাগজ হাতে তুলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুর্বসু রায়। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ক্লাইভ স্ট্রিটে অফিস। ডিভোর্সের কাজ করা হয় মূলত। গোয়েন্দাগিরি ছাড়া আর কী করা হয়?"

"কিছু না। এটাই করি।"

"স্ট্রেঞ্জ! তাতে যা হয়, সেই আয়ে চলে যায়?"

"একা মানুষ। বাবা সামান্য কিছু রেখে গেছিলেন ব্যাংকে, সেখান থেকে সুদ পাই মাসে মাসে।"

"ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছ। যাদবপুর? তাই তো? আমার ছেলেও পড়েছিল। সিভিল। এখন বিদেশে। ও তোমার চেয়ে সামান্য বড়োই হবে।"

এসব আলোচনা করতে নিশ্চিত আমাকে ডাকা হয়নি। ভদ্রলোক 'আইস ব্রেক' করছেন। আমাকে সহজ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এটা তখনই হয়, যখন এর ঠিক পরেই কোনও বড়ো ধাক্কা আসে। আমি ধাক্কার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ভদ্রলোক এবার খাম খুলে কতগুলো ফটো বার করলেন। বললেন, "একটা খুব দরকারি কাজে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। তোমার সাহায্য লাগবে। তোমাকে কতগুলো ছবি দেখাব। প্রথমে দ্যাখো চিনতে পারো কি না? আর পারলে বলো কবে, কোথায় এগুলো তোলা হয়েছে? একটা একটা করে দিচ্ছি।"

সুকল্যাণবাবু প্রথম ছবিটা হাতে দিতেই চমকে উঠলাম। চন্দননগর স্ট্র্যান্ড। ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া সিঁড়ির একটা ধাপে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন অমিতাভ মুখার্জি। আর ক্যামেরার দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা অলিভ গ্রিন টিশার্টটা গতকালও পরেছি। কিন্তু এ ছবি....

"এ তো আমি আর অমিতাভবাবু।"

"ঠিক। কিন্তু কবে?"

"যেদিন দেবাশিসদার বডি পাওয়া গেল। মানে... গত বিশে জুন"

"গ্রেট। এবার এটা দ্যাখো।"

"বিধান সরণি। আমি আর অমিতাভবাবু। এখান থেকেই বিশ্বজিতের বডি পাওয়া গেছিল।"

"কবে?"

"পনেরো দিন পরে। জুলাইয়ের পাঁচ।"

ভদ্রলোক হাতের কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন বোধহয়। "একদম ঠিক। আচ্ছা এবার?"

"এবারের ছবিটা দেবাশিসদার বাড়ির সামনে তোলা। দরজার ভিতরে দরজা খুলে কেউ একটা দাঁড়িয়ে আছেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। বাইরে আমি, বাইকে বসা।"

"ভিতরে কে?"

"খুব স্বাভাবিক, দেবাশিসদাই হবেন। আমি আজ অবধি ওঁর বাড়িতে ওঁকে ছাড়া কাউকে দেখিনি।"

"কবে তোলা?"

ঠিক তখনই ব্যাপারটা আমার মধ্যে সিঙ্ক ইন করল। এই ছবি তো কম করেও বছর তিনেক আগে তোলা। যে শার্টটা আমার গায়ে, সেটা বহুদিন হল পরি না। এত আগের ছবি পুলিশের কাছে এল কীভাবে? আর কেন?

"মনে নেই। তবে ২০১৫ সালের আশেপাশে।"

"আর এটা?"

"এটাতেও আমি। এ তো চন্দননগরের বড়বাজার দিয়ে যাচ্ছি। তাহলে হয়তো দেবাশিসদার বাড়িতেই গেছিলাম।"

"কবে?'

"বলা খুব মুশকিল। তবে বছরখানেক বা তার বেশিই হবে। সঠিক ডেট বলতে পারব না।"

"আচ্ছা তুমি শিওর, এটা যেদিন তোলা, সেদিন তুমি দেবাশিসের বাড়িতেই গেছিলে?"

"দেবাশিসদার বাড়ি যাওয়া বাদে চন্দননগর বিশেষ যাওয়া হত না। অবশ্য একেবারে যেতাম না, তা বলা মিথ্যে। চুঁচুড়াতে ভিটেবাড়ি গেলে অনেকসময় ঘুরতে যেতাম। এটা কবে তোলা না বললে বুঝব না।"

"১২ নভেম্বর, ২০১৭। কিছু মাথায় এল?"

"উঁহুঁ। সিরিয়াসলি মনে পড়ছে না। আচ্ছা হ্যাঁ, নভেম্বর। বাড়ি গেছিলাম। জেঠুর ছেলে নেশা করে জেঠিমাকে মারছিল। তাকে বোঝাতে। "

"তারিখটা এটাই?"

"সেটা ভুলে গেছি।"

"বাদ দাও। এবার এটা দ্যাখো।"

"ও বাবা! এ তো রাতের ছবি। দাঁড়ান দাঁড়ান। দেবাশিসদা আর অমিতাভবাবু। দেবাশিসদার বাড়ির সামনে। এটার ডেট আমি শিওর। ৩ জুলাই। সাল বলতে পারব না। সেটা আপনি অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিলে ভালো।"

"ডেট নিয়ে এত শিওর হচ্ছ কী করে?"

"দেবাশিসদার পোশাক। এই অদ্ভুতুড়ে পোশাকটা প্রতি বছর ওই দিনে পরতেন তিনি। ওই দিন নাকি ওঁর জন্মদিন। ওঁর বাবা ওঁকে এই পোশাকটা দিয়েছিলেন।"

"তুমি গেছ ওঁর জন্মদিনে?

"একবার। একেবারে শুরুতে।"

"কে কে এসেছিল?"

"কেউ না। শুধু আমি। ওঁর স্ত্রী-ও না। অবশ্য এখন জানি তখনই সেপারেশন চলছিল।"

"অমিতাভ আসেনি?"

"আমি দেখিনি। ইনফ্যাক্ট দেবাশিসদা মারা যাবার আগে আমি কোনও দিন ওঁকে দেখিনি। আমরা দুজনেই দেবাশিসদার বাড়ি যেতাম। কিন্তু উনি টাইম ম্যানেজমেন্ট এত ভালো করতেন, দুজনের কোনও দিন সাক্ষাৎ হয়নি।"

"আর কাউকে দেখোনি কোনও দিন?"

"আর কে?"

"এই ছবিটা দ্যাখো।"

*এ তো বেশ অন্ধকারে তোলা ছবি। এটা দেবাশিসদা। এই যে সেই হলুদ ফতুয়া কিছুটা বোঝা যাচ্ছে আর কাঁধের ঝোলা ব্যাগ। কিন্তু পাশে পিছন ফিরে কে দাঁড়িয়ে?"

"সেটাই আমার প্রশ্ন। চেনো?"

আমি চোখের খুব কাছে ছবিটা নিয়ে এলাম। পিছন ফিরে একজন দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। অল্প আলোতে অবয়বটুকু ছাড়া খুব বেশি কিছু চেনা যাচ্ছে না। কিন্তু কেন যেন মনে হল আমি একে চিনি। এই দাঁড়ানোর ভঙ্গি কোথাও দেখেছি। খুব সম্প্রতি। কোথায় মনে পড়ছে না। সেটাই বললাম অফিসারকে। এবার তিনি

অদ্ভুত এক প্রশ্ন করলেন আমায়, "বাসুকি কিংবা বাসু নামটা কি তোমার পরিচিত?"

"বাসুকি মানে সেই নাগ দেবতা?"

"দেবাশিসের ডান হাত।"

বাধ্য হয়ে স্বীকার করলাম এই নামটা আমার কাছে নতুন। ভদ্রলোক খানিক কী যেন ভাবলেন। ততক্ষণে কফি এসে গেছে। সঙ্গে ক্রিম বিস্কুট। আমাকে খেতে বলে নিজেই ছবিগুলো বারবার দেখতে থাকলেন সুকল্যাণ মিত্র।

"আচ্ছা, এবার কফি খেতে খেতে একটু ভাবো। তারপর বলো দেখি, তোমার সঙ্গে দেবাশিসের আলাপের প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রতিদিন কী কী হত? আলাপ কেমন করে হল? কিচ্ছু বাদ দেবে না।"

আমি সবটাই বললাম। শুধু তাই না, দেবাশিসদার খুনের পরে যা যা হয়েছে তার প্রায় পুরোটাই। প্রায় বললাম, তার কারণ আজই যে তারিণীর ডায়রিটা পেয়েছি, সেটা ইচ্ছে করেই চেপে গেলাম। এখন বললে পুলিশ ওটা বাজেয়াপ্ত করবে। ওটা দেখার অধিকার আমার প্রথম। কিন্তু যেখানে বাঘের ভয়, "আজকে ব্যান্ডেল চার্চে গেছিলে কেন?"

এটা অর্ধসত্য বললাম। এমনকি বাবার রাখা বাইবেলটাও দেখালাম। সুকল্যাণ মিত্র ভালোভাবে উলটে পালটে দেখলেন বইটা। তারপর আমার হাতে দিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। আপাতত কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। এখন আসতে পারো।"

আমি উঠলাম না। বসে রইলাম।

"কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ স্যার। আমার আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে।"

"কী জিজ্ঞাসা?"

"আমি যতদূর বুঝেছিলাম, দেবাশিসদার খুন থেকেই এই কেসের শুরু। ঠিক যেমন ভেবেছিলাম, এই কেস চন্দননগর পুলিশ হ্যান্ডল করছে। এখন যা

বুঝলাম, গত তিন বছর, মে বি তার চেয়েও বেশিসময় ধরে পুলিশ দেবাশিস গুহকে ফলো করছিল। শুধু তাঁকে না, তার সঙ্গে পরিচিত সবাইকে। আমিও সেই দলে আছি। আমার একটাই প্রশ্ন। কেন?”

মৃদু হাসলেন সুকল্যাণ, “সে কথা আমি তোমাকে বলব কেন? এসব সরকারি মোস্ট কনফিডেনশিয়াল তথ্য। বলা যাবে না। সরি।”

“স্যার, আমিও তো প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আমিও নিজের মতো তদন্ত করে কিছু ক্লু পেয়েছি। শেয়ার করলে দুপক্ষেরই ভালো হত।”

হো হো করে খানিক হাসলেন সুকল্যাণ মিত্র। তারপর বললেন, “প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। আমার পুলিশের চাকরির চৌত্রিশ বছর কেটেছে। আমি এতদিনে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝেছি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এক জায়গাতেই থাকে। বইয়ের পাতায়। ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কিরীটী রায়, শার্লক হোমস, এদের পড়তেই ভালো লাগে। সব জায়গায় দেখবে, পুলিশ মানেই বোকা। বাস্তবে পুলিশের পক্ষে যে নেটওয়ার্কে কাজ করা পসিবল, প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরদের কাছে তার একশো ভাগের এক ভাগ থাকে না। তুমি ডিভোর্সের কাজ করো। এই কেস তোমার ভাবনার চেয়ে অনেক বড়ো। অনেক অনেক বড়ো। প্রায় এক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। তুমি এতে কী হেল্প করবে? বাড়ি যাও। দরকার পড়লে ডাক দেব।”

চট করে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। “তাই নাকি? আপনারা সব জানেন? বলুন দেখি ভূত কী জিনিস?”

জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো গুটিয়ে গেলেন সুকল্যাশ। স্থিরদৃষ্টিতে খানিক চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর টেবিল থেকে জলের গেলাসটা উঠিয়ে জল খেলেন খানিকটা। মুখ গম্ভীর। সোফা ছেড়ে উঠে সোজা গিয়ে বসলেন নিজের টেবিলে। টেবিল থেকে কিছু কাগজ নিয়ে কী যেন দেখলেন। আমি চুপ করে বসে আছি। বুঝতে পারছি না, হঠকারিতা করে ফেললাম কি না। বসতেও বলছেন না, আবার যেতেও বলছেন না। বুঝলাম উনি নিজেও

ধন্দে পড়ে গেছেন। ভূত ব্যাপারটা এই কেসে শিওর একটা ইম্পরট্যান্ট ক্লু, যেটা আমার জানার কথা না। ভদ্রলোক এবার ভাবছেন আমার সামনে হাতের তাস দেখানো ঠিক হবে কি না। আমি প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে চুপচাপ চিবুতে লাগলাম।

মিনিট পাঁচেক আরও গেল এইভাবে। ঘরে কেউ কিচ্ছু বলছে না। শেষে উনিই উঠে এলেন। আবার এসে বসলেন আমার পাশে। "ওকে। ডান। বলো কী বলবে? আই অ্যাম অল ইয়ার্স।"

"অবশ্যই বলব স্যার। কিন্তু আপনি আগে। এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন।"

"ওয়েল, তাহলে শোনো। তুমি নীবারের নাম শুনেছ?"

"শুনেছি। এনজিও। হিউম্যান রাইটস এর কাজ করে।"

"ঠিক। বাট পার্শিয়ালি। নীবার আসলে ম্যাসনিক ব্রাদারহুড থেকে ভেঙে আসা একটা অংশ। প্রায় একশো বছর আগে চন্দননগর, চুঁচুড়াতে এর উৎপত্তি। এরা ঠিক কে বা কারা, তা নিয়ে এতদিন কেউ কোনও মাথা ঘামায়নি। কিছু দেশীয় খ্রিস্টান, কিছু হিন্দু আর অ্যাংলো মিলেমিশে এই সংগঠন চালাত। মানে চালায়। ওদের অস্তিত্বই জানত না তেমন কেউ। পুলিশের র‍্যাডারেও ওরা ছিল না। প্রথম ওদের খবর আমরা পাই চেতলার এক হিজড়া খোল থেকে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, সমাজের সব স্তরে আমাদের খোচড় মানে ইনফরমার রাখতে হয়। এক ইনফরমার আমাদের জানায়, নীবার নামে এক এনজিও নাকি আচমকা খুব অ্যাকটিভ হয়ে উঠেছে। হিজড়ারা যে-কোনো ট্র্যাফিকিং-এর সেরা অস্ত্র। সেটা ড্রাগ হোক, কিংবা মানুষ। খবর পেয়ে আমরা নীবারকে ফ্ল্যাগিং করি। তখনই জানতে পারি, নীবার না, মূলত নীবারের নামে কাজটা করছে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ওয়াফি ডিব্যাসি, যে নাকি সবার কাছে দেবাশিস গুহ নামে পরিচয় দেয়। লোকটা কারও সঙ্গে মেশে না, তেমন কোনও বন্ধু নেই, যাবার মধ্যে মাঝে মাঝেই ভিজিট করে বিভিন্ন বেশ্যাপটি আর হিজড়াখোলে। আর এই নীবার-ও এক অদ্ভুত সংগঠন। এর ভিতরে ঠিক কী হচ্ছে অনেক চেষ্টা করেও

জানতে পারিনি। পারফেক্ট সিক্রেট সোসাইটি। এরা মেম্বার নেয় না। সে চেষ্টা করেও দেখেছি। ফলে ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ ছাড়া কোনও গতি ছিল না। তারপরেই শুরু হল ভূতের উপদ্রব।“

“কীরকম?”

“কলকাতায় বিভিন্ন জায়গায় অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল। সিভিল ডিফেন্সের এক পুলিশ আচমকা মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে রাস্তায় ঠাঁই ঠাঁই গুলি চালিয়ে শেষে নিজে নিজের মাথায় গুলি চালাল। তারপর বছর কয়েক আগে ভিক্টোরিয়ার মিউজিয়ামে কী হল মনে আছে নিশ্চয়ই?”

“হ্যাঁ, সেই গার্ডদের একজন হঠাৎ পাগল হয়ে দর্শকদের দিকে গুলি চালায়।”

“একজ্যাক্টলি। আর পরে জানায় তার কিছুই মনে নেই। আমরা হন্যে হয়ে যাচ্ছিলাম এইসব কেসের সমাধান করতে। সত্যিই মনে হয় এদের যেন ভূতে পেয়েছিল। মজার ব্যাপার, যে দুজন পাগল হয়ে গুলি চালিয়েছিল, দুজনের একজন সোনাগাছি, অন্যজন চন্দননগর বেশ্যাপট্টির নিয়মিত খদ্দের ছিল। যেখানে আবার দেবাশিস নীবারের কাজে যাতায়াত করত। কিন্তু এতটুকু প্রমাণে কিচ্ছু করা সম্ভব না। আর ঠিক তখনই খিদিরপুর থেকে খবর এল। হিজড়াখোলেই ইউনুস হিজড়া পাগল হয়ে অন্য তিনজন হিজড়াকে খুন করে। সেটা তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পারি, সেখানেও দেবাশিসের যাতায়াত ছিল। আমরা দেবাশিসকে ক্লোজ করতে থাকি। শুধু ওকে না, ওর সঙ্গীসাথি সবাইকে। এমনকি অমিতাভকেও। তোমাকেও। হিজড়াদের একটা সুবিধে আছে। ওরা খুব ক্লোজ কম্যুনিটি। ফলে খোঁজ পাওয়া অনেক ইজি। আমরা বুঝতে পারছিলাম দেবাশিস এবার ওদের নিয়ে কিছু একটা করতে চাইছে। আমরা খোচড় ঢুকিয়ে দিলাম। সে নিয়মিত আমাদের খোঁজ দিত। কিন্তু ওদের সব কথা এত ডিস্টার্বিং আর অদ্ভুত যে, সত্যি বলে মেনে নেওয়া মুশকিল। আসলে ওরা খুব সুপারস্টিশাস কিনা.... বাদ দাও।”

"না, না, এই জায়গাটাই আমার শোনা দরকার। আমি হয়তো হেল্প করতে পারব। বলুন।"

"শুনলে ভাববে রূপকথার গল্প বলছি। যাই হোক, যা শুনেছি ভার্বাটিম বলছি। দেবাশিসের কাছে নাকি একটা ছোটো একটা বাক্স ছিল। সিসার লাইনিং দেওয়া। সেই বাক্সে অদ্ভুত কিছু বোতলে অজানা মেডিসিন থাকত। দেবাশিস নিজে এটাকে বলত ভূতের বাক্স। এই মেডিসিন খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে খানিক বাদে যে খেল তার মাথা কাজ করে না। সে পাগলের মতো আচরণ করে। তাও এমনি পাগল না। হিংস্র পাগল। মানে..."

"মানে ডাক্তার জেকিল ওই ওষুধে মিস্টার হাইড হয়ে যান। তাই তো?"

"ঠিক। একেবারে ঠিক", সুকল্যাণ মিত্র বেশ প্রশংসার স্বরে বললেন। "দেবাশিস এবার চেতলা খোলে রেগুলার যাতায়াত করতে থাকল। খিদিরপুরে ওর মেইন অপারেটিভ ছিল ইউনুস। ইউনুস পুলিশ কাস্টডিতে আসার পর বেশ কিছুদিন দেবাশিস ঘরবন্দি হয়ে যায়। চেতলা থেকে খবর আসে ভূতের বাক্স হারিয়েছে। দেবাশিস হন্যে হয়ে সেটা খুঁজছে।"

"তারপর? পেল?"

"হিয়ার কামস বিশ্বজিৎ। বাই সেক্সুয়াল। দোকানে কাজ করে। তোমার ইনফরমার। খিদিরপুরে খুনের দিন সে ওই খোলায় ছিল। ইউনুস কেমন করে সেই ভূতের পাল্লায় পড়ল জানি না, তবে বিশ্বজিৎ বাক্সটা নিয়ে কিছু একটা জানত। সে পালাবার সময় সবার অলক্ষে বাক্স চুরি করে আনে।"

"সেটা কীভাবে জানা গেল?"

"আমাদের আগের ইনফরমার ছিল অভয় নামে এক হিজড়া। চেতলার গুরুমা। সেটা দেবাশিস কোনওভাবে জানতে পেরে তাকে খুন করে দেয়। তখনই আমরা ঠিক করি, ওর অস্ত্রেই ওকে বধ করব। ও নিজে এক হিজড়াকে বিশ্বজিতের কাছে পাঠায়। বাক্সের খোঁজে। সে বিশ্বজিতের পার্টনার হয়ে তার বাড়িতেই থাকত। আমরা জাস্ট ওকে টিপ দিয়ে ডবল এজেন্টের কাজে লাগাই।"

"রামানুজ?"

"তুমি চেনো!" মিত্র মশাইয়ের ভুরু দুটো উপরে উঠে গেল। "হ্যাঁ, ও-ই। গত উনিশে জুন রামানুজ জানায়, বিশ্বজিৎ আর দেবাশিসের একটা মিটিং হতে পারে। বিশ্বজিৎ মোটা টাকার বিনিময়ে বাক্স দেবাশিসকে তুলে দেবে। আমরা মিটিং প্লেস জিজ্ঞাসা করলাম। চেতলা খোল। আমাদের লোক সেখানে মোতায়েন করলাম। হাতেনাতে ধরব। কিন্তু আসল সময় যখন এল, পাখি পালিয়েছে। তারপরেই পরপর দুটো খুন। সবকিছু ঘেঁটে গেল।"

"দেবাশিসদার সেই বাক্স নিয়ে কী প্লান ছিল, কিছু জানা গেছে?"

"সামান্য। যা বোঝা গেছে, ও আগে একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাচ্ছিল। Sick experiment। বিভিন্ন মানুষের উপরে ওর সেই ওষুধ প্রয়োগ করে দেখছিল। মেইনলি হিজড়া আর বেশ্যাদের এজেন্ট করেছিল, কারণ এদের ইজি অ্যাক্সেস। এরা মরলেও কারও কিছু যায় আসে না। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম, এটা নেহাত মানসিক রোগ। পরে বুঝেছি আরও বড়ো শয়তানি চাল ছিল এর পিছনে।"

"সেটা কী?"

"অনলাইনে কিছু কিনতে গেলে প্রথমে আমরা কী দেখি? বিশেষ করে সেটা যদি কোনও ওষুধজাতীয় প্রোডাক্ট হয়?"

"কাস্টমাররেটিং। মানে আসল ব্যবহারকারীরা কী বলছেন।"

"ঠিক। সোজা কথায় কেস স্টাডি। তাই তো? দেবাশিসের কম্পিউটার থেকে যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এটা পরিষ্কার ও ডার্ক ওয়েবে কোটি কোটি টাকায় এটা বেচতে চাইছিল। কিন্তু যারা কিনবে, তারা মুখের কথায় বিশ্বাস করবে কেন? তারা চায় প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সত্যিকারের কেস স্টাডি। দেবাশিসের এই এক্সপেরিমেন্টকে অসুস্থ বললাম কেন বুঝলে তো? এখানে জলজ্যান্ত মানুষকে গিনিপিগ বানিয়ে ট্রায়াল চলছিল।"

"কারা কিনবে সেটা?"

“কী বলছ হে তুর্বসু! এমন একটা অস্ত্র পেলে তো রাজকার্য হয়ে যাবে জল”, হীরক রাজাকে কোট করে যেন একটু মজাই পেলেন ভদ্রলোক, “দেশে হোক বা বিদেশে, দাঙ্গা লাগাতে, অপরাধ করাতে আলাদা করে আর খরচ নেই। মানুষ বিবেকশূন্য হয়ে যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি’ বলে হৃষীকেশের আজ্ঞা পালন করে যাবে। তুমি ভাবতে পারবে না পোটেনশিয়াল বায়ার সব কারা কারা ছিল। দেশবিদেশের বড়ো বড়ো মাথাদের এজেন্টরা। আফশোস একটাই, আর একটা দিন। দেবাশিস আর একটা দিন পরে খুন হলে সেই বাক্স আমাদের হাতে এসে যেত। এখন সেটা কোথায় কেউ জানে না।”

“আর বাসুকি কে?”

“একটা ছায়া। ছদ্মনাম। মানুষটাকে কেউ চেনে না। দেবাশিস একেবারে পক্ষীমাতার মতো লুকিয়ে রাখত একে। একে নিয়ে সে কী করতে চেয়েছিল সেটাও সঠিক জানা নেই। এই ছবিটা ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি এর বিষয়ে।”

“বুঝলাম। জিগস পাজলের অনেকটা ভরাট হল। তবে আপনি বলছিলেন না, বাক্স পেলেই দেবাশিসদা ওটা বেচে দিতেন, পারতেন না। সলিড কেস স্টাডি থাকলেও না।”

“কেন?”

“ভেবে দেখুন, আপনিই যদি কোটি টাকা দিয়ে এমন একটা জিনিস কেনেন, আপনি কী চাইবেন? আপনি চাইবেন যাতে ওই বাক্সের মেটেরিয়াল শেষ হলে আপনি পরে আরও বানাতে পারেন। তাই তো? ইন ফ্যাক্টসেই জন্যেই আমার ধারণা, দেবাশিসদা এতদিন বাক্সটা বেচতে পারেননি। মাস স্কেলে বানানোর ফর্মুলা ওঁর কাছে ছিল না।”

“হ্যাঁ, কিন্তু...” আমতা আমতা করেন সুকল্যাণ মিত্র, “কিন্তু এমন অদ্ভুত জিনিস আজকের দিনে কেমন করে বানানো যাবে?

“সেটাই আপনাকে এবার আমি বলব”, মুচকি হেসে উত্তর দিলাম।

সপ্তম পর্ব- নীল লাল রুপালি নীরব

রাসবিহারী মোড় থেকে দেশপ্রাণ শাসমল পার্কের দিকে সামান্য বেঁকতেই সাদা বিরাট বাড়িটা চোখে পড়ল অপর্ণার। আগে বহুবার গেছে, কিন্তু খেয়াল করেনি। সামনের বোর্ডে একটা 'ফরগেটমি নট' ফুলের ছবি আঁকা। পাশে লেখা 'ব্লু ফ্লাওয়ার'। নিচে 'হেলথকামস হোম'। এই ফুল অপর্ণার চেনা। ম্যাসনিক চিহ্ন। বাবা ছোটোবেলায় তাকে এই ফুলের একটা ব্রোচ কিনে দিয়েছিলেন। সে কোথাও গেলে পরে যেত।

গাড়ির চালককে নির্ঘাত সব নির্দেশ দেওয়া আছে। গাড়ি মেন এনটান্সের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রোগীদের কয়েকজনকে পেরিয়ে সোজা গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে গেল। সামনে একজন গার্ড পোস্টেড। দেওয়ালে নির্দেশ " হসপিটাল পার্সোনেলস অনলি"। গাড়ি বিনা বাধায় ঢুকে গেল। ভিতরে প্রচুর গাছগাছালি দিয়ে সাজানো। লম্বা লন। বাইরের গাড়িঘোড়ার আওয়াজ অনেকটাই স্তিমিত। অপর্ণা গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতেই, উবেরওয়ালা আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। অপর্ণা গাড়িটার চলে যাওয়া দেখল। ঘড়ির কাঁটার মতো সময় মেনে ঠিক তখনই বিল্ডিংয়ের ভিতর থেকে নার্সের পোশাক পরা এক মাঝবয়সি মহিলা এগিয়ে এলেন হাসিমুখে। সঙ্গে আরও দুটি অল্পবয়সি মেয়ে। নার্স মহিলাটি একটু হেসে দুহাত বাড়িয়ে বললেন, "আসুন, আসুন। ভিতরে চলুন।"

অপর্ণা দাঁড়িয়ে রইল। ভদ্রমহিলা এবার অপর্ণার হাত ধরে একটু জোর করেই যেন বললেন, "দাঁড়িয়ে কেন? চলুন ভিতরে।"

"না। যাব না। আগে বলুন এসব কী? আমাকে এখানে ডেকে আনা হল কেন?"

নার্সটি আবার শান্ত গলায় বলল, "সেসব আপনাকে স্যার বলবেন। আপনার শরীর ভালো না। এতটা জার্নি করে এসেছেন। চলুন প্লিজ।"

"বলছি তো যাব না।" এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল অপর্ণা। "কে বলুন তো আপনারা? কেনই বা আপনাদের কথা শুনছি আমি? না গেলে কী করতে পারবেন? ভিতরে কে বসে আছে? কে আপনাদের স্যার? সেই মাস্টার?" এতক্ষণের পুষে রাখা রাগ ফেটে বেরিয়ে আসে। নার্স রাগ করে না। মৃদু হাসে শুধু। "সব জানতে পারবেন ম্যাডাম। কিন্তু আগে ভিতরে তো চলুন। আমাদের স্যার এই নার্সিংহোমের মালিক অশোক মল্লিক। আপনার বাবা ফার্গাস অ্যাভেরি স্যারকে আমি চিনতাম ম্যাডাম। স্যারের বন্ধু ছিলেন। অনেকবার এসেছেন এখানে। আপনি ভয় পাবেন না। প্লিজ চলুন।

বাবার নাম শুনে একটু চমকে গেল অপর্ণা। তারপর ভাবল, কিছু না ভেবেই যখন এতটা এসেছে, এখন আর ভিতরে না ঢোকার কোনও মানেই নেই। বরং গেলে কাজ হতে পারে। তার চারদিকে যে রহস্যটা ধীরে ধীরে আঁট হচ্ছে, সেটার যদি সন্ধান পাওয়া যায়। মাথা নিচু করে খানিক দাঁড়িয়ে তারপর বলল, "চলুন তবে।" পাশের দুটো মেয়ে এসে তার দুই হাত ধরল। যেন সে ভয়ানক অসুস্থ, এমন করেই নিয়ে গেল একটা ঘরে। সেই ঘরে একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি মেসিন। পাশে সবুজ চাদরে ঢাকা লোহার মেডিক্যাল বেড। অ্যাপ্রন পরে এক কমবয়সি ডাক্তার বসে আছে। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ডাক্তার উঠে দাঁড়াল, "নমস্কার ম্যাডাম। আমি ডাক্তার অনীকেন্দু চৌধুরী। গাইনোকোলজিস্ট। স্যার আমায় বললেন আপনার চেক আপ করতে।"

"কেন? আমি তো ভালোই আছি।"

"অবশ্যই আছেন ম্যাম। আর থাকবেন সেটাই তো কাম্য। জাস্ট রুটিন টেস্ট। কাইগুলি একটু কো-অপারেট করুন। এসব মিটে গেলেই স্যার আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।"

"কিন্তু দরকারটা তো আমি বুঝতে পারছি না।"

"ম্যাডাম, আপনি ডাক্তার অপরেশ বসুকে দেখাতেন তো?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"তিনি এখন কোথায়?"

"দিল্লিতে। কোন একটা কনফারেন্সে গেছেন। সামনের উইকে চলে আসবেন।"

"সরি ম্যাডাম। দিল্লিতে যাননি। উনি ফেরার। আজকেই আনন্দবাজারে খবর হয়েছে। দেখেননি বোধহয়", বলে একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ অপর্ণার হাতে তুলে দিল। একটা খবরের চারদিকে গোল দাগ দেওয়া। যেন তাকে দেখানোর জন্যেই। খবরটা খুঁটিয়ে পড়ল অপর্ণা। যা লেখা, তা যদি সত্যি হয়, তবে ভয়ানক ব্যাপার। অপরেশ বসু ভুয়ো ডাক্তার। তার ক্লিনিকটাও নাকি শিশু পাচারের আখড়া। গতকাল পুলিশ সেখানে রেইড করে। অপরেশ আগেই খবর পেয়ে ফেরার। পুলিশ গ্রেপ্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

"দেখলেন তো ম্যাম, কোন লোকের হাতে বাচ্চার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আপনি। স্যার তাই বলেছেন এখানে আপনাকে এনে চেক আপ করাতে।"

"আপনাদের স্যারের এত মাথাব্যথা কেন আমাকে নিয়ে?"

"সেটা তো জানি না ম্যাম। সেটা স্যারের সঙ্গে দেখা হলে আপনি নিজেই জেনে নেবেন। এখন কাইন্ডলি যা বলছি শুনুন। সময় চলে যাচ্ছে।"

অপর্ণা আর বাধা দিল না। ধীর পায়ে উঠে গিয়ে শুল সেই লোহার খাটে। তারপর প্রায় ঘন্টা দু-এক নানারকম পরীক্ষা করল ওরা। রক্তপরীক্ষা, ইউএসজি, আরও নানারকম। সব শেষ হবার পর নার্সমহিলাটি একটা ট্রে ভরে নানারকম ফল আর শুকনো খাবার নিয়ে এলেন। অপর্ণা বিনা বাক্যব্যয়ে খেয়ে নিল। খেতে খেতেই দেখল নার্সের মোবাইলে ফোন এসেছে। নার্স "হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। হয়ে গেছে। খাচ্ছেন। খাওয়া হলেই নিয়ে যাচ্ছি", বলে অপর্ণার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বলল, "চলুন তবে। স্যার ডাকছেন।"

এই মুহূর্তের জন্যেই এত অপেক্ষা। অপর্ণার আপত্তি সত্ত্বেও তাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে একটা লিফটে চাপিয়ে চারতলায় নিয়ে যাওয়া হল। করিডরের দুপাশে ক্যানভাসে আঁকা সব ছবি। এর মধ্যে একটা অরিজিনাল এম এফ হুসেন আর বিকাশ ভট্টাচার্য চিনতে পারল অপর্ণা। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে গ্যালারি '৮৮ আর সিমায় প্রায়ই যেত। তখন বাবাই তাকে ছবি চিনিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতা শহরে এক নার্সিংহোমের মালিক একইসঙ্গে একটা হুসেন আর একটা বিকাশ ভট্টাচার্য রাখার ক্ষমতা রাখেন, এটা তার চিন্তার বাইরে। করিডরের বাঁদিকে একটা ঘরের সামনে এসে থামল হুইলচেয়ার।

"এবার উঠে দাঁড়ান ম্যাম।"

অপর্ণা দেখল অশোক মল্লিকের চেম্বারের সামনে চলে এসেছে। কিন্তু দরজা খুলতেই যে দৃশ্যটা দেখতে পেল, সেটার জন্য সে বিন্দুমাত্র তৈরি ছিল না। বিরাট চেম্বার। সামনের দেওয়ালে একটা ক্যানভাসে আঁকা ছবিতে খড়ের টুপি মাথায় দেওয়া এক নীল জামা প্যান্ট পরা শিল্পী তাঁর ইজেল, ক্যানভাস, তুলি নিয়ে চলেছেন রাস্তা দিয়ে। পিছনে দুটো গাছ। ধানের জমি। দূরে কিছু বাড়িঘর। শুধু এই ছবিটাই অপর্ণাকে চমকে দেবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো চমক, চেম্বারের একপাশে পাশাপাশি বসে রয়েছেন নিশীথ দত্ত, সুপর্ণা আর ঊর্ণা। ওরা আগেই এসেছে। উর্ণার মুখ দুই হাতে ঢাকা। অপর্ণা ঢুকতেই উর্ণা মাথা তুলে তাকাল। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে গেছে। অপর্ণা এক ঝলক ওদিকে তাকিয়েই সোজা তাকাল সেই লোকটার দিকে, যার সঙ্গে মোলাকাতের জন্য এখানে আসা।

অশোক মল্লিক প্রায় নিশীথ দত্তের সমবয়সি। কিন্তু মাথাজোড়া টাকের জন্য বয়স বেশি মনে হয়। গোল মুখ, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা, মুখ হাসি হাসি। তিনিও অপর্ণাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

"এসো অপর্ণা। তোমার জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। না না ওদিকে না, আমার সামনের এই চেয়ারটায় বসো।"

বাধ্য মেয়ের মতো অপর্ণা বসে পড়ল। ভদ্রলোকের টেবিল ভরা কাগজপত্র। কালো ইউএসজি প্লেট। ভদ্রলোক সেগুলোই দেখছিলেন এতক্ষণ। তাদেরই একটা অপর্ণার দিকে বাড়িয়ে বললেন, "অভিনন্দন। তোমার বেবি খুব ভালো আছে। আমরা বেশ টেনশনে পড়ে গেছিলাম।"

"কেন?"

"কেন মানে? অনীকেন্দু কিছু বলেনি তোমায়?"

"বলেছে। কিন্তু সেটা তো আমার টেনশনের কারণ হতে পারে। আপনি কেন টেনশন করছেন? আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনি না। কোনও দিন দেখেছি বলেও মনে পড়ে না। নামও আজ প্রথম শুনলাম।"

অপর্ণার মা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। হাত উঠিয়ে তাঁকে থামিয়ে ডাক্তার মল্লিক বললেন, "সেটাই স্বাভাবিক। চিনলে বরং অবাক হতাম। কিন্তু ফার্গাস আমার বন্ধু ছিল।"

"বন্ধু! কেমন বন্ধু আপনি? বাবার যখন অ্যাটাক হল, তখন কোথায় ছিলেন? একদিনও তো দেখিনি আপনাকে?" অপর্ণা দেখল না চাইতেই হুড়হুড় করে শব্দ বেরোচ্ছে তার মুখ থেকে। চাইলেও থামাতে পারছে না। "নাকি আপনি লর্ড ভোলডেমর্টের মতো? হু ক্যাননট বি নেমড! ডার্ক লর্ড! ম্যাসনিক মাস্টার!"

"চুপ করো। মাস্টারের নাম এর মধ্যে এনো না। উনি আমাদের সবার উপরে। অনেক উপরে। ওঁকে আমাদের লেভেলে নামিয়ো না প্লিজ।"

"কেন? উনি কে? ভগবান? ভগবান মোবাইলে কথা বলেন বুঝি? উত্তর দিচ্ছেন না কেন? আপনারা মাস্টারের ক্রীতদাস হতে পারেন। আমি না। আমার কী দায় পড়েছে আপনাদের মাস্টারের কথা মেনে চলব?"

"কিন্তু তুমি তো চললে। তাই না?" শান্ত গলায় বললেন ডাক্তার মল্লিক।

"এখানেই মাস্টার আলাদা। অবিশ্বাসীদেরও নিজের কথা মানাতে পারেন।"

"সরি টু সে, আমি আপনাদের সো-কলড মাস্টারের কথায় এখানে আসিনি। এসেছি নিজের ইচ্ছায়। এসেছি নিজের কানে শুনতে। জানতে।"

“কী জানতে?”

“সত্যিটা। অবশ্য যদি বলেন। আদারওয়াইজ...”

“আদারওয়াইজ? কী করবে?”

“আপনার নামে পুলিশে খবর দেব। পুলিশ বাকিটা বুঝে নেবে।”

“কী অভিযোগে?” মল্লিক যেন বেশ মজা পেয়েছেন।

“আপনার পিছনের এই ছবিটা। যদি এটা অরিজিনাল হয়, যেটা হওয়া কোয়াইট পসিবল, কারণ এখান থেকে ছবির ফাটাফুটিগুলো দেখতে পাচ্ছি, তবে এটা The Artist on the Road to Tarascon। নাৎসি অ্যামলে ম্যাগডেবার্গ মিউজিয়াম থেকে হারিয়ে যাওয়া ভ্যান গঘ। সারা বিশ্ব পাগলের মতো এটাকে খুঁজছে। আর আপনি একে নিজের চেম্বারে বন্দি করে রেখেছেন?”

“তোমাকে এর কথা কে বলল?”

“আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, আমার বাবা, আপনার বন্ধু, ফার্গাস অ্যাভেরি শখের আর্ট কনৌসার ছিলেন। এই ছবির কথা বাবার মুখে কতবার শুনেছি!”

“ফার্গাস জানত। আমার এই চেম্বারে সবাই আসে না। কিন্তু আজ অবধি যারা এসেছে, প্রথমবারেই এই ছবি চিনেছে দুইজন। ফার্গাস আর তুমি। ইন ফ্যাক্ট এই ছবির জন্যেই...” চুপ করে গেলেন ডাক্তার অশোক মল্লিক।

“বলুন। কী বলছিলেন, শেষ করুন।”

“তুমি বলছিলে তুমি সত্যিটা শুনতে চাও। শোনাতে পারি। কিন্তু তুমি সেটা সহ্য করতে পারবে তো? বিশেষ করে এইরকম শারীরিক অবস্থায়?”

“পারব। বরং না বললেই আমার অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে।”

অশোক মল্লিক এবার অপর্ণার ঘাড়ের উপর দিয়ে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কিচ্ছু করার নেই সুপর্ণা। এই দিনটা আসার ছিলই।” নিশীথ দত্ত “আমি একটু ঘুরে আসছি” বলে উঠে গেলেন। উর্ণা একবার মুখ উঠিয়ে আবার দুই হাতে মুখ গুঁজে দিল।

গলাটা একটু খাঁকরে অশোক মল্লিক জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি নীবারের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ। আপনাদের এনজিও। এককালে ম্যাসনিক ব্রাদারদের অংশ ছিল। পরে ভেঙে বেরিয়ে এসে আলাদা সংগঠন করে।"

"হুমম। সবাই সেটাই জানে। আজ থেকে একশো বছরের কিছু আগে সাতজন মানুষ মিলে এই সংগঠনটা শুরু করেন। এঁরা সবাই এককালে ম্যাসনিক ব্রাদারহুডের সদস্য ছিলেন। রানি ভিক্টোরিয়ার ডায়মন্ড জুবিলিতে ম্যাসনিক লজে খুনের ঘটনা ঘটে। এরপরেই এঁরা লজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে এক ছোট্ট পরিবারের মতো সাতজনের সমিতি খোলেন। ম্যাসনিক ব্রাদারহুডে সাত পবিত্র সংখ্যা। সেটাও এঁদের মাথায় কাজ করেছিল হয়তো।"

"এঁরা কারা?"

"এঁদের একজন ছিলেন সাহেব। চিফ ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস টমসন, যিনি রিটায়ারের পর ভারত ছেড়ে কিছুদিন ইংল্যান্ডে চলে গেলেও মন টেকেনি। ফিরে এসেছিলেন। এ দেশেই মারা যান। বাকি ছয়জনের সবাই নেটিভ। হাটখোলার দত্তবাড়ির ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্ত, চন্দননগরের এক নামী বড়োলোক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দারোগা প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, জাদুকর গণপতি চক্রবর্তী, গোয়েন্দা তারিণীচরণরায়, আর এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, নাম ম্যানুয়েল ডিব্যাসি।"

শেষ পদবিটা শুনে অপর্ণার চমকে ওঠা মল্লিকের নজর এড়াল না। খানিক থেমে বললেন, "এর বাইরেও একজন লন্ডনবাসী ছিলেন। নাম সাইগারসন মোহেলস। ইনি সম্ভবত ভারত আর ইংল্যান্ডের মধ্যে যোগসূত্র।"

"কীসের যোগসূত্র?"

"বলব। তার আগে আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি। টমসনের এক দেশীয় স্ত্রী ছিল। রক্ষিতা বলা চলে। নাম মঙ্গলা। মঙ্গলার গর্ভে টমসনের এক

মেয়ে হয়। সেই মেয়ে পরে বিয়ে করে এক নেটিভ খ্রিস্টানকে। নাম জর্ডন অ্যাভেরি।”

এবার স্পষ্টতই অপর্ণা চমকে উঠল। “কিন্তু এই ক্লোজড নিট গ্রুপ কেন?”

“তোমার জন্য। ইন ফ্যাক্ট তোমাদের জন্য।”

“বুঝলাম না।”

“তুমি ‘প্রায়রি অফ সায়ন’-এর নাম শুনেছ?”

“হ্যাঁ। ড্যান ব্রাউন। দ্য ভিঞ্চি কোড।”

“ওটা তো টোকা বই। আসল বই ‘হোলি ব্লাড, হোলি গ্রেইল’। যাই হোক, ওইগুপ্ত সমিতির কাজ কী ছিল?”

“বলা হয়, প্রভু যিশুর ব্লাডলাইন রক্ষা করা।”

“একজ্যাক্টলি। আমাদের কাজও অনেকটা তাই। তোমাদের ব্লাডলাইন রক্ষা করা।”

“কেন? আমরা কে?”

“বলছি। আগে বলো, তুমি তো এত কিছু জানো। জ্যাক দ্য রিপারের নাম শুনেছ?”

“জানি সেই কেস। বাবা গল্প করত। তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?”

“স্টিফেননাইট নামের এক ভদ্রলোক ব্রাদারহুড আর রিপার নিয়ে কিছু তথ্য জেনে ফেলায় খুন হয়েছিলেন, তাঁর কথা জানো?”

“এটাও বাবা বলেছে। রিপার নাকি আসলে রানি ভিক্টোরিয়ার লোক। ওই পাঁচজনকে খুন করা হয়, কারণ ওরা একটা ভয়ানক সত্যি জানত।”

“কী সত্যি?”

“রানির এক অবৈধ বংশধর ছিল। অ্যালিস নামে। ওরা তার খোঁজ জানত।”

“অ্যালিসের কী হল?”

“সেটা কেউ জানে না।”

“সেটা আমি তোমায় বলছি। অ্যালিসকে গোপনে ভারতে নিয়ে আসা হয়। কাউকে না জানিয়ে। শুধু এই সাতজন জানত তার আসল পরিচয়। রানির ব্লাডলাইন। নীবারের কাজ সেটাকে নষ্ট না হতে দেওয়া। আরও বুঝিয়ে বলতে হবে?”

“আমার মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে। আপনি বলতে চাইছেন আমি রানির বংশধর?”

“বলতে চাইছি না। বলছি। তুমি, তোমার মা, উর্ণা। সবাই। এমনকি তোমার পেটের বাচ্চাটাও।”

“আমাদের টিকিয়ে রেখে আপনাদের কী লাভ?”

“রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক। তোমরা আমাদের তুরুপের তাস। প্রতি বছর ইংল্যান্ড এই স্ক্যান্ডেল চেপে রাখার জন্য আমাদের বিরাট অঙ্কের টাকা দেয়। একটা গোপন খাতের থেকে এই টাকার ব্যবস্থা মহারানি নিজেই মারা যাবার আগে করে দিয়ে গেছিলেন। রাজপরিবার এখনও সেটার ভরপাই করে চলেছে। আমাদের কাজ শুধু তোমাদের বাঁচিয়ে রাখা। আর বছর বছর তোমাদের বেঁচে থাকার সাক্ষ্য পাঠিয়ে যাওয়া।”

“সেটা কীভাবে?”

“আগে প্রত্যেক বছর লোক পাঠাত ওরা। নীবারের নজরদারিতে তোমাদের অজ্ঞাতে দেখে যাবার জন্য। এখন ডিএনএ স্যাম্পল পাঠাতে হয়।”

“কিন্তু আমাদের ডিএনএ স্যাম্পল আপনারা পান কীভাবে?”

“মাথার চুল, চামড়া, লালা, যে-কোনো কিছু থেকেই স্যাম্পল নেওয়া যায়। আর তোমাদের বিয়ে যাতে নীবারের সিলেক্ট করা মানুষদের সঙ্গেই হয়, সে ব্যাপারে আমরা খেয়াল রাখি। আমাদের এখানে বাইরে থেকে খুব কম সদস্য নেওয়া হয়। মূল সাতজনের পরিবারের লোক বাদে কেউ স্পার্ম ডোনেট করতে পারে না। নীবারে এই ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ আছে।”

“মানে দেবাশিস?”

“একেবারেই। আমাদের ইমপ্ল্যান্ট করা। কিন্তু ও সব হিসেব গুলিয়ে দিয়েছিল।”

“তাই দেবাশিসকে আপনারা খুন করান?”

“মোটেও না। দেবাশিসকে আমরা মারিনি। আমরা খুনোখুনি করি না। বরং উলটোটা হয়েছিল। ওর মারা যাবার কিছুদিন আগে মাস্টার খবর পান, দেবাশিস গোপনে ডার্ক ওয়েবে একটা ডিল চালাচ্ছে। তিনি ওকে ভয় দেখান, ভূত ফেরত না দিলে দেবাশিসের কিছু কীর্তি তিনি পুলিশের কাছে এক্সপোজ করে দেবেন। দেবাশিস উলটো থ্রেট দেয়। বলে, তার কাছেও বাসু আছে। সেও দেখে নেবে।”

“বাসু কে?”

“জানি না। খুব ভুল না করলে দেবাশিসের শুনি। কিন্তু দেবাশিস ছাড়া তাকে কেউ কোনও দিন দেখেনি।”

খানিক চুপ করে কী যেন ভাবলেন ডাক্তার। তারপর আবার নিজের মনেই বলতে শুরু করলেন, “আসলে সমস্যাটা শুরু হয়েছিল সুপর্ণার সময় থেকেই। সুপর্ণার সঙ্গে ফার্গাসের বিয়ে হয়। ফার্গাস ইম্পোর্টেন্ট ছিল। আমরা বাধ্য হই নতুন লোককে নিয়ে আসতে। দেয়ার কামস নিশীথ দত্ত। ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্তের দুই ছেলে। বড়োটিকে তিনি ত্যাজ্য করেন। ছোটোটির বংশধর মলয় এখনও বেঁচে আছে। বিদেশে। বড়োর বংশধর নিশীথ।”

অপর্ণা চুপ করে শুনে যায়।

“তারপরেই প্রথম সমস্যা আসে। আমরা ঠিক করেছিলাম তুমি জন্মানোর আগেই ফার্গাসের সঙ্গে সুপর্ণার ডিভোর্স করিয়ে নিশীথের সঙ্গে বিয়ে দেব। কিন্তু ফার্গাস রাজি হয় না। এই ঘরে ঢুকে সে আমায় ব্ল্যাকমেল করে। ঠিক যেভাবে তুমি আমায় করলে। নিশীথ তোমাদের বাড়ি যেত তোমায় দেখতে। জানি না তুমি কী ভাবতে। ওর ভালো আয় ছিল। ফার্গাস ফ্রিল্যান্সার। পরে সেই কাজটাও যায়। সুপর্ণা ফাইনালি ফার্গাসকে ছেড়ে নিশীথের কাছে আসে। কিন্তু ততদিনে

তুমি আর ফার্গাস এতটাই অ্যাটাচড হয়ে গেছ যে আলাদা করা গেল না। আর তোমাকে ও ইচ্ছে করেই কিছু জানায়নি।”

“মানে....” উত্তেজনায় এবার অপর্ণার গলা ধরে আসে। “মানে আমরা কী করব, কার সঙ্গে থাকব, কার বাচ্চা পেটে নেব, সবটাই আপনারা ঠিক করে। দেবেন? এটা কি মগের মুলুক পেয়েছেন?” অপর্ণার গলা চড়তে থাকে, “একটা চরম প্যাট্রিয়ার্ক সংগঠন, সে আমার জীবন ঠিক করে দেবে? এই ২০১৮ সালেও? জানেন আমি এই সব কিছু ফ্ল্যাশ করে দিতে পারি?”

“তাই? করবে? পারবে না। গঘের ছবির কথা বলেও না। আমি তোমায় এত কিছু বললাম ভয় পেয়ে না। মনে হল তোমার জানা উচিত, তাই। অ্যাভেরিকেও দয়া করে তোমার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়েছে। তোমাকে একটু আগে কী বললাম ভুলে গেছ বোধহয়। তোমাদের বাঁচিয়ে রাখার প্রথম তাগিদ রাজনৈতিক, পরে অর্থনৈতিক। তোমরা কনস্ট্যান্ট ব্ল্যাকমেলিং-এর অস্ত্র। গোল্ডমাইন, বুঝলে গোল্ডমাইন। সরকারি তরফে তোমাদের কথা কেউ জানে না ভেবেছ? জানে, তবে সবাই না। একেবারে মাথারা জানেন। তাঁদের জানানো হয়। তাই চিৎকার করতেই পারো, কিন্তু সে চিৎকার এই ঘরের বাইরে বেরুবে না। মাস্টারের ক্ষমতা আর নীবারের পয়সা নিয়ে তোমার কোনও ধারণাই নেই। নাথিং। শুধু বিরূপাক্ষ বুঝতে পারেনি। চিরকাল ছেলেকে নীবারের বাইরে রেখে গেছে। কী লাভ হল? দেবাশিস মরার আগে সেই তো ওর ছেলেকে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেল।”

“দেবাশিসের কথাই যখন উঠল, আপনারা জেনেশুনে ওইরকম একটা লোকের হাতে আমায় তুলে দিলেন?”

“শিট হ্যাপেনস। আমাদের আবার ভুল হয়েছিল। দেবাশিসের যে একটা টুইস্টেড সেক্সুয়াল অরিয়েন্টেশান আছে, সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমরা পরে শুনি। শুনেই ব্যবস্থা নিয়েছি।“

"কী ব্যবস্থা নিয়েছেন শুনি? আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, আমার সঙ্গে... আপনি জানেন আমার পেটের এই বাচ্চাটা কার?"

"জানি বোধহয়। ইন ফ্যাক্ট জানি বলেই পরের সমস্যাগুলো হয়েছে। দেবাশিসকে মাস্টার বাধ্য করেন ওই কাজ করতে। আমাদের দরকার ছিল সন্তান। তোমার সন্তান। তাই রিস্ক নেওয়া যাচ্ছিল না। "

"আর তা বলে অজ্ঞাতকুলশীল একজনের সঙ্গে..."

"অজ্ঞাতকুলশীল না একেবারেই। খুবই ভালো বংশের ছেলে। নীবার নিয়োগের আগে অনেক ভেবে নেয়। কিন্তু দুবার ভুল হওয়াতে আমরা নিশ্চিত না হয়ে পারিনি। দেবাশিসের অনিচ্ছাতেও ঘটনাটা ঘটানো হয়। যে করেছিল, ও তার নাম বলেনি মাস্টারের ভয়ে। কিন্তু আমি যতদূর জানি তোমাকে একটা ভিডিও দেখিয়েছিল ও। তাই তো?"

উপরে নিচে মাথা নাড়ল অপর্ণা।

"ওটা তোমাকে দেখানোর কথা না। আমাদের পাঠানোর কথা। কাজটা ঠিকঠাক হল কি না প্রমাণ রাখতে। কিন্তু দেবাশিস তোমায় ক্লু দিতে চেয়েছিল। তোমাকে ওই ভিডিও দেখানোর অপরাধে নীবার থেকে ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যাবার আগে বলেছিল দেখে নেবে। আমাদের অস্ত্রেই আমাদের বিনাশ করবে। ওর একটা গ্যাং আছে। খবর পেয়েছি তারা নাকি রেডি হচ্ছে। ওদের হোয়ার অ্যাবাউটস এখনও জানতে পারিনি। তাই মাস্টারের কথায় তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। যতদিন না তোমার ডেলিভারি হয়, তুমি এখানেই থাকবে।"

"বন্দি?"

"ওভাবে ভেবো না। ভাবো রানির মতো।"

"আর ওরা? মা? ঊর্ণা?"

"উর্ণার ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। রাজবংশে জ্যেষ্ঠ সন্তান আর তার জ্যেষ্ঠ সন্তানের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। জানো নিশ্চয়ই।"

"মানে আমার মেয়ে হলে তাকেও..."

"হলেও না। মেয়েই হবে", ইউএসজি রিপোর্ট তুলে দেখালেন ডাক্তার মল্লিক, "তুমি আপসেট হোয়ো না অপর্ণা। সিস্টেমের সঙ্গে মানিয়ে নাও। বিলেতেও রানিরা কি কখনও স্বাধীন হয়? দেশের দশের জন্যে এটা একটা স্যাক্রিফাইস করছ ভেবে নাও।

অপর্ণার দুচোখ বেয়ে জল পড়ছিল। কোনওমতে শুধু জিজ্ঞাসা করল, "মাস্টার কে?"

"সরি। এটা বলা যাবে না। টপ সিক্রেট। তবে বলি মাস্টারের হাত অনেক দূর লম্বা। ধরতে চেয়ো না। বোকামো করবে।"

"আর বাচ্চার বাবা?"

"তুমি সত্যিই জানো না? তুমি তো ভিডিওটা দেখেছিলে!"

"মন দিয়ে দেখিনি। প্রবৃত্তি হয়নি।"

"তুমি আমার মেয়ের মতো। তবু বলব আর-একবার মন দিয়ে দ্যাখো। চিনতে পারবে হয়তো। এখন আর দেখালে ক্ষতি নেই। সব তো জেনেই গেছ", বলে মোবাইলটা বাড়িয়ে দিলেন ডাক্তার মল্লিক।

অপর্ণার দেখার ইচ্ছে ছিল না। তবু এবার তাকে দেখতেই হবে। ঝাপসা চোখে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়েরইল সে। পুরুষদেহটা তখন চেনেনি। এখন চেনা চেনা লাগছে। ক্যামেরা একটু উপরে উঠে কাঁধের কাছে যেতেই কালো জড়ুলটা স্পষ্ট দেখতে পেল অপর্ণা। যদিও এক ঝলকের জন্য। এই দেহ, এই মানুষ তার অতি চেনা। চারিদিকের সবকিছু, সব ভালোবাসা, সব বিশ্বাস, আস্থা মিলেমিশে বিরাট এক ধোঁকায় পরিণত হল এক লহমায়।

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল অপর্ণা। জানে না এরপর কী নিয়ে বেঁচে থাকবে। টেবিলে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতেই শুনতে পেল দরজা দিয়ে কেউ ঢুকছে আর মল্লিক তাকে বলছে, "এবার তুমি ওকে সামলাও। খুব আপসেট

হয়ে গেছে। আসলে তোমার সঙ্গে কানেকশানটা আইডিয়া করতে পারেনি বোধহয়।”

অপর্ণা বুঝতে পারল আগন্তুক তার দিকে এগোচ্ছে। সে গোটা শরীর শক্ত করে রইল। তার একেবারে কাছে এসে আলতো করে তার কাঁধে হাত রাখল ভূদেব মুখুজ্যের চন্দননগরের বন্ধু সুরেশ বাঁড়ুজ্যের প্রপৌত্র সুতনু ব্যানার্জি।

অষ্টম পর্ব- হাল ভেঙে যে-নাবিক

এতক্ষণ কেবল শৈলর কতা মনে আসচিলো আর ফুফুরে২ কাঁদচিলাম। রাত পুরিয়েছে সে খপর পাই নি। শুনতে পেলুম গঙ্গায় চান কত্তে যাওয়া বুড়ী গিন্নিরা হাসচেন আর বৌ-ঝিদের মুণ্ডপাত কচ্চেন। কে এক বুড়ো হেঁড়ে গলায় “শিব ধন্য কাশী, শিব ধন্য কাশী” আউড়াতে আউড়াতে দ্রুত পায়ে চানে চলেচেন। দূরে গড়ের মাঠে দিনের পথ্থম তোপ পড়লে। এতক্ষণে রাস্তায় গুরুচরণ ঘটিতোলা “কু-উ-উ-ও-র-র-ও-র-ঘ-টি-তো-ও-ও-লা” আওয়াজে বেড়িয়েছে। বাড়ির গিন্নিরা “অ্যাই ঘটি তোলা ইদিকে” বলে হাঁক পাচ্ছেন। ভারীরা বাঁকে করে বড় বড় কলসিতে জল এনে জলের ঘরের চৌবাচ্চায় ভরচেন। এদিকে ধোপদুরস্ত কাপড়, পরিষ্কার মেরজাই আর টুপি পরা দেশ্লাইওয়ালা “লে দেশ্লাই” বলে চিৎকার পাচ্ছেন। বাবুরা দুই পয়সায় এক বাক্স দেশ্লাই খরিদ কচ্চেন। ওই টং টং আওয়াজে ট্রাম চলা শুরু হল। ওই সাবাং বেচতে মুসলমান ফিরিওয়ালা বেরুল। কলকেতা সহরে ওই সকাল হল।

কাল সারারাত দুচোখের পাতা এক করিনি। পড়ে গেছি। যে-কোনো থ্রিলারের চেয়ে চমকে দেওয়া সব ঘটনা। এখন বাইরে তাকিয়ে দেখি ভোরের আলো সবে ফুটছে। কলকাতার সকাল। তারিণীর ডায়রিতে এই সকালের কথা

পড়েছি। খানিক আগেই। আমার খাট জুড়ে শীতালি পাখির মতো ছড়িয়ে আছে ধূসর কিছু পাতা। তারিণীচরণ রায়ের হারিয়ে যাওয়া ডায়রির পাতা। পাতা তো নয়, বোমা! সুকল্যাণ মিত্র আমাকে এই ডায়রি প্রথম পড়ার অনুমতি দিয়েছেন। তবু এখনও কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকছে গোটা ব্যাপারটা। একশো বছরের আগে ঘটে যাওয়া এক ষড়যন্ত্র, এক গুপ্ত সমিতি, মহারানি ভিক্টোরিয়া, প্রিয়নাথ, গণপতি, সব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ভূত ব্যাপারটাই এমন আজব, এমন মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া, প্রতিবার অসম্ভব মনে হচ্ছে। ছোটো থেকে আমাদের মধ্যে ফিকশন আর ননফিকশনের জগতের মধ্যে যে বিরাট খাড়া দেওয়ালটা তুলে দেওয়া হয়, তাতে সত্যিই একদিন যদি ফিকশনের কোনও চরিত্র আমাদের সামনে চলে আসে তবে আমরা চমকে উঠি। ভূত এমনই এক চরিত্র। এতকাল যে বইকে আমি নেহাত ভয়ের উপন্যাস হিসেবে জেনে এসেছি, আসলে সেটা সায়েন্স ফিকশন। ভুল বললাম। সায়েন্স রিয়েলিটি। আর সে রিয়েলিটি এতই শকিং যে মানতে পারছি না। চাইছি না।

তারিণীর ডায়রি কীভাবে তার কাছে ফিরে এল তা শুরুতেই ছোট্ট একটা চিরকুটে লেখা আছে। ১৯১১ সালের এক তারিখ। তলায় সই প্রি.ম.। তাতে লেখক জানাচ্ছেন, তিনি অসুস্থ। যে-কোনো দিন মারা যেতে পারেন। তাই তিনি যার যার সম্পত্তি তাকে ফেরত দিয়ে যাচ্ছেন। এটা তাঁর জীবনের শেষ সঠিক সিদ্ধান্ত। যদি তাই হয়, তবে ভূতের মুন্ডু যেমন তারিণীর কাছে চলে এসেছে, ধড়ও চলে গেছিল গোপালচন্দ্রের কাছে। বাড়ির পজেশন নেবার সময় দেবাশিসদা গণপতির ভূতের বাক্স পেয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত। না পেলে এত ঘটনা ঘটত না। তারপর কী হল? আমার জায়গায় সাইগারসন সাহেব থাকলে কী অনুমান করতেন? কিংবা তারিণী? প্রথমেই যেটা হওয়া খুব সম্ভব, সেটা হল লোভ। প্রিয়নাথের শেষ হাড় “নীবারসপ্তক”-এ যে কেসের কথা লেখা, সেই একই কেস তারিণীর ডায়রিতে আছে। আরও বিস্তারিত। বরং প্রিয়নাথ, যতদূর জানি, অনেকদিন পরে লিখতে বসেছিলেন। তখন তারিণীর এই দিনলিপিতে

ভরসা করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এই ডায়রিতে একেবারে শেষের পাতায় যে এন্ট্রি আছে, সেটাই আমাকে ভাবাচ্ছে। ১৯৫৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, কাঁপা হাতে লাল কালিতে লেখা একটা এন্ট্রি। পুরোনো কাগজে কালি চুষে নিয়ে থেবড়ে গেছে মাঝেমধ্যেই। হাতের লেখা তারিণীর, নিঃসন্দেহে। কিন্তু ভাষা একেবারে আধুনিক সাধুভাষা। ডায়রির ভাষা না। যেন কেউ কাউকে কোনও আদেশ করছে এমন ভাষা। লেখা রয়েছে-

এই অভিশপ্ত ডায়রিতে আবার লিখিতে হইবে ভাবি নাই। কিন্তু নিরুপায়। এই বৃদ্ধ বয়সে যে উপলব্ধি হইয়াছে, তাহা ওই যৌবনে না হওয়ায় উহা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। এখন বুঝিয়াছি ভূত আসলেই এক ভয়ঙ্কর আবিষ্কার, যাহা মানবজাতির কোন কল্যাণেই আসে নাই বা আসিতে পারে না। ইহা শুধুমাত্র মানবের লোভকে জাগ্রত করে, মোহাবিষ্ট করে, এক অলীক ভবিষ্যতের আশা দেখাইয়া তিলে তিলে উহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলে। নীবার এক উদ্দেশ্য লইয়া গঠন করা হইয়াছিল। আমরা কেহই লখন ওরফে ল্যানসন ওরফে ম্যানুয়েলকে এই সংগঠনের সভ্য করিতে চাহি নাই। কিন্তু যাহার সুরক্ষাহেতু আমাদিগের এই প্রচেষ্টা, সেই দ্রিনা ওরফে অ্যালিসের লখনের প্রতি এক অদ্ভুত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখিয়াছি। সে লখনকে ত্যাগ করিতে রাজি নহে। লখনের এই গুণটি আছে। দুর্বলচিত্তের মানব উহার নিকট আনকন্ডিশনাল সারেন্ডার করে। দ্রিনাও করিয়াছে। গণপতির বংশজ কেহ নাই। প্রিয়নাথের বংশধররা নীবার হইতে দূরে থাকিতে চাহে। টমসন সাহেব গত হইয়াছেন। তাহার কন্যা এক খৃষ্টানকে বিবাহ করিয়া সুখে আছে। নীবারে থাকিলেও তাহারা প্রায় গুরুত্বহীন। এই সুযোগে লখন ও তাঁহার পুত্র নীবারের সর্বেসর্বা হইয়াছে। এলাহাবাদ ও এডিনবরা ম্যাসনরির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। শুধু তাহাই নহে, বিলাতে রাজপরিবারকে প্রচ্ছন্ন হুমকি (blackmail) দিয়া সে নিয়মিত অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টায় রহিয়াছে। আমি বুড়া হইয়াছি। আমার সাধ্য নাই উহাকে নিরস্ত করা। ইদানীং সে দলে সদস্য বাড়াইবার নিমিত্ত বহিরাগত কিছু

অমিশুককে আনিয়া দলে ঢুকাইতে সচেষ্ট। আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা হইতে দিব না। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর কি হইবে তাহা স্বয়ং ঈশ্বর জানেন।

ডাক্তার গোপালচন্দ্র কিছুদিন হইল গত হইয়াছেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে আমাকে নিজের কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইয়া তিনি যে ভয়ানক তথ্য আমায় দিয়েছেন তাহা না বলিয়া গেলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। তিনি যাহা বলিলেন তাহার চুম্বকসার এইরূপ-

ভূত অমিত ক্ষমতাশালী। কিন্তু ভূত কাহারও নির্দেশে চলে না। যে ব্যক্তির উপরে ভূতের প্রয়োগ হইবে, তিনি প্রায়শই ভূতের প্রভাবে যিনি প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিবেন, ইহা ঠিক, কিন্তু এই রাসায়নিক অতীব ধূর্ত। মানবমনের হদিশ পাওয়াও দুষ্কর। তাই ভূতের প্রয়োগে মানব অন্যের বশবর্তী হইলেও কখনও কখনও ইহা অদ্ভুত এক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখায়। ফলতঃ আদেশ মানার পরিবর্তে ভূতের প্রভাবে মানুষ স্বয়ং আদেশকারীকেই আক্রমণ করিয়া বসে। ফলাফল মারাত্মক। আদেশকারীর ভয়াবহ মৃত্যু অবধি হইতে পারে। ডাক্তার গোপালচন্দ্র ইহা লইয়াই গবেষণা করিতেছিলেন। হয়তো ভূতের এই সমস্যাটি দূর করিতেও পারিতেন। কিন্তু তাঁহার গবেষণা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তাহাকে জাবুলন গবেষণাগার হইতে অপসারিত করে। ফলে আবিষ্কারটিতে এই ত্রুটি রইয়াই গিয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, ভূতের বিনাশ নাই। আজ হইতে শত সহস্র বৎসর পরেও এই ভয়াবহ রাসায়নিক তাহার ক্ষমতা হারাইবে না। ফলে আমি শুধু আমার সন্তানসন্ততিকে দৃঢ়ভাবে এই নির্দেশ দিয়া যাইতেছি যে, কোনদিন, কোন উপায়ে ভূতের নাগাল পাইলেও উহারা যেন ভূতের ফাঁদে পা না দেয়। ইহা আমাদিগের চরম বিনাশ ডাকিয়া আনিতে পারে।

নিচে তারিণীচরণ রায়ের সই। বাবা নির্ঘাত এটা পড়েছিলেন। আর পড়েছিলেন বলেই চিরকাল আমাকে নীবারের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে

গেছেন। বাবার উপর আক্রমণ এই ডায়রির জন্যেই হয়েছিল সন্দেহ নেই। খুব যদি ভুল না করি তবে সে আক্রমণ দেবাশিসদার কীর্তি। তাও সফল না হয়ে উনি আমাকে ধরেন। প্রথম দিনই দেখতে চেয়েছিলেন ব্যান্ডেল চার্চ নিয়ে আমি কী জানি। যদি জানতাম আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আমায় ধরিয়ে দিত। আমি জানতাম না। আর জানতাম না বলেই আরও ধন্দে পড়ে গেছিলেন দেবাশিসদা। সময় নিচ্ছিলেন। মাপছিলেন। আসল খোঁজ ছিল তারিণীর ডায়রির। ভেবেছিলেন সেখানে নিশ্চিতভাবে ভূত বানানোর ফর্মুলা লেখা আছে।

ব্যাগ থেকে কাল টেমারলেনের পিছনে লেখা ফর্মুলা বার করে দেখাতেই সুকল্যাণ মিত্র ডেকে নিয়েছিলেন ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের হেডকে। অনেকক্ষণ ধরে মন দিয়ে কাগজটা দেখলেন ভদ্রলোক। পাশের প্রিন্টার থেকে টেনে নিলেন একটা এ-ফোর শিট। পৃষ্ঠা ভরে উঠল কেমিক্যাল ফর্মুলায়। আর ভদ্রলোকের ফর্সা মুখ গম্ভীর হয়ে লাল হতে লাগল। অনেকবার কাটাকুটির পর ভদ্রলোক মাথা উঠিয়ে বললেন, "না স্যার। ইমপসিবল।"

"কী ইমপসিবল?"

"এই জিনিসটা ল্যাবে বানানো সম্ভব না। যদি ......

"যদি না কী?"

"এই দেখুন স্যার", মলাটটা সামনে মেলে ধরলেন ভদ্রলোক, "এটা একটা মাল্টিস্টেপ রি-অ্যাকশান। মোট সাতটা স্টেপ। এদের মধ্যে তিনটে একেবারে ইঞ্জি। প্রাইমারিরি অ্যাকটেন্টগুলো ইজিলি অ্যাভেলেবল। সেগুলো মিশিয়ে প্রথমে বুনসেন বার্নারে গরম করতে হবে আধঘণ্টা, তারপর বাকি চারটে স্টেপ, তারপর রুম টেম্পারেচারে এনে আধঘন্টা রেখে শেষে দশ মিলিলিটার ইথানল মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। ফাইনাল সলিউশনের রং সবুজ। এটাও লেখা আছে।"

"ইথানল মানে তো...'

“ইথাইল অ্যালকোহল। যা থেকে মদ বানানো হয়। আগেকার সব ওষুধে দিত। নানা হোমিওপ্যাথিক ওষুধে এখনও থাকে। কিন্তু সেটা সমস্যা না। সমস্যা মাঝের এই চারটে স্টেপে। প্রাইমারিরি অ্যাকশান হয়ে যাবার পর যে চারটে রিঅ্যাকটেন্ট দেওয়া হচ্ছে, তাদের নাম বা ক্যারেকটার কোথাও কিছু লেখা নেই। এই দেখুন চারটে লাল তালার মতো ছবি। আর প্রতি তালার উপরে একটা করে লেটার লেখা। B, H, U আর T। এই কেমিক্যালগুলো কী কে জানে? হয়তো যে লিখেছিল সে ভেবেছিল এগুলো চেনা কিছু হবে। কিন্তু এগুলো না পেলে এই বিক্রিয়া ঘটানো যাবে না।”

“আর পেয়ে গেলে?”

“ক্লাস টুয়েলভের ছাত্রও বানিয়ে দেবে। মানে ধরুন ওই চারটে কেমিক্যাল হল তালা, আর এই ফর্মুলা হল চাবি। দুটো একসঙ্গে না পেলে কেউ কিছু করতে পারবে না।“

“ধরুন কেউ যদি শুধু কেমিক্যালগুলো পায়?” আমি প্রশ্ন না করে পারলাম না।

“লাভ কী? ফর্মুলা না পেলে প্রথম স্টেপটাই তো করতে পারবে না। রিঅ্যাকশান শুরুই হবে না।”

“এ তো গেল রিঅ্যাকশান, বাকি গোটা দুই পাতা জুড়ে এত ফর্মুলা কী লেখা?” একটু হাসলেন ভদ্রলোক, “শুরুর দুটো উপাদানের একটা হোমোভ্যানিলিক অ্যাসিড। এককালে ল্যাবে খুব কষ্ট করে বানানো হত। সেটাই কীভাবে বানাতে হবে, তার পদ্ধতি লেখা। এখন যে-কোনো কেমিক্যাল সাপ্লায়ারকে বললেই এনে দেবে।”

“আর ওই চারটে নিয়ে কী লেখা আছে?”

“নাথিং।”

ফোনটা বাজছে। অমিতাভ মুখার্জি ফোন করেছেন। কিন্তু কেন? গতকাল ফেরার আগে সুকল্যাণ মিত্র একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, “তুমি

অমিতাভর সঙ্গে অ্যাসিস্ট করছ। করছ করো, কিন্তু সাবধানে। ও কিন্তু পুলিশের নর্ম খুব একটা মানে না। আইনও মেনে চলে না। পুলিশ বলে দুবার সাসপেন্ড হয়ে বেঁচে গেছে। কিন্তু তুমি একই কাজ করলে জেলের ঘানি টানবে। ও দেবাশিসের খুব কাছের লোক ছিল। দেবাশিসের খুনি ধরাকে ও পার্সোনাল ভেন্ডেটা হিসেবে ধরে নিয়েছে। ইমোশনালি এসব কাজ করলে একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদে পড়বে। তুমিও সঙ্গে সঙ্গে ফেঁসে যাবে। এটা নাও।” বলে ছোট্ট একটা জিনিস হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন আমার।

ফোন ধরলাম না। ফোন আবার বাজছে। এবার ধরতেই হল।

“কী করছ এখন? কোথায় আছ?”

“বাড়িতেই। কেন?”

“গ্রেট। আমি আসছি। তোমায় নিয়ে একটু চন্দননগর যেতে হবে।”

“কোথায়?”

“দেবাশিসদার বাড়ি। ওর বাড়িতে একটা গুপ্তঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে। দশ মিনিটে আসছি। নিচে নেমে দাঁড়াও।”

নবম পর্ব- চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা

১।

চুঁচুড়ার খরুয়াবাজারের দিক থেকে অটো সরাসরি লঞ্চঘাটে এল না। রাত হয়ে গেছে। প্রায় সাড়ে দশটা। বেশি দেরি করলে লাস্ট লঞ্চ মিস করবে ও। তাই অটো থেকে নেমেই লঞ্চঘাটের দিকে তাড়াতাড়ি পা চালাল। ঘাট পেরিয়ে ওপারে নৈহাটি যেতে হবে। সেখান থেকে ট্রেন ধরে কলকাতা। চেতলায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় মাঝরাত। কাল রাতে ফিরতে পারেনি। এখানে আটকে গেছিল। আজ না গেলেই নয়। দিনের বেলায় এই জায়গাটা গমগম করে। রিকশাওয়ালারা

"কোথায় যাবেন দাদা?" বলে অতিষ্ঠ করে মারে। এখন একটা জনপ্রাণী নেই। মন্দির আর বটতলাটা পার হয়েই আর একটুখানি। ঠিক এই সময় পিছন থেকে চাপা গলায় একটা ডাক শুনতে পেল। কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে "অভয়... অভয়..."

চমকে পিছনে তাকাল অভয়। এত রাতে এখানে কেউ তাকে কেন ডাকবে? পিছন ফিরতেই ছেলেটাকে দেখতে পেল সে। বটগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। অভয় পিছন ফিরতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। অভয় গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। হাতের সিগারেটটা মাটিতে ফেলে ছেলেটাই এগিয়ে এল এবার, "অভয়হিজড়া তো?"

অভয় উত্তর দিল না। তার নিরুত্তর থাকাকে সম্মতি ধরে নিয়ে ছেলেটা বলল,"আমাকে চিনিস?"

অভয়ের গলা শুকিয়ে এসেছে। তবু মাথা নেড়ে বলে, "চিনতে পারলাম না।"

"চিনিসনি? আচ্ছা। আসলে ইউনুস আমায় তোর কথা বলেছে।"

"কোন ইউনুস?"

"খিদিরপুরের। চিনিস না এমন ভাব করছিস?"

"সে তো জেলে। খুন করেছে।"

"কিছুই খবর রাখিস না। ইউনুস ছাড়া পেয়েছে। আজকে সকালে। তোরখোঁজ করছে।"

"কেন?"

"ও ধান্দাছেড়ে দেবে। খিদিরপুর খোলের কাম তোকেই সামলাতে হবে। পারবি?"

অভয়ের বুকের ধুকপুকানি এত বেড়ে গেছে, যেন বাইরে থেকেও শোনা যাবে। তবু সেটা বুঝতে না দিয়েঅভয় বলল, "সেটা তোমার মুখে শুনব কেন? ইউনুস আমার নিজে বলুক।"

“বলবে। ও আসলে এখানে আসতে চাইছে না। ওদিকটায় আছে। চল আমার সঙ্গে।”

“আমার খোঁজ পেলে কীভাবে?”

“খরুয়াবাজারের হিজড়া অফিসে তুই বুধবার করে আসিস, সেটা অনেকেই জানে। কিন্তু ইউনুস অফিসে যেতে চাইছে না। ওখানে সবাই প্রায় এর চেনা। জেল থেকে ফিরে ও দেশের বাড়ি চলে যাবে বলছে। তুই কি যাবি? না এখানেই থাকবি?”

“চলো। তবে তাড়াতাড়ি। লাস্ট লঞ্চ বেরিয়ে গেলে সারারাত আমায় এখানেই থাকতে হবে।”

ছেলেটা আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। ফেরিঘাটের বাঁ পাশ দিয়ে হনুমান মন্দির পেরিয়ে যে সরু রাস্তাটা সোজা চলে গেছে, দিনের বেলাতেই সেটা প্রায় নির্জন থাকে। এত রাতে তো কথাই নেই। খানিক এগিয়ে একটা ভাঙা বাড়ি। এককালে কোনও বড়োলোক মানুষ থাকতেন। এখনও সেইসব খিলানের কিছু অবশিষ্ট আছে। ভাঙা গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল ছেলেটা। অভয় ইতস্তত করতে বলল, “ভয় পাচ্ছিস নাকি? ইউনুস ভিতরেই আছে। আয়।”

অভয় ভিতরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়ে একবারে পোড়ো ভাঙা এক চাতালে উপস্থিত হল। কেউ নেই। এতক্ষণে অভয়ের ভয় করতে শুরু করেছে। এভাবে আসাটা ঠিক হয়নি। সে কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, “ইউনুস কোথায়?”

ছেলেটা খুব ধীরেসুস্থে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট লাইটার দিয়ে ধরিয়ে বলল, “এত তাড়াকীসের? সব হবে। একে একে। আগে তুই সত্যি কথা বল তো, আমার পিছনে লেগেছিস কেন?”

অভয় ধরা পড়ে গেছে। এই আশঙ্কাটাই সে করছিল। কিন্তু এখন আর পিছনে ফেরার উপায় নেই। সে চুপ রইল।

“অ্যাই শালা গিলিতোর, তোর মতো খজ্জরের বাটুতে ধুরপিট করে আমি খাই রে খানকি। সত্যি কথা বল, আমার পিছনে লেগেছিস কেন?”

অভয় পালাতে চাইল। ঠিক তখনই অন্ধকার থেকে প্রেতের মতন উদয় হল তিন-চারটেগুন্ডা মতো লোক। ঘিরে ধরে দাঁড়াল অভয়ের দুদিকে। পালাবার পথ নেই।

"পিছনে লাগিনি। ভুল করছ তুমি।"

"শোন, ভুল আমি করি না। ইউনুসের খোলায় সেদিন মরতে মরতে বেঁচেছি। তারপর থেকেই দেখছি তুই শালা ধুরানির মতো আমার পিছে লেগে আছিস। পুলিশের লোক? সত্যি কথা বল।"

কোনওমতে পাশাপাশি মাথা নাড়ল অভয়।

"কে তোকে পাঠিয়েছে? নাম বল। কেন পিছু নিয়েছিলিস?"

অভয় জানে এই কথা জানাজানি হলে তার মোগা তাকে আস্ত রাখবে না। তার মোগা ভয়ানক লোক। প্রয়োজনে তার দেশের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে বাবা, মা, বোনেরও ক্ষতি করতে পারে। সে চুপ রইল।

বিরাশি সিক্কার একটা চড় এসে পড়ল অভয়ের গালে। গাল জ্বালা করে। উঠল। তারপরেই একের পর এক চড় লাথি ঘুসি। অভয় ঠিক করে নিয়েছে সে কিছু বলবে না। আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা আছে তার। এত মারেও সে মুখ দিয়ে টুঁ শব্দ করল না। প্রায় মিনিট দশেক জনাচারেক মিলে বেধড়ক পেটাল তাকে। অভয় ব্যথায় কুঁকড়ে ছোটো হয়ে পড়ে আছে। গোটা দেহ কাঁপছে থরথর করে। দাঁত ভেঙে গেছে। চোয়ালও। দুচোখ বেয়ে জল পড়ছে। বুকের পাঁজরগুলো যেন এক্ষুনি ফেটে বেরিয়ে যাবে। সেই অবস্থাতেই সে বুঝতে পারল তার দুই হাত নিয়ে পিছনে শক্ত করে বেঁধে দিল কেউ। মুখে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে দিল একজন। পা দুটো বেঁধে দিল শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে। এরা তাকে নিয়ে কী করতে চাইছে? বেশিক্ষণ সাসপেন্সে থাকতে হল না। সেই ছেলেটা নিজের হাতে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে তার মাথা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল। দড়ি এঁটে দিল গলার কাছে। অভয় হাঁ করে শ্বাস নেবার চেষ্টা করতে লাগল। ভুল করল। ব্যাগের মধ্যে আটকে থাকা সামান্য অক্সিজেন ফুরিয়ে যেতে

লাগল দ্রুত। বুক ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কাটা মুরগির মতো প্রাণপণে ছটফট করতে শুরু করল। দুজন জোয়ান লোক তাকে চেপে ধরে রেখেছে। নড়াচড়ার উপায় নেই। ধীরে ধীরে চারদিকের পৃথিবী ঘোলাটে হয়ে গেল অভয়ের চোখের সামনে। এখন তার গোটা দেহ স্থির, শুধু হাঁ করা মুখ শেষ অক্সিজেনটুকুর জন্য হা-হুতাশ করছে।

২।

এই সবই রামানুজ নিজের কানে শুনেছিল। একদিন রাতে বেজায় মদ খেয়ে ঘরে ঢুকেছিল বিশ্বজিৎ। কী হয়েছিল কে জানে! শুধু হাউহাউ করে কাঁদছিল, আর বলছিল তার নরকেও ঠাঁই হবে না। সে মানুষ খুন করেছে। আসলে মনেপ্রাণে রামানুজকে ভালোবেসে ফেলেছিল বিশ্বজিৎ। রামানুজ সেটা বুঝত। আর বুঝত বলেই বিশ্বজিতের সঙ্গে থাকাকালীন অন্য কোনও পারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। সেই রাতেই নেশার ঘোরে বিশ্বজিৎ হড়হড় করে সব উগরে দেয়। খিদিরপুরে হিজড়াখোলে বাক্সটা অদ্ভুত পথে এসেছিল। এই বাক্সের আসল মালিক নাকি ছিল এক ম্যাজিশিয়ান। সে মরার পরে তার ওয়ারিশ ছিল না কেউ। এই বাক্স নানা হাত ঘুরে খিদিরপুরে আসে। খিদিরপুরে নাকি ইউনুসের এক মোগা ছিল। সে এই বাক্স ইউনুসের কাছে রেখে গেছিল। বাক্সে কী আছে কেউ জানত না। খুলতে পারলে তো জানবে! বিশ্বজিৎ একদিন এই বাক্স দেখে ফ্যালে। এটা কী, জানতে চাইলে ইউনুস বলে, এই বাক্সে ভূত আছে। এই বাক্স কেউ খুলতে পারে না। তার মোগা কয়েকদিন এটা তার কাছে লুকিয়ে রাখতে বলেছে। অদ্ভুত এই বাক্সটায় কোনও তালাচাবি নেই। কিন্তু এই বাক্স বিশ্বজিতের চেনা। ছোটোবেলায় ম্যাজিক দেখানোর শখ ছিল। তখন এইরকম বাক্স দেখেছে। কাঠের খাঁজে খাঁজে আটকানো থাকে। কোথাও ছোট্ট একটা গোঁজ থাকবেই। সেটা চাপ দিলে পাশাপাশি খুলে যাবে ড্রয়ারের মত। ইউনূস ঘর থেকে বেরোতেই বাক্সটা খুলে ফেলেছিল। ভিতরে অদ্ভুত পাঁচটা বোতল। চারটে তরল।

একটায় প্রায় অর্ধেকের বেশি সাদা বড়িতে ভরা। বোতলের গায়ে মড়ার গুলির চিহ্ন। ছোটো থেকেই বিশ্বজিতের মাথায় অদ্ভুত সব বিকৃত তামাশা ভর করে। একেবারে ছোটোবেলায় বন্ধুর সঙ্গে পাঁচিলে বসে গল্প করতে করতে আচমকাই তাকে ঠেলা মেরে ফেলে দিয়েছিল, শুধু কী হয় দেখার জন্য। বাড়িতে একটা পোষা টিয়াপাখি ছিল। সেটাকে ডানা বেঁধে তিনটে বিড়ালের মুখে ছেড়ে দিয়ে পরম তৃপ্তিতে বিড়ালদের ফিস্ট উপভোগ করেছিল। ঠিক তেমনই, যেন তামাশা করার জন্যেই ইউনুসের মনে একটা সাদা বড়ি ফেলে দিয়ে বাক্স বন্ধ করে রাখল। সেদিন সে বুঝেছিল ভূতে ধরলে কী হয়। এক চুলের জন্যে বেঁচে গেছে সেই দিন। কিন্তু স্বভাব যায় না ম'লে। সবার অলক্ষে বাগটা চুরি করে আনতে ভোলেনি।

সমস্যা শুরু তারপর থেকেই। কারা যেন তার পিছু নিচ্ছে। সবসময় মনে ভয়। এক হিজড়া সব জায়গায় তাকে ফলো করত। তাকে নিকেশ করেছে। কিন্তু শান্তি নেই। যেখানেই যায়, মনে হয় হাজার জোড়া চোখ তাকে ধাওয়া করছে। সব এই ভূতের বাক্সের জন্য। কিন্তু এই বাক্সের এমন তুক, সে না পারছে গিলতে, না পারছে সেটাকে ফেলে দিতে।

রামানুজ বিশ্বজিৎকে জড়িয়ে ধরে। ঠিক যেমন করে একজন মা বাচ্চাকে প্রবোধ দেয়। বিশ্বজিৎ ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল। বলছিল সে ভালো হয়ে যেতে চায়। রামানুজ তাকে বলেছিল তার পরিচিত একজন আছে, যে এই বাক্স নেবে। শুধু নেবে না, মোটা টাকায় কিনে নেবে। পরের দিন প্রথমবার দেবাশিস গুহ বিশ্বজিতের বাড়ি এসেছিল। দুজনে মিলে ঘর বন্ধ করে কীসব কথাও বলেছিল। সেদিন অনেক রাতে দেবাশিস চলে যাবার পর বিশ্বজিতের মুখে রামানুজ একজনের নাম শোনে। এই নাম সে জীবনে ভুলবে না। 'মাস্টার'।

৩।

রামানুজ এখন দাঁড়িয়ে আছে বিরাট উঁচু সেই বাড়িটার সামনে। এই বাড়িতেই মাস্টার আছেন। নিজের চোখে মাস্টারকে সে কোনও দিন দেখেনি। একেবারে শুরুর দিকে নাকি দেবাশিস নিজেই বিশ্বজিৎকে মাস্টারের সঙ্গে পরিচয় করায়। বেশ কিছুদিন মাস্টারের কথাই বলত বিশ্বজিৎ। মাস্টার বলেছেন তাকে দলের কাজে লাগাবেন। বলেছেন তাকে স্বাভাবিক জীবন দেবেন। কাপড়ের দোকানের কাজটা ছেড়ে দিতে চেয়েছিল বিশ্বজিৎ। মাস্টার মানা করেন। এতে নাকি লোকের সন্দেহ বাড়বে। কিন্তু তলে তলে দলের নানা কাজ করত সে। রামানুজ জানে। প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরত না। এভাবে কিছুদিন চলল। সমস্যা শুরু হল তারপর। একদিন বিশ্বজিৎ আবার চরম নেশা করে বাড়ি ফিরল। দেবাশিসকে নাকি দল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সঙ্গে তাকেও। সেদিন প্রথম বিশ্বজিৎকে ভয় পেতে দেখেছিল রামানুজ। ও বারবার বলছিল, "এরা ভালোর ভালো, খারাপের খারাপ।" কারা? সঠিক জানে না রামানুজ। তবে সে একজনকে চেনে। মাস্টার। একদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছিল। সঙ্গে ছবি। সেই ছবি দেখে চমকে গেছিল বিশ্বজিৎ। মন্ত্রীমশাইয়ের ঠিক পাশেই অমায়িক চেহারার একটা লোক। মুখে মৃদু হাসি। বিশ্বজিতের গলা কাঁপছিল। ধরা গলায় সে রামানুজকে ডেকে জানায়, "এই দেখ। এই যে বাঁদিকে। এই আমাদের মাস্টার। দেখতে এমন হলে কী হবে? খতরনাক লোক। একটু বেচাল করলেই জানে মেরে দেবে।"

"তোমাকেও?"

"আমি তো চুনোপুঁটি এর কাছে। দরকারে দেবাশিস গুহকেও খতম করে দিতে পারে।"

রামানুজ জিনসের প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরাল। এখনও সময় লাগবে। কম করে হলেও ঘন্টাখানেক। কিন্তু তাকে এই কাজ করতেই হবে। গোলাপ বলেছে পারিকের বদলা ছিবড়িকেই নিতে হয়। নইলে

মরার পরে দেবী বহুচেরা নরকে পাঠান। বিশ্বজিৎ সবসময় ভয়ে থাকত মাস্টার তাকে মেরে ফেলে দেবে। সেই তো দিল। সেদিন পালিয়ে যাবার আগে বিশ্বজিতের সেই ভয়জড়ানো চোখ রামানুজ ভুলবে না। এতদিনে সুযোগ এসেছে শোধ নেবার। ওই তো, গেট দিয়ে লোকটা বেরোল ......

৪।

মেইলটা পেয়ে খানিক চুপ করে বসে রইলেন মাস্টার। এমনটা তো হবার কথা ছিল না! তিনি একবার ভাবলেন ঘুরিয়ে ফোন করেন। কিন্তু লাভ হবে কি? এলাহাবাদ অবধি আর উৎসাহ দেখাচ্ছে না। যে সময় সবচেয়ে বেশি ম্যাসনিক ব্রাদারহুডের সাহায্য লাগবে, সেই সময়ই আচমকা তারা এভাবে হাত গুটিয়ে নেবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি মাস্টার। লন্ডন আর এডিনবরা ব্রাদারহুড জানিয়েছে দুটোতেই নতুন গ্র্যান্ডমাস্টার এসেছেন, যাঁদের কেউই আর এই ব্যাপারটা নিয়ে আগ্রহী নন। শেষ চেষ্টা করেছিলেন কাল রাতে। সরাসরি বার্কিংহ্যাম প্যালেসে মেইল করে। এইমাত্র জবাব এল, সাতদিন আগে যে সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছিল, সেটাই বলবৎ থাকবে। ব্রিটিশ সরকার অর্থনৈতিক সংকোচনের জন্য রানির ভাতা কমিয়ে দিচ্ছেন। ফলে নীবারের খাতে যে টাকাটা নিয়মিত আসত, সেটা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হল। এর বদলে নীবার যদি কোনও পদক্ষেপ নেয়, তার জন্যেও ব্রিটিশ রাজবংশ তৈরি।

বেশ খানিকক্ষণ মাথা টিপে বসে রইলেন মাস্টার। এই কি তবে শেষ? আসলে ব্রিটেনের রাজবংশ তাদের আগের গৌরব হারিয়েছে। এতরকম স্ক্যান্ডালে জড়াচ্ছে রোজ, আরও একটা নতুন স্ক্যান্ডাল কয়েকদিন সাড়া ফেলবে সোশ্যাল মিডিয়াতে হয়তো। এর বেশি কিছু হবে না। কাউকেই অনন্তকাল ধরে ভয় দেখিয়ে রাখা যায় না। এই দিনটা আসবে মাস্টার জানতেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি, সেটা বোঝেননি।

অবশ্য ইঙ্গিত পেয়েছিলেন অনেক দিন থেকেই। দেবাশিসকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকেই তাসের ঘরের মতো সবকিছু ভেঙে যেতে লাগল। দেবাশিস বাসুর হাতে মরল। বিশ্বজিৎকে মরতে হল। তুর্বসু এই কেসে জড়িয়ে গেল। নিশীথ ধরা পড়ল। আর সবচেয়ে খারাপ যেটা হল, সেটা অপর্ণার কেসটা। মাস্টার মনেপ্রাণে চাইছিলেন অপর্ণা যাতে এর থেকে দূরে থাকে। ওকেও না জানিয়ে থাকা গেল না। এদিকে এই মেইল। এখন নীবার কীভাবে চলবে, কিংবা আদৌ চলবে কি না, সেটাই বড়ো প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে গেল। মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরোলেন মাস্টার। হাতে চামড়ার ব্যাগে দরকারি কাগজপত্র। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সামান্য হোঁচট খেলেন। একেবারে অভ্যাসবশেই গলার আই কার্ড সোয়াপ করে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। বেরোতে বেরোতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। চারিদিকে অন্ধকার হয়ে গেছে। গাড়ি সার্ভিসে দিয়েছেন। একটু হেঁটে বাস ধরে বাড়ি যাবেন।

মাস্টারের মন তাঁর বশে নেই। থাকলে বুঝতে পারতেন তিনি বেরোনো মাত্র উলটো দিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে সিগারেট টানতে থাকা এক ছোকরা সিগারেট ফেলে তাঁর পিছু নিল। একটু এগিয়ে বাঁদিকের গলিটা ধরলেন মাস্টার। এই গলিটা বড্ড সরু। দুইদিকে উঁচু দেওয়াল। একজনই কষ্ট করে যেতে পারে। উলটো দিক থেকে কারা যেন আসছে। শাড়ি পরা। কিন্তু চলাফেরায় পুরুষালি ভাব। হাতে ঘণ্টা আর ঢোল। বাজনা বাজাচ্ছে আর তারস্বরে গান গাইছে "তোর পিরিতে পইড়া আমার জীবন অন্ধকার / লক্ষ্মী আমার সোনা ছাইড়্যা যাইও না কো আর।" এতক্ষণে মাস্টারের সংবিৎ ফিরল। তিনি দ্রুত পিছন ফিরে দৌড়াতে যেতেই দেখেন ফিনফিনে রোগা একটা ছেলে, কালো টিশার্টে অ্যাচিভার লেখা, তাঁর দিকে বন্দুক তাগ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বোঝার আগেই এগিয়ে আসা হিজড়াদের একজন নাচতে নাচতেই তাঁর হাত দুটো চেপে ধরল। সামনে ছেলেটা পকেটের রুমাল বার করে তাতে বোতল থেকে কী যেন নিয়ে মিশিয়ে চেপে ধরল মাস্টারের নাকে। মাস্টার হাত পা ছোড়ার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে। সেই

হিজড়া শক্ত হাতে তাঁকে চেপে ধরে আছে। মাস্টার জ্ঞান হারালেন। তখনও গান চলছে, “তোর পিরিতে পইড়্যা আমার... ”।

ধস্তাধস্তিতে মাস্টারের পকেটে ঝোলানো আইডেন্টিটি কার্ড খসে পড়ল। কেউ খেয়াল করেনি। গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে তাঁকে চাপিয়ে নিয়ে চলে যাবার অনেক পরে এক কলেজ স্টুডেন্ট সেই রাস্তায় আইসক্রিম খেতে খেতে যাচ্ছিল। রাস্তার চুঁইয়ে আসা আলোতে কার্ডটা দেখে সে তুলে নেয়। দ্যাখে তাতে এক প্রৌঢ় মানুষের ছবি। নিচে লেখা- প্রশান্ত মজুমদার। ডিরেক্টর। ডিরেক্টরেট অফ স্টেট আর্কাইভ। ওয়েস্ট বেঙ্গল।

দশম পর্ব- সময়কেযতদূর দেখা যায় চোখে

দশ মিনিট লাগল না। ঠিক সাড়ে সাত মিনিটের মাথায় অফিসার মুখার্জির এসইউভি-টা এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। “উঠে এসো”, দরজা নিজের হাতে খুলে বললেন অফিসার। একেবারে প্রথম দিনের মতো আজও ভিতরে কনকনে ঠাণ্ডা এসি চলছে। অফিসার মোবাইলে কিছু একটা দেখছিলেন। বন্ধ করে বললেন, “চন্দননগর যেতে হবে। তবে তার আগে অন্য এক জায়গায় যাব।”

“কোথায়?”

“বড়বাজারে। বিশ্বজিতের দোকানে।”

“কেন? সেখানে কী?”

“দোকানের ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। বলেছি যেদিন বিশ্বজিৎ শেষ দোকানে গেছিল, সেদিনের ফুটেজ কালেক্ট করে রাখতে। এইমাত্র মালিক ফোন করে যেতে বলল। আগে ওখানকার কাজ সেরে, তারপর চন্দননগর।”

জোড়াসাঁকো দিয়ে বড়বাজারে ঢুকতে ঢুকতেই অনেকটা সময় জ্যামে নষ্ট হল। বড়বাজার থানার ভিতরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। চারিদিকের লোকের ভিড়, রাস্তার আওয়াজে কান পাতা দায়। কোনওমতে ভিড় ঠেলে বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে ঢুকেই পাইকারি শাড়ি, চাদর, পর্দার কাপড়, কাটা কাপড়ের দোকান। ছোটো ছোটো গুমটি মতো। সামনে অনেকে দাঁড়িয়ে দরদাম করছে। তাদের পাশ কাটিয়ে খানিকটা যেতেই তামান্না শাড়ি মিউজিয়াম। এই দোকানটা আমি চিনি। বিশ্বজিৎ আমার হয়ে যে সামান্য দু-একটা কাজ করেছে, তার পেমেন্ট এই দোকানের পাশে ভুজাওয়ালার দোকানে দাঁড়িয়েই নিত। কিন্তু দোকানের ভিতরে ঢুকিনি কোনও দিন। অফিসার আমাকে নিয়ে সোজা ঢুকে গেলেন ভিতরে। মাথায় ফেজ টুপি, দাড়িওয়ালা সাদা পোশাকের এক ভদ্রলোক আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। ইনিই সম্ভবত মালিক। অফিসারকে চেনেন। ছোট্ট একটা সেলাম করে "আইয়ে স্যার" বলতেই অফিসার "আজ হাতে একদম সময় নেই। ওটা রেডি আছে?" জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রলোক আমাদের "জি জি" বলে পাশের একটা ছোট্ট ঘুপচি ঘরে নিয়ে উপস্থিত করলেন। ঘরে ডাঁই করা কাপড়ের গাঁটরি বাঁধা। একপাশে একটা ছোট্ট কম্পিউটার। একটা রোগামতো ছোকরা বসে কী যেন করছে। আমাদের দেখে সে শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

"নাসির বেটা, ইনলোগোকো উস ফুটেজ দিখাও। ও বিশোয়াজিত কা লাস্ট ডে-ওয়ালা।"

নাসির ছেলেটি বাংলা ভালোই বলতে পারে। মুখার্জিকে "বসুন স্যার, হামার চেয়ারে বসুন", বলে চেয়ারছেড়ে দিল। আর-এক কর্মচারী কোথা থেকে আমাকেও একটা চেয়ার এনে বসার ব্যবস্থা করল। আমাকেও পুলিশের লোক ভেবেছে বোধহয়।

"এই যে স্যার। এটা ২০ জুন কা ফুটেজ। আমরা সোব অলগ অলগ ফোল্ডারে ডেট ওয়াইজ রাখি। সোকাল থেকে দেখবেন?"

"না, না", একটু অধৈর্য হয়েই বললেন মুখার্জি। "বিশ্বজিৎ বাড়ি গেছিল কখন? তার একটু আগে থেকে দেখাও।"

"আচ্ছা, ওই দিন কি সুশোভন মহাপাত্র এসেছিলেন? এমএলএ সুশোভন। তার বান্ধবীকে নিয়ে শাড়ি কিনতে?" আমি না বলে পারলাম না।

অফিসার দেখলাম আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকালেন। ছেলেটাও বেশ চমকাল। একটু আমতা আমতা করে বলল, "হ্যাঁ স্যার। উনি তো আমাদের রেগুলার কাস্টমার। প্রায়ই আসেন। ওনেক টাকার চিজ কিনেন।"

"কুড়ি তারিখও এসেছিলেন?"

"জি হ্যাঁ।"

"ওখান থেকেই দেখাও।"

নাসির মিডিয়া প্লেয়ারে ভিডিও খুলে টেনে প্রায় পিছনে নিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দিল। একটু আগুপিছু করে বলল, "দেখুন স্যার। এই যে ওরা। ঘুসছেন।"

ভিডিওতে কোনও আওয়াজ নেই। নেতামশাই আর তাঁর বান্ধবী মিডিয়ার দৌলতে সবার পরিচিত। আমি ওদের দেখছিলাম না। দেখছিলাম বিশ্বজিৎকে। ওরা ঢোকা মাত্র ও নিজের জায়গা থেকে সরে গেল একেবারে ধারে। ফ্রেমের এক কোণে ওকে দেখা যাচ্ছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ও পকেট থেকে ফোন বার করল। ফোন করছে। এবার রেখে দিল।

"কাকে ফোন করল জানো?" অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমাকে। এই সেই কাজ। যার কথা বলেছিলাম।"

"গুড।"

তারপর মিনিট কুড়ি শুধু শাড়ি নামানো, শাড়ি বাছা চলল। বিশ্বজিৎ নিজেও দুই একটা শাড়ি খুলে দেখাল। এবার একটা ফোন এল তার কাছে। একটু সরে ফোন ধরে মুখে হাত চাপা দিয়ে কথা বলছে বিশ্বজিৎ। অফিসার আমার দিকে তাকালেন।

“আমি করেছিলাম। করে বলেছিলাম দুজনের ভিডিও তুলতে। গোপনে। আমি পাঁচশো টাকা দেব।”

বিশ্বজিৎ ফোন কাটল। কীসব খুটখাট করে ফোনটা আর জিন্সের প্যান্টের পকেটে ঢোকাল না। ঢোকাল বুকপকেটে। ও আমার কথা শুনেছিল। মোবাইল ক্যামেরা শিওর বাইরের দিকে আছে। বিশ্বজিৎ গোপনে ওদের ছবি তুলছে। আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এঁরা চলে গেলেন। বিশ্বজিৎ পকেট থেকে মোবাইল বার করে ক্যামেরা অফ করল। রেখে দিল জিন্সের পকেটে। এবারই আসল। একটু পরেই কিছু একটা ঘটেছিল। বিশ্বজিৎ ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছিল। বলেছিল ওর নাকি শরীর খারাপ লাগছে। কী এমন হল এরপর? রামানুজ বলেছিল বাড়ি ফিরে ও নাকি পাগলের মতো করছিল। “আঁখ লাল। ডরা হুয়া। য্যায়সে কোই ভূত দেখ লিয়া হো।” কী হয়েছিল এরপরে? আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফুটেজ দেখতে লাগলাম। প্রথম আধঘণ্টা প্রায় কিছুই হল না। তারপর এক কাস্টমার দরজা দিয়ে ঢুকলেন। মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। বিশ্বজিৎ তাঁকে দেখেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। তিনি খুব ক্যাজুয়ালি, যেন শাড়ি দেখছেন, এমনভাবে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সোজা বিশ্বজিতের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বিশ্বজিৎকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে চরম অস্বস্তিতে রয়েছে। কিংবা ভয়ে। এই ঘরটায় এসি চলে। তাও একবার রুমাল বার করে ঘাম মুছল। ভদ্রলোক বিশ্বজিৎকে কিছু একটা দেখাতে বললেন। বিশ্বজিৎ একটা শাড়ি বার করে দেখাল। ভদ্রলোকের পিঠ ক্যামেরার দিকে। মাথা নিচু। কিন্তু তিনি বিশ্বজিতের সঙ্গে কথা বলছেন। বিশ্বজিতের ঠোঁট নড়ছে। সে উত্তেজিতভাবে কিছু বলার চেষ্টা করছে। ভদ্রলোক হাত তুলে ওকে থামতে বললেন। তারপর স্পষ্ট দেখলাম হিপ পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে সেখান থেকে কিছু একটা তিনি বিশ্বজিতের হাতে গুঁজে দিলেন। একটা কাগজ। সে কাগজে কিছু লেখা। বিশ্বজিৎ তাতে চোখ বুলিয়েই সেটা বুকপকেটে রেখে দিল। ভদ্রলোক আরও কয়েকটা শাড়ি নেড়েচেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাবার ঠিক আগে জাস্ট একবার

পিছনে ঘুরে তাকালেন। আর তখনই সিসিটিভি ক্যামেরায় পরিষ্কার দেখা গেল তাঁকে। আমার মুখ দিয়ে অজান্তেই একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল। এ লোক তো আমাদের চেনা! কিন্তু... অফিসার মুখার্জি খানিক আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "চলো, জিজ্ঞাসাবাদ করার আর-একজন বাড়ল।"

ভদ্রলোক চলে যাবার পর বেশ খানিক সময় বিশ্বজিৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল। কী যেন ভাবল খানিক। পাশের ছেলেটি কথা বলতে যেতে মাথা নাড়ল বেশ কয়েকবার। তারপর সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"বাস! ইতনা হি। ইসকে বাদ উয়ো নিচে গিয়ে আব্বুর থেকে ছুটি নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ি ভেগে গেছিল। ফির অউর নেহি আয়া।"

"ঠিক আছে। এই অংশটা একটা পেন ড্রাইভে নিয়ে দাও। আমি রিসিভ করে নিচ্ছি। আর হ্যাঁ। এই ফুটেজ ডিলিট করবে না। তোমাদের কাছেও কপি রাখো।"

"জি স্যার।"

দোকানের কাজ মিটতে মিটতে আরও মিনিট পনেরো গেল। দুপুর হয়ে গেছে প্রায়। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে চন্দননগরের দিকে চালাতে বলে মুখার্জি বললেন, "সকালে কিছু খাওনি নিশ্চয়ই। আমিও না। রাস্তায় খেয়ে নেব।"

আমার খিদে পাচ্ছিল না। একটু আগে সিসিটিভি ফুটেজে যাঁকে দেখলাম, তাঁকে দেখার পর আমার খিদে তেষ্টা সব উবে গেছে।

"আপনি ভেবেছিলেন...." আমি বলা শুরু করতেই অফিসার চোখের ইশারায় আমায় থামিয়ে দিলেন। ইঙ্গিতে দেখালেন ড্রাইভারকে। মানে এর সামনে কথা বলা যাবে না।

বালি হয়ে চন্দননগর যাবার পথে রাস্তার ধারে একটা হোটেলে খেয়ে নিলাম। দুজনে। গোটা রাস্তায় মুখার্জি একটাও কথা বললেন না। প্রশ্ন করলেও উত্তর দিচ্ছেন না। অস্বাভাবিক গম্ভীর। কী ব্যাপার কে জানে! চন্দননগর পৌঁছাতে বিকেল হয়ে গেল। আমার কেন যেন একেবারে প্রথম দিনের কথা মনে পড়ছিল।

সেই অমিতাভ মুখার্জি, সেই গাড়ি, সেই ড্রাইভার, আবার দেবাশিসদার বাড়ি। সবকিছু চক্রাকারে ফিরে আসছে জুন মাসের কুড়ি তারিখের মতো। বাড়ির কাছে পৌঁছে দেখি সদর দরজা তালা মারা। সামনে একজন কনস্টেবল টুলে বসে খইনি ডলছে। মুখার্জিকে দেখেই সে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকল।

"দরজা খুলতে হবে। কিছু ইনভেস্টিগেশান আছে।"

"কিন্তু স্যার..."

পকেট থেকে একটা ছাপা কাগজ বার করল মুখার্জি। "এই যে অর্ডার আছে। দেখে নাও।" কনস্টেবল কী বুঝল জানি না। খানিক উলটে পালটে কাগজটা দেখল। তারপর "ঠিক আছে স্যার" বলে দরজা খুলে দিল।

"আর-একটা কথা শোনো। আজ থেকে এখানে লালবাজারের পুলিশ পোস্টিং থাকবে। একটু পরেই আসছে। তুমি আমার গাড়িটা নিয়ে চন্দননগর কমিশনারেটে চলে যাও। আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে রিলিজ দিয়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু স্যার, মেন দরজায় কেউ থাকবে না?"

"আমি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিচ্ছি। লালবাজারের লোক এলে ওদের চার্জ হ্যান্ডওভার করে আমি যাব।"

কনস্টেবল আর কথা বাড়াল না। গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে ছোটো একটা মুগুর টাইপ একটা অস্ত্র বের করে আনলেন মুখার্জি।

"এটা কী?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"হাতিয়ার। কখন কী কাজে লাগে।"

"ভিতরে কাউকে এক্সপেক্ট করছেন নাকি?"

"কিছু বলা যায় না।"

"তাহলে তো ওই কনস্টেবল থাকলে..."

"দরকার নেই। দ্য লেস, দ্য মেরিয়ার। লেটস গো।"

"আচ্ছা ওই সিসিটিভি ফুটেজে..."

"সেসব পরে হবে। আগে ভিতরে তো ঢুকি।"

ভিতরে ঢুকতে যেটা প্রথমেই নাকে এল সেটা অদ্ভুত এক গন্ধ। কাঁচা মাংস, কিংবা রক্ত বাসি পড়ে থাকলে যেমন চিমসে গন্ধ বেরোয় অনেকটা সেইরকম। অফিসার সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে গেলেন উপরে। পিছন পিছন আমিও। উপরের যে ঘরে দেবাশিসদা খুন হয়েছিলেন, দরজায় জাস্ট ছিটকিনি লাগানো। ভিতরের রক্ত কেউ সাফ করে দিয়েছে। কিন্তু জিনিসপত্র এলোমেলো হয়ে আছে আগের মতোই। কে-ই বা গোছাবে! অফিসার সেগুলো প্রায় মাড়িয়েই চললেন বাথরুমের দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এদিকে এসো। ওই গোপন ঘরটা এই বাথরুমের মধ্যে দিয়েই যেতে হয় খুব সম্ভব। দেবাশিসদার মোবাইলটাও তো এখানেই পাওয়া গেছে।"

অফিসারের পিছু পিছু আমিও ভিতরে ঢুকলাম। যে-কোনো সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়ির বাথরুমের মতো। শাওয়ার, কমোড, হ্যাঙ্গার, দেওয়াল আয়না। অফিসার চারদিকে দেখতে লাগলেন। কোথাও কোনও দরজার চিহ্নমাত্র নেই। আমার অনেকদিন আগে পড়া শার্লক হোমসের একটা গল্প মনে পড়ল। বললাম, "ফিতে আছে? মাপবার?"

"কেন? কী কাজে লাগবে?"

"দরকার ছিল। আছে?"

"উঁহুঁ। আমি কি কাঠের মিস্ত্রি নাকি যে পকেটে ফিতে নিয়ে ঘুরব?"

ততক্ষণে আমি একটা লম্বা নাইলনের দড়ি পেয়ে গেছি। এক প্রাপ্ত অফিসারকে দিয়ে বললাম, "ধরুন দেখি। একটু মাপি।"

অফিসার বিনাবাক্যব্যয়ে ধরে রইলেন। আমি বাথরুমের ভিতরের মাপটা দড়ি ধরে নিয়ে নিলাম। বর্গাকার বাথরুম। চোখের আন্দাজে মনে হচ্ছে দশ ফুট বাই দশ ফুট।

"এবার নিচে চলুন। লাস্ট আর-একটা মাপ লাগবে। বাইরে থেকে।"

মাপতে হল না। চোখের দেখাতেই বোঝা যাচ্ছে একদিকে প্রায় ডবল লম্বা। তাহলে গোপন ঘরটা এই দিকেই আছে। আবার বাথরুমে গেলাম। যেদিকে

সন্দেহ করছি, সেদিকে একটা দেওয়াল আয়না। ঠেলাঠেলিতে কাজ হল না তেমন। আমি খুঁজতে লাগলাম। কিচ্ছু নেই। তারপরেই মনে এল গণপতির বাক্সের কথা। দেবাশিসদা সেই বাক্সের কথা জানতেন। যে বাক্স পাশাপাশি খোলে। দেখি না, যদি এটাও...

পাশ থেকে সামান্য ঠেলা দিতেই আয়না স্লাইডিং ডোরের মতো একদিকে খুলে গেল। পিছনে একটা অন্ধকার ঘর। অফিসার মুখার্জি যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না। আসলে পুলিশের গোয়েন্দাদের এই এক সমস্যা। প্রাইভেট ডিটেকটিভদের মানুষ বলে মনে করেন না।

মুখার্জি অবাক, "তুমি এই ঘরের কথা জানতে?"

"মোটেই না। আজ আপনার থেকেই শুনলাম প্রথম।" অপর্ণার কথা ইচ্ছে করেই বললাম না। দরকার কী?

"তাই? সত্যি বলছ?"

"একদম। মিথ্যে বলে আমার লাভ?"

"তাহলে খুললে কী করে?"

"যেমন করে আপনি সেই বাক্স খুলেছিলেন লাইব্রেরিতে।"

"ওকে চলো। ভিতরে চলো।"

আমি নিজে আগে ঢুকলাম না। মৃদু হেসে অফিসারকে বললাম, "আপনিই প্রথমে ঢুকুন।"

ঘরটা অন্ধকার। কোনও জানলা নেই। ঢোকার জন্য পথ একটাই। এই বাথরুম। পিছন দিক থেকে ঢোকার কোনও উপায় নেই। নিশ্ছিদ্র দেওয়াল। অবশ্য তারপরেও একটা উপায় থাকে। নিচে পিছনের দিকে একটা দরজা আছে। সেটা পিছনের উঠোনে খোলে। ইয়েল লক লাগানো। বাড়ির পিছনে মাঠ। মাঠের উপর দিয়ে রাস্তা। একটা ছোটো খিড়কির দরজা সেদিকে খুলেছে। আমি যতবার ট্রেনে চেপে এসেছি, দেখেছি ওই পথে শর্টকাট হয়।

আমি এসব ভাবছি। এদিকে অফিসার মুখার্জি দেওয়াল হাতড়ে একটা স্যুইচ খুঁজে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন। ঘরটা দেখে আমি অবাক হলাম। অনেকটা নার্সিংহোম বা হাসপাতালের রুমের মতো। মাঝে একটা লোহার খাট পাতা। তাতে সাদা চাদর। বালিশ। বিছানা। চেয়ার। একটা টেবিল। পাশে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি রাখা। একটাই বড়ো মেশিন। এতে হার্টবিট, পালস ইত্যাদি মাপে। বাবা যখন শেষের দিকে নার্সিংহোমে ভরতি ছিল, তখন দেখেছিলাম। আরও কিছু যন্ত্র। সুগার, প্রেশার ইত্যাদি মাপার। বেশ কিছু সিরিঞ্জ। খালি। এগুলো দিয়ে কী হত কে জানে! *Sick experiment...* সুকল্যাণবাবুর কথাগুলো মনে পড়তেই শিউরে উঠলাম। একধারে দেরাজের মধ্যে বেশ কিছু ইংরাজি বই রাখা। মুখার্জি সেগুলো উলটে পালটে দেখছিলেন।

“এদিকে দ্যাখো”, আমায় ডাকলেন, “বেশিরভাগ হিউম্যান অ্যানাটমি আর ফিজিওলজির বই। কিন্তু একটা বই বেশ অড। এইটা”, বলে পাতলা একটা পেঙ্গুইন পেপারব্যাক বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। একঝলক দিয়েই বুঝলাম যা ভেবেছিলাম তাই। এই ঘরেই ডাক্তার জেকিলকে মিস্টার হাইড বানাতেন দেবাশিসদা। কে সেই হাইড? বাসু? বাসুকি? তাহলে জেকিলটা কে?

মুখার্জির সঙ্গে আমিও হাত লাগালাম কাগজপত্রে। নোটস বা ডায়রি জাতীয় কিছু পেলে ভালো হয়। সেসব কিচ্ছু নেই। এক কোণে একটা বুনসেন বার্নার। সঙ্গে গ্যাসের লাইন যোগ করা। বার্নারের ঠিক পাশে একগাদা পোড়া কাগজের স্তূপ। তবে কেউ খুব তাড়াহুড়ো করে সব জ্বালিয়েছে। বেশ কিছু কাগজ আধপোড়া অবস্থায় লুটোচ্ছে এদিক ওদিক। আমি মাটি থেকে একটা হলদেটে কাগজ তুললাম। এটার তলার দিকে বেশ খানিকটা পড়া যাচ্ছে। কালো কালিতে কাঁপা হস্তাক্ষরের লেখা। যেন কোনও বৃদ্ধ লিখেছেন-

হে শান্তিময় পিতঃ! তোমার নিকট এখন এই প্রার্থনা যে, ভবিষ্যতে এইপ্রকার পাপের কুহকে কখনোই যেন আমাকে ভুলাইতে না পারে। আমার

আন্তরিক ইচ্ছা জীবনের শেষ সময়ে যেন একাকী বসিয়া জগৎপিতাকে প্রাণভরে স্মরণ করিতে পারি।

আমার জার্নাল এই স্কুলেই সমাপ্ত হইল।

নীবারসপ্তক। প্রিয়নাথের শেষ হাড়। ছিল। নেই। সেই হাড়ের শেষ পাতা এখন আমার হাতে ধরা। প্রথম পাতা দেখেছিলাম সেই কবে। স্টেট আর্কাইভে। আমার কাছে দেবাশিসদার সেই চার লাইনের অর্থ স্পষ্ট হচ্ছে।

প্রিয়নাথের শেষ হাড়

তৈমুরের কাব্যগাথা

গণপতির ভূতের বাক্স

তারিণীরছেঁড়া খাতা

মাস স্কেলে ভূত বানাতে গেলে এই চারটেই লাগবে। দুটো ওঁর কাছে ছিল। বাকি দুটোর খোঁজে ছিলেন দেবাশিস গুহ। কিন্তু এখন ঠিক উলটো অবস্থা। আমার কাছে সেই দুটো আছে, কিন্তু প্রিয়নাথের হাড় শেষ আর ভূতের বাক্স কোথায় জানা নেই। পাশে আর-একটা পাতা প্রায় অক্ষত অবস্থায়। নতুন চকচকে পৃষ্ঠা। কোনও স্পাইরাল বাউন্ড খাতা থেকে ছেঁড়া। সেখানে জড়ানো অক্ষরে যেন লেখাপড়া জানে না এমন কেউ লিখেছে।

আমি বাসু। আমি বাসুকি। আমার পাঁচটি ফণা। আমিই হলাহলের রজ্জু। আমি বিষ উগরে অমৃত তুলে আনি। আমার মাথার ভিতরে আর কিছু নেই। শুধু নিস্তব্ধতা। চারিদিকে আলো আর আওয়াজ। আমি স্থির। আমি জানি আমাকে কী করতে হবে। আমি জানি কী অদ্ভুত উপায়ে আমি বাসুকি হয়ে যাই প্রতিবার। আমার আর মাথা ঘোরায় না। আমার শরীরে আর ব্যথা হয় না। আমার শরীরে এখন অমানুষিক শক্তি। কিন্তু আমি কিছু ভাবি না। আমার কাজ মাস্টারের কথা মেনে চলা। মাস্টারকে মেনে চলা। মাস্টারকে। মেনে। চলা। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার।

মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার। মাস্টার।

এরপর গোটা পাতা জুড়ে শুধু একটাই কথা লেখা, "মাস্টার'। আর কিচ্ছু না। আমি অমিতাভ মুখার্জিকে ডেকে দেখালাম। ওঁর মুখ গম্ভীর, আরও গম্ভীর হয়ে গেল।

"কোথা থেকে পেলে এটা?"

"এই তো এদিকের চেয়ারের নিচে।"

"হুম... মনে হয় পোড়াতে গিয়ে চোখ এড়িয়ে গেছিল। আর কিছু নেই?"

"নাহ। দেখি যদি খাটেরতলায়...."

খাটের তলা হাতড়ে একটাই কোনাপোড়া ছবি পাওয়া গেল। ধুলোমাখা। ধুলো ঝেড়ে দেখতে যাব, এমন সময় মুখার্জি নিজের হাতের সেই পাতাটা উলটে চমকে উঠলেন।

"সে কী! এই তুর্বসু, এদিকে একবার দেখে যাও তো।"

আমি গিয়ে দেখলাম একই হস্তাক্ষরে পিছনের পাতায় লেখা রয়েছে, "তুর্বসু রায় কে?"

"এই হাতের লেখা চেনো?"

"কস্মিনকালে দেখিনি। তবে দেবাশিসদার না।"

"সে আমিও জানি। কিন্তু..." বলতে না বলতে মুখার্জির কাছে একটা ফোন এল। একঝলকে ডিসপ্লে স্ক্রিনে দেখলাম নাম ভেসে উঠেছে 'গোলাপ'। ফোন আসা মাত্র মুখার্জি "একটু দাঁড়াও। এক্ষুনি আসছি", বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাথরুম হয়ে দেবাশিসদার ঘরে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম একা। সেই ছবি হাতে নিয়ে।

বেশ অনেকদিন আগের তোলা ছবি। কিন্তু চেনা যাচ্ছে। এই লোকটাকেই কিছুক্ষণ আগে দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে দেখেছি। বিশ্বজিতের হাতে কাগজ

গুঁজে দিচ্ছে। এই লোকটাই কিছুদিন আগে আমাদের সঙ্গে কত কথা বলেছে। প্রশান্ত মজুমদার। স্টেট আর্কাইভের ডিরেক্টর। কিন্তু ছবির ঠিক মাঝে তার অন্য পরিচয় লেখা। কেউ একটা লাল মার্কার দিয়ে গোটা গোটা হরফে লিখেছে "MASTER"। পিছন ফিরে অমিতাভ মুখার্জিকে ডাকতে যাব, দেখলাম অনেক দেরি হয়ে গেছে। মাথায় প্রচণ্ড একটা ব্যথা। সবকিছু দুলে উঠে পৃথিবী আবছা হয়ে এল। জ্ঞান হারাবার আগে যেন বহুদূর থেকে অমিতাভ মুখার্জির গলা শুনতে পেলাম, "শা-আ-লা-হ, বোকাচ্চোদা... অনেক জ্বালিয়েছিস....'

একাদশ পর্ব- ধূসর মৃত্যুর মুখ

শহর কলকাতায় মুষলধারায় বৃষ্টি খুব একটা হয় না। বৃষ্টি যদি বা হয়, মাটির আগুন উত্তাপ গরম হাওয়ায় বয়ে উঠে যায় উপরে। তারপর তীব্র চিটচিটে ঘামের মতো নেমে আসে আকাশ থেকে। বছরে একটা কি দুটো দিন আকাশ ভেঙে পড়ে। প্রথমেই ঠান্ডা বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় যত ধুলো, অনাহত হলদে গাছের পাতা আর কাগজের ঠোঙা। জলভরা মেঘ মৌমাছির চাকের মতো ঝুলে থাকে হাওড়া ব্রিজের উপরে। গোটা শহর নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে ঢুকে পড়তে চায় নিশ্চিত আশ্রয়ে। কোথায় যেন একটা বাজ পড়ে। চার লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ আকাশ চিরে নিজেকে সঁপে দেয় মাটিতে। বাতাসে বাতাসে ঘর্ষণে ওঠে দামামার শব্দ। তারপর বৃষ্টি নামে। গোটা রাজপথ জুড়ে সবাই প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। ব্যস্ত টানারিকশা, পথচারী, ফুটপাথের পসরা সাজানো দোকানদার, কেউ বাদ নেই। সাদা আবছা পর্দার মতো বৃষ্টি পড়ে। ঠান্ডা বরফজলের মতো বৃষ্টি চুঁইয়ে নামে ঘাড় থেকে শিরদাঁড়া বেয়ে। কলকাতার রাস্তাঘাট নিমেষে ধূসর কাচের মতো স্বচ্ছ হয়ে যায়। চারিদিক ঝাপসা...

রামানুজ কিছুতেই ওই ঘরটার দিকে তাকাতে পারছে না। তাকালেই একগাদা স্মৃতি, একসঙ্গে কাটানো সময়গুলো ফিরে ফিরে আসছে। রামানুজ না চাইতেই আবার তাকিয়ে ফেলে। এই ঘরেই তো শেষবার শুইয়ে রাখা হয়েছিল তার ভালোবাসার মানুষটাকে। পেট চেরা। কাটা অণ্ডকোশ মুখে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল রামানুজের পারিক। রামানুজের ভালোবাসার মানুষ। রামানুজ এসব কিছু জানত না। গোলাপ জানত। গোলাপ তাকে সবকিছু বলেছে। বাইরে এই সৃষ্টিছাড়া বৃষ্টির মধ্যেও চেতলা খোলের সবাই যে এই ভাঙাচোরা বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। কারণ একটাই। প্রতিশোধ। কলকাতার হিজড়ারা এতদিন যার ভয়ে দম বন্ধ করে থাকত, সেই অজানা, প্রায় ঈশ্বরের মতো লোকটা এখন কেমন অদ্ভুতভাবে কুঁকড়ে ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। গাঢ় ক্লোরোফর্মের ঘুম ভেঙেছে সদ্য। মাঝে মাঝেঘাড় তুলে বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছে। উঠে বসার জন্য দুহাতের ভর নিয়ে আবার শুয়ে পড়ছে। সবাই রামানুজের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। সে না থাকলে মাস্টারকে ধরা যেত না। 'সাব্বাস' বলেছিলেন অফিসার মুখার্জিও। অফিসার অমিতাভ মুখার্জি। প্রথমবার দেখে ভয় পেয়েছিল যাকে। ভেবেছিল এ লোক তার বন্ধু হতে পারে না। কিন্তু দিনের পর দিন চেতলা খোলে এসে তাদের সঙ্গে মিলে আজকের পরিকল্পনা করেছিল অফিসার। বলেছিল সরকার কিছু করবে না। দুদিন বাদে ফাইল ক্লোজ করে দেবে। আর যারা খুনি, তারা প্রমাণ রাখেনি কোনও। কেস দাঁড়াবে না। বিচার করতে হবে নিজেদের আদালতে। এই আকাশভাঙা বৃষ্টিতে বিধান সরণির এই ভাঙা বাড়িতে বিচারসভা বসবে। রামানুজকে যে যতই বলুক, রামানুজ জানে, এই গল্পের নায়ক সে না। নায়করা কাঁদে না। কিন্তু যতবার ওই ঘরের দিকে চোখ যাচ্ছে, রামানুজের দুচোখ জলে ভরে উঠছে অজান্তে। মাস্টারের ঠিক উলটো দিকে ছেলেটা এখনও শুয়ে আছে। জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু মাথার যন্ত্রণায় মাথা চেপে ধরে আছে দুই হাত দিয়ে। মুখে গোঙানির শব্দ। চারিদিকে চেতলা খোলের হিজড়ারা গোল হয়ে বসে। ভাঙা মেঝেতে রাখা ব্যাটারি ল্যাম্পের সাদা আলোয়

গোটা ঘরে এক ভৌতিক পরিবেশ। যেন এই মুহূর্তে কোনও অলীক ঘটনা ঘটবে। একটু দূরে এক কোণে তিন-চারটে মদের বোতল আর গেলাস সাজিয়ে গোলাপ বসে আছে। মুখার্জি বলেছে আজ কড়া ইন্টারোগেশান হবে। রাম ছাড়া জমবে না। মুখার্জি নিজে একটা লোহার চেয়ারে বসে আছে ঘরের ঠিক মাঝখানে। হাতে সার্ভিস রিভলভার। দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত। রামানুজ এই আলো-আঁধারিতেও দেখতে পেল ঘামের একটা নদী মুখার্জির শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসছে। মাস্টার এখন অনেকটা সুস্থ। উঠে বসেছে। ঘোলাটে চোখ কেটে গেছে। সোজা তাকিয়ে আছে অফিসারের দিকে। ঠিক উলটো দিকের দেওয়ালে পিঠ দিয়ে এখনও ঝিম মেরে বসে আছে ছেলেটা। মাথা ঝুলে আছে নিচের দিকে। অফিসার দুজনকেই আর-একবার দেখে নিলেন। তারপর পিছন ফিরে বললেন, "শুরু করি, কী বলিস গোলাপ?"

গোলাপ কিছু বলল না। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

অফিসার মাস্টারের দিকে ঘুরে বসলেন এবার। "ওয়েলকাম টু হামচুপামুহাফ। এই বাড়িটা তো আপনি চেনেন। তাই না মাস্টার?"

মাস্টার কিচ্ছু বলল না। একইভাবে তাকিয়ে রইল।

"আচ্ছা, কিছু বলবেন না, তাই তো? এটা বলুন দেখি, সেদিন আপনি বিশ্বজিতের দোকানে কেন গেছিলেন? সিসিটিভি ফুটেজ আছে। না বলতে পারবেন না।"

"আমি বলতে বাধ্য নই।" জড়ানো গলায় উত্তর দিলেন মাস্টার।

"ঠিক আছে। বলবেন না যখন, সমস্যা নেই। আমি আপনার কীর্তিকলাপের সব খবর এলাহাবাদ, ওয়াশিংটন, নেপলস, এডিনবরার সব ম্যাসনিক লজগুলোতে পাঠিয়ে দেব। ব্রাদারহুডের সবাই জানুক। যাদের থেকে নীবারের টাকা জোগাড় হয়, তাদের অন্ধকারে রেখে আপনি কী করছেন সেটা তো তাদের জানা উচিত।"

মাস্টার চুপ করে বসে রইলেন। এবার অনেকটা সোজা হয়েছেন।

"কী করেছি আমি?"

"ভুলে যাবেন না প্রশান্তবাবু, আমি পেশায় পুলিশ। আমাদের এমন সব টুলস আছে, যাতে যে-কোনো লোকের ই-মেইল খুলে পড়তে পারি। শুধু জানতে হবে কারটা খুলতে হবে? থ্যাংকস টু রামানুজ। ও না থাকলে আপনাকে ট্র্যাক করা যেত না।" চোখের ইশারা করলেন অফিসার। বেলা নামে এক হিজড়া একতাড়া কাগজ এনে দিল মাস্টারের হাতে।

"দেখুন দেখি, এই আপনার করা মেইল কি না? মাঝে পয়সার অভাবে অকশন স্টোরে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। কিন্তু গত চার বছরে আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বেড়েছে প্রায় দুশো শতাংশ। আর তার গোটাটাই নীবারের নামে নিয়ে আসা টাকায়। সেই টাকাতেই ক্রিস্টি, সদবির মতো নিলামঘর থেকে অ্যান্টিকে বাড়ি সাজিয়েছেন আপনি। ভুল বললাম?"

দু-এক পাতা উলটেই যা বোঝার বুঝে গেলেন মাস্টার। তারপর হাতের কাগজ ফেলে অফিসারকে বললেন, "ওকে, ডান। আপনি নীবারকে এর মধ্যে জড়াবেন না। আপনি যা জানতে চান, আমি সব বলে দেব। রাজি?"

অফিসার উত্তর দিলেন না।

মাস্টার আবার বললেন, "আমি নীবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিইনি। কোনও মাস্টারই তা করে না। মাস্টারের পাওয়ার থাকে একা দলের হয়ে সিদ্ধান্ত নেবার। কিন্তু তাতে ভুল হলে প্রতিফল মাস্টারকেই ভুগতে হয়। আমিও ভুগতে রাজি। বলুন, কী জানতে চান?"

ব্যাপারটা এত সোজা হয়ে যাবে ভাবেননি মুখার্জি। তিনি একটু থমকে গেলেন। তারপর হাতের রিভলবার নাচাতে নাচাতে বললেন, "শুরু থেকে। আপনি কীভাবে নীবারে এলেন?"

রামানুজ দেখল উলটো দিকের সেই ছোকরাও উঠে বসে মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে। যদিও মাথা এখনও হাত দিয়ে চেপে ধরা।

"আমাকে দেবাশিস এনেছিল। আমি আগে এলাহাবাদে থাকতাম। এলাহাবাদের ব্রাদারহুড সংগঠন প্রায় ভেঙে যাচ্ছিল। আমি একা সেটাকে আবার দাঁড় করাই। খবর চাপা থাকে না। আমি এখানে স্টেট আর্কাইভে যোগ দিলে দেবাশিস নিজেই আমাকে নীবারের দায়িত্ব নিতে বলে। বলল, এটা প্রায় পারিবারিক প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। বদ্ধ ডোবা। সংগঠন চালাতে আমার মতো লোক লাগবে। নীবারের সদস্যরা প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু ব্রাদারহুডে আমার সুনাম ছিল। তাই নীবারে আমাকে সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেওয়াহয়।"

"খুব ভালো। তারপর একদিন দেবাশিস প্রিয়নাথের পাণ্ডুলিপি পেলেন।"

"ওটাই কাল হল। আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম। গোপাল দত্ত আগে নীবারের সদস্য ছিলেন। তাই কোনও ডকুমেন্ট ওঁর কাছে থাকলে সেটা বেহাত যেন না হয়, সেইজন্য ওকে পাঠাই। আমি নিজেও যেতে পারতাম। কেন যে গেলাম না.... অবশ্য আমি গেলে একটা ব্যাপার করতে পারতাম না। যেটা দেবাশিস পেরেছিল।"

"কী?"

"চুরি। প্রিয়নাথের পাণ্ডুলিপি আর ভূতের বাক্স চুরি করে এনেছিল। এটা আমার দ্বারা হত না।"

"আর আপনি জেনেবুঝে চুপ করে ছিলেন?"

"অবশ্যই। আপনি জানেন ওতে কী আছে? সে জিনিস বাইরে বেরোলে কী হতে পারে কোনও আইডিয়া আছে আপনার?"

"জানি। গোটাটাই জানি। নীবার থেকে যখন আপনারা দেবাশিসদাকে অকারণে তাড়িয়ে দিলেন, তখন আমিই একমাত্র ওর পাশে ছিলাম। আমি। ওর এক নম্বর চ্যালা। আমি দেখেছি, কীভাবে ওকে বাধ্য করা হয়েছে নিজের বউকে অন্যের হাতে তুলে দিতে, কীভাবে দিনের পর দিন ওকে ইউজ করে আপনি ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। ও আমায় সব বলেছে। কেন করলেন এসব?"

“আপনি গল্পের একটা দিক শুনেছেন। অন্যটা শোনেননি। শুনুন। সবই যখন জানেন, নিশ্চয়ই জানেন ভূত কী? নীবার বলেছিল এই ভূত নীবারের কাছে জমা দিতে। ও তো দেয়নিই, বরং বলে, এই সুযোগ এসেছে নীবারকে সর্বক্ষমতাশালী করার। আমরা তাতে রাজি হইনি।”

“সেটা কীভাবে?”

“মানুষের শরীরকে বশ মানানোর হাজার উপায় চিকিৎসাবিজ্ঞানে আছে। কিন্তু মনকে বশ মানাতে পারেনি কেউই। ঈশ্বরও ফ্রি উইলের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না। আর ঈশ্বর যা পারেন না, শয়তান তা পারে। ভূতের সেই ক্ষমতা ছিল। আর ভূতের বলে দেবাশিস নিজে ঈশ্বর হতে চেয়েছিল। বলেছিল এই ভূত তৈরির ফর্মুলাটা শুধু লাগবে। তারপর আর চিন্তা নেই। এ জিনিসের দারুণ ডিমান্ড হবে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাধাতে, দেশে দেশে যুদ্ধ লাগাতে এর জুড়ি নেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, যারা এইসব অপরাধ করবে তারা নিজেরাই ভুলে যাবে। ডার্ক ওয়েবে এই জিনিস বেচে কোটি কোটি উপার্জন হবে আমাদের। আমরা কেউই রাজি হইনি। এটা ব্রাদারহুডের সমস্ত এথিকসের বিরুদ্ধে। ওকে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয় ও যেন ব্রাদারহুডকে ভূত ফেরত দেয়। ও দেয়নি। ওকে তাই তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভেবেছিলাম একা হয়ে গেলে ও কিছু করতে পারবে না। ভুল ভেবেছিলাম। ও আপনাকে নিজের কনফিডেন্সে নিয়ে নেয়। ভয়ানক ভালো ম্যানিপুলেটর ছিল কিনা। পুলিশের সাপোর্ট থাকলে অনেক কিছু সম্ভব। সেটাই ও করত।”

“কী করত? “

“নিয়মিত হিজড়াখোলে গিয়ে মানুষের উপরে ভূতের এফেক্ট কতটা, তা নিয়ে ডেটা কালেক্ট করত। যাতে পরে জিনিসটা বেচতে পারে। আমাদের কাছে খবর ছিল। আমরা পুলিশকে টিপস দিয়েছিলাম। পুলিশ চেতলা খোল সার্চ করতে যায়। শেষ মুহূর্তে দেবাশিস এসে ইন্টারভেন করে।"

“সেই ফর্মুলা এখন কোথায়?”

"জানি না। দেবাশিস পায়নি এটা বলতে পারি। ওই ফর্মুলার জন্যেই তো ও তুর্বসুর সঙ্গে আলাপ জমায়। তুর্বসুর বাবা বিরূপাক্ষ চাইতেন না তুর্বসু নীবারে জড়াক। তাই অন্যভাবে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তবে ফর্মুলা পায়নি, এটা আমি নিশ্চিত। যদিও অন্য একটা লাভ হয়েছিল।"

"কীলাভ?"

মাস্টার উত্তর দেন না।

"বিশ্বজিৎকে কে মেরেছে?"

"ভাড়াটেগুন্ডা।"

"কেন?"

"দেবাশিসের খুনের খবর পেয়েই আমি প্যানিকড হয়ে যাই। আগে বেশ কয়েকবার ওর বাড়িতে নীবারের লোক তল্লাশি চালায়। ভয়ে ও সেই বাক্স খিদিরপুর খোলে রেখে আসে। সেখান থেকেই তা মাঝে বেহাত হয়ে বিশ্বজিতের কাছে চলে গেছিল। দেবাশিস ওকে ট্র্যাক করে। ও প্রথমে দিতে রাজি হয়নি। দেবাশিস আমায় ফোন করে বলে, আমি যদি বিশ্বজিৎকে ধমকে ওটা উদ্ধার করাতে পারি, তবে ও বাক্সটা নীবারকে দিয়ে দেবে। আমি রিস্ক নিয়েছিলাম। ভুল করেছিলাম। বিশ্বজিতের সঙ্গে আমি দেখা করি। দেবাশিস বাক্স পায়, কিন্তু নীবারকে দেয় না। উপায় না দেখে আমি ওকে বাড়িতে ডাকলাম।"

"কবে?"

"ও খুন হবার ঠিক আগের দিন।"

"তারপর?"

----

১৯ জুন ২০১৮, দুপুর ১.৪৫

-আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

-হ্যাঁ। বসো। কিছু কথা আছে।

-কী কথা? যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন স্যার। আমার অন্য কাজ আছে।

-এভাবে কথা বলছ কেন? তুমি তো আগে এভাবে কথা বলতে না!

-তখন আমার সঙ্গে সংঘের যোগ ছিল। তখন আপনাকে আমি মাস্টার বলে ডাকতাম। আপনি নিজেই সে সম্মান রাখতে পারেননি।

-তুমি কি তোমার কথা রেখেছ? আমাকে যা দেবার কথা ছিল, ফেরত দাও। নইলে ফল ভালো হবে না।

-হাহ। আপনার দৌড় আমার জানা আছে। নীবার এখন কতগুলো বুড়োদের আখড়া। নতুন কিছু কেউ করতে গেলেই তাকে বাধা দেওয়া হয়। তারা আমার কী করবে?

-আমি চাই না তুমি সেটা দেখতে পাও। ওই বাক্স তোমার মতো লোকের কাছে সেফ না। বাক্স নীবারের।

-বললেই হল! আমি নিজে ওই বাক্স খুঁজে পেয়েছি। আমি না জানালে আপনারা জানতে পারতেন ওটার কথা? এখন আমার নিজেদের বলে দাবি করছেন!

-করতাম না, যদি না তুমি এটা বেচে দেবার ধান্দা করতে।

-কে বলেছে আপনাকে?

-নীবারের ক্ষমতা তুমি এখনও পুরোটা জানো না দেবাশিস। বাক্স ফেরত দাও। ভিতরের সব জিনিসপত্র সমেত।

-দেব না। বেশি কথা বললে বাক্সের মাল ছড়িয়ে দেব সব জায়গায়। আমার তাতে কী? প্রচুর নিরীহ মানুষ মরবে, আর আপনি তার জন্য দায়ী থাকবেন।

-তুমি এসব কিছুই করবে না।

-কে বলেছে? নীবারের থেকে আমি কী পেয়েছি বলতে পারেন? অপর্ণাকে সরিয়ে নিয়েছেন, কিছু বলিনি। কিন্তু এই বাক্স আমি নীবারকে দেব না।

-অপর্ণার উপরে তোমার কতটা ফিলিংস ছিল আমার জানা আছে। ছাড়ো। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম। বাক্স ফেরত দাও, তা না হলে আমি লিগাল স্টেপ নেব।

-লিগাল? সে কীরকম?

-গত দুই বছর ধরে আর্কাইভের নানা টুকিটাকি জিনিস চুরি যাচ্ছে। প্রায়ই তাদের পাওয়া যাচ্ছে অ্যান্টিক মার্কেটে কিংবা কিউরিও শপে। আমি একটা ভিজিলেন্স কমিটি বসিয়েছিলাম। তারা গতকাল সকালে রিপোর্ট দিয়েছে। একেবারে সঠিক রিপোর্ট। এই রিপোর্টটা নিয়ে আমি দুটো কাজ করতে পারি। চেপে যেতে পারি কিংবা সরকারে ফরোয়ার্ড করতে পারি। তুমি বাক্স ফেরত দিলে আমি প্রথমটা করব, না দিলে তুমি কীভাবে ধনেপ্রাণে মরো সেটা দেখার দায়িত্ব আমার।

-আপনি আমায় থ্রেট দিচ্ছেন?

-যেভাবে নেবে। আমার বাক্স চাই। আর সেটাও চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে।

-এবার আমি বলি? আপনি সাবধানে থাকুন। আপনার বড়ো বিপদ সামনে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনিও বুঝে যাবেন আপনি কাকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করেছেন।

-কী করবে তুমি?

-আমাকে কিছু করতে হবে না। যা করার বাসু করবে। চললাম।

"আর সেই রাতে দেবাশিস নিজেই খুন হল", মাথা নেড়ে বললেন প্রশান্ত মজুমদার।

"আপনি খবর পেলেন কীভাবে?"

"পুলিশের ভিতরে আমাদের ইনফর্মার আছে। আমি জানতাম এই খবর চাপা থাকবে না। বিশ্বজিৎ সুবিধার ছেলে ছিল না। ও মুখ খুললে আমি, নীবার, সবাই বিপদে পড়ব। দেবাশিসের হাতের লেখা নকল করা খুব সোজা। বাচ্চাদের

মতো গোটা গোটা। আমি হাতের লেখা নকল করে বিশ্বজিৎকে দিয়ে বলি বাসু আর দেবাশিস পালিয়েছে। ভূতের বাক্স আবার ওর কাছেই ফিরে আসবে। কিন্তু পুলিশ পিছনে লেগেছে। ওকে বাক্স নিয়ে কিছুদিন এলাহাবাদে গা ঢাকা দিতে হবে। বাক্স নিতে এই বাড়িতেই ওকে ডাকা হয়েছিল। আমাদের ভাড়াটে গুন্ডা ছিল। ওকে নিকেশ করে। দিন পনেরো বাদে সব একটু ঠান্ডা হলে আমরা বডি এক্সপোজ করি।"

"এতদিন পরে কেন?"

"বিশ্বজিৎ ভালো ছেলে ছিল না। কিছু হলেই ব্ল্যাকমেলের হুমকি দিত। মৃত্যুর পরে পনেরো দিন অবধি বডির সৎকার না হলে সে নরকে যায়। ম্যাসনিক প্রবাদ। আমি চাইনি ওই শয়তানের বাচ্চাটা স্বর্গ পাক। মরার পরেও যদি কোনও জীবন থাকে, সেটাও নরকে পচে মরুক শালা।"

রামানুজ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই শান্ত, প্রায় শিক্ষকের মতো দেখতে লোকটার মনে এত বিষ! শুধু মেরেই ক্ষান্ত হয়নি। রামানুজের পারিককে জাহান্নামে পাঠিয়েছে। রামানুজ চোখের জল মুছে ভাবতে থাকল। খুব জোর করে ভাবতে থাকল।

এদিকে অফিসার প্যান্টের পকেট থেকে একটা পাতলা সেলোফেনের খাম বার করেছেন। চকচক করছে। রামানুজ দেখল ভিতরে সাদা একেবারে গোলমতো একটা বড়ি। এটা সে চেনে। অভয়ের ঘরের তোশকের তলায় গোলাপ পেয়েছে। গোলাপ জানে এটা কী। এটা ভূত। মানুষকে অমানুষ করে দেয়। গোলাপ নিজে এটা ছোঁয়নি। কাউকে ছুঁতেও দেয়নি। এই অফিসারটা নিজে এটাকে নিয়ে এসেছে।

"এটা চেনেন?"

"যদি খুব ভুল না হয়, তবে এটাই ভূতের বড়ি।"

চিকচিক করে মুখ দিয়ে অদ্ভুত শব্দ করলেন মুখার্জি।

"বাকিগুলো কোথায়?"

"আমি জানি না। সিরিয়াসলি আমি জানি না। আমিও এটার খোঁজেই আছি। লাস্ট ছিল দেবাশিসের কাছে। ও মারা যাবার পর থেকে এটা ভ্যানিশ। অদ্ভুত চরিত্র এটার। একশো বছরে বারবার হারিয়ে গেছে। আবার ফিরে এসেছে আচমকা। আঘাত করেছে অতর্কিতে.... যখন কেউ এক্সপেক্টই করছে না।"

"বালের কথা রাখুন। সত্যি বলুন। বাকিগুলো কোথায়?"

"জানি না।"

"গ্রেট... খুঁজে নেব।"

সেলোফেন আবার পকেটে রেখে ঠান্ডাগলায় প্রশ্ন করলেন মুখার্জি, "লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট। এই বাসু কে?"

"বাসু কেউ না। একটা ছদ্মনাম। একটা ছায়ারমতো।"

"এর পিছনে আসল লোকটার নাম কী?"

"জেনে কী হবে?" অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে মাস্টারের মুখে। "বাসুর পিছনে যে লোকটা আছে, সে নিজেও জানে না সে বাসু। এখানেই দেবাশিসের চালাকি বলো চালাকি, শয়তানি বলো শয়তানি।"

"দেবাশিসদাকে কে খুন করেছে?"

"জানি না। তবে বাসু হলে অবাক হব না। আমি যতদূর ভূতকে বুঝেছি, ভূত মানুষের শয়তানি প্রবৃত্তি জাগায় ঠিকই, কিন্তু সেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট না। বাই এনিচান্স শুভবুদ্ধি ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে গেলে ভূত ব্যাক ফায়ার করে। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের তৈরি দানবটার মতো। তাই পিছনে থাকা লোকটাকে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। সে নির্দোষ।"

"ওয়েল। ভালো কথায় কাজ হবে না যখন..." মুখার্জি দাঁড়িয়ে নিজের বেল্ট খোলে। হাতের রিভলবার রাখে লোহার চেয়ারে। "গোলাপ, তুই একটা লার্জ পেগ বানা তো! আমি এই বুড়ো ভামটাকে বানাব। সাদা চোখে ঠিক জমছে না।"



গোলাপ সঙ্গে সঙ্গে একটা গ্লাস ভরে রামানুজকে ডাকল নিয়ে যেতে। রামানুজ তখনও মেনে নিতে পারছে না গোটা ব্যাপারটা। যেন এমন কখনও হয়ইনি! সব মিথ্যে। তার পা টলছে। টলমল পায়ে এগিয়ে যেতে গিয়ে ধাক্কা লাগল মুখার্জির সঙ্গে।

"ধ্যার শালা! দেখে চলতে পারিস না বাঁড়া!" খিঁচিয়ে উঠলেন মুখার্জি।

রামানুজের মাথা কাজ করছে না। গোলাপের কাছে গিয়ে তার মাথাটা যেন ঘুরে গেল। থেবড়ে বসে পড়ল মাটিতে। দু-একজন হিজড়া এগিয়ে এল তাকে ধরতে। সে হাত নেড়ে মানা করল। একটু ধাতস্থ হয়ে মদের গেলাস এগিয়ে দিল মুখার্জির হাতে। মুখার্জি এক ঢোঁকে খেয়ে নিলেন সবটা। তারপর একটা বিকৃত ভঙ্গি করে এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে বেল্টটা চাবুকের মতো দোলাতে দোলাতে বললেন, "বল বাসু কে? তুই সব জানিস। আমিও জানি, শুধু কনফার্ম হতে চাইছি। বল। বলে ফেল।"

"আমি বলব না। সরি।"

"জানিস, তোকে আমি কী করতে পারি?"

"আমার ত্রিসংসারে কেউ নেই মুখার্জিবাবু, মেরে ফেললেও আমি বলব না।"

"তাই নাকি? তবে এই নে, এই নে", বলে একের পর এক বেল্টের বাড়ি মারতে থাকলেন মুখার্জি। প্রতিবার আঘাতের পরিমাণ আগের বারের চেয়েও বেশি। প্রায় বৃদ্ধ প্রশান্ত মজুমদারের দেহটা প্রত্যেক আঘাতে কুঁকড়ে যেতে থাকল। মুখে তবুও টুঁ শব্দটি করছেন না তিনি। অফিসারের রোখ চেপে গেছে।

তিনি বেল্ট ছেড়ে সোজা মজুমদারের গলা টিপে ধরলেন। মজুমদারের দম আটকে যাচ্ছে, চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছে, জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। দু-তিনজন হিজড়া মুখার্জিকে ধরতে গেল। তিনি ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাদের। রামানুজ দেখতে পেল অফিসারের সারা দেহ ঘামে ভেজা, শরীর অদ্ভুতভাবে দুলছে। মুখে শুধু একটাই কথা, "বল শালা, নাম বল... বল কে দেবাশিস গুহকে খুন করেছে?"

আচমকা মুখার্জি যেটা করলেন সেটার জন্য কেউ প্রস্তুত ছিল না। উঠে দাঁড়িয়ে পাশে রাখা সার্ভিস রিভলভার থেকে পরপর দুটো গুলি চালালেন মজুমদারের বুকে। প্রশান্ত মজুমদারের মুখ বিকৃত হয়ে গেল। কিন্তু এই বিকৃতির মধ্যে কষ্ট যতটা আছে, তার সঙ্গে যেন একটা ব্যঙ্গের হাসিও মিশে রয়েছে।

রামানুজ দেখতে পেল অতি কষ্টে তিনি একটা আঙুল তুলছেন। ডান হাতের তর্জনী। আর সে তর্জনী সোজা অফিসার মুখার্জির দিকে। আঙুলটা ধীরে ধীরে নেমে গেল। এলিয়ে পড়লেন প্রশান্ত মজুমদার।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতে অফিসার ঠিক একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে গেলেন। হাতে বন্দুক। তবে নিশানা এবার অন্য। এই ছোকরা গোয়েন্দাটা। তুর্বসু না কী যেন নাম। ছেলেটা উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ছিল। এসব দেখে বসা আর দাঁড়ানোর মাঝামাঝি অদ্ভুত বেঁকেচুরে স্থির হয়ে রইল।

"তোকেই তো দেখাল, তাই না? আমি আগেই জানতাম। তুই-ই বাসু। তুই ছাড়া কেউ হতেই পারে না। সত্যি কথা বল। তুই বাসু তো?"

"আমি!!" বিস্ময়ে ছেলেটার কথাই যেন বন্ধ হয়ে গেল।

"শুরু থেকেই তোর উপরে সন্দেহ আমার। দেবাশিসদা কোনও দিন জানায়নি। তুই কে। কিন্তু বলেছিলাম জানিয়ে রাখতে। যদি কোনও বিপদআপদ হয়.... বলেনি। যা ভেবেছিলাম তাই হল। তুই-ই দেবাশিসদাকে মারলি।"

"না-আ-আ", চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। "বিশ্বাস করুন আমি মারিনি। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। বিরাট ভুল।"

"ভুল হচ্ছে না। হচ্ছিল। ইচ্ছে করে তোকে সব জায়গায় নিয়ে যেতাম আর তোর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতাম। আমার চোখকেও ফাঁকি দিয়েছিলি? এমন ভাব করতিস কিচ্ছু জানিস না। এবার দেখলি তো, বুড়ো মরার সময় কাকে দেখাল?"

"আপনাকে", ক্ষীণ গলায় বলল তুর্বসু।

"চুপ কর শুয়োরের বাচ্চা!" বুটের সপাট লাথি এসে পড়ল তুর্বসুর বুকে। গোটা দেহটা নিমেষে ছোটো হয়ে গেল কেন্নোর মতো। "তোর দাঁড়ানোর ভঙ্গি আমি চিনি। অবিকল সেই ছবিতে বাসুর মতো। দেবাশিসদা নীবারের উপর রাগে তোকেই ওদের বিরুদ্ধে মোহরা বানিয়েছিল। আর তুই, তুই শালা কালসাপ হয়ে দেবাশিসদাকেই খুন করলি?"

“একদম ভুল! একদম! আমি এসবের কিচ্ছু জানি না। বিশ্বাস করুন”,হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল তুর্বসু।

এবার হিজড়াদের দিকে ফিরল মুখার্জি, “কি রে, বুড়োটা মরার আগে ওকেই দেখাল তো? কি... দেখাল তো?”

হিজড়ারা সবাই চুপ। কে ঠিক, কে ভুল বোঝা মুশকিল। প্রশান্ত মজুমদার মুখার্জির দিকে দেখিয়েছে, এটা যেমন সত্যি, তেমনি ঠিক পিছনেই তুর্বসু ছিল, এটাও সত্যি।

“তোরা বলবি না তো? বেশ আমিই বলাচ্ছি”, অফিসার মুখার্জির গলা জড়িয়ে আসছে। আবার তুর্বসুর দিকে বন্দুক তাগ করে প্রশ্ন করলেন, “বল দেখি, দেবাশিসদার বাড়ি গিয়ে তুই কী করতিস? বল!”

“যে-যেতাম, কফি খেতাম, আড্ডা দিতাম, চলে আসতাম।”

“কী নিয়ে আড্ডা হত?”

“আ-আমার মনে পড়ছে না।”

“কিছু তো মনে আছে। এতদিন গেছিস!”

“আমার মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা।”

“লাস্ট কবে দেবাশিসদার বাড়ি গেছিস?”

“মনে নেই। গত এক বছর আমাদের খুব বেশি দেখাসাক্ষাৎ হত না।”

“আবার মিথ্যে কথা!”

কানফাটানো একটা শব্দে চমকে উঠল রামানুজ। একটু আগেই এই শব্দটা সে পেয়েছে। মুখার্জির একটা গুলি সোজা তুর্বসুকে বিঁধে দিয়েছে। কাঁধের কাছ থেকে দরদরিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। সাদা টিশার্টে লাল অংশ বাড়ছে ক্রমাগত।

“সত্যি কথা বল। নইলে পরেরটা তোর বুকে। বল শালা বাঞ্চোত!”

বাইরে বাজ পড়ল একটা। রামানুজ শুনতে পেল অনেকগুলো পায়ের শব্দ। কারা যেন আসছে। অফিসার মুখার্জির সেদিকে খেয়াল নেই। সে একভাবে চিৎকার করেই যাচ্ছে। এরপরের ঘটনাগুলো রামানুজের চোখের সামনে স্লো

মোশান সিনেমার মতো ঘটে গেল একে একে। মিনিটখানেকের মধ্যে একগাদা পুলিশ ঘরে ঢুকে এল। সবার হাতে বন্দুক। বেশিরভাগ মুখার্জির দিকে তাক করা। সামনের একজন বয়স্ক পুলিশ মুখার্জিকে বললেন, "হ্যান্ডস আপ।" মুখার্জি শুনল না। সে আবার রিভলবার ওঠাল। আলোর ঝলক আর কানফাটানো আওয়াজ। একজন পুলিশ নেতিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আবার দুটো বন্দুকের শব্দ। মুখার্জি দুই পা মুড়ে মাটিতে বসে পড়েছে। থাইয়ের কাছে প্যান্টটা লাল হয়ে যাচ্ছে। আবার কে একটা বলল, "হ্যান্ডস আপ।" এবার আরও জোরে। মুখার্জি তাও বন্দুক ফেলল না। হাত ওঠাল না। কাউকে কোনও সুযোগ না দিয়ে রিভলবারের নলটা মুখে ঢুকিয়ে ট্রিগার টেনে দিল। এবার অবশ্য আগের মতো কানফাটানো শব্দ নেই। চাপা আওয়াজ একটা। মুখার্জির পা বেঁকে আছে অদ্ভুত কোণে। এক হাত পাশে ছড়ানো। অন্য হাতে এখনও রিভলবার ধরা। মাথার পিছন থেকে একটা রক্তের সরু ধারা বেরিয়ে আসছে। পিছনের দেওয়ালটায় যেন কেউ পানের পিক ফেলেছে, এমন লাল। মাঝে মাঝে সাদা সাদা কী সব। রামানুজ জানে এগুলো অমিতাভ মুখার্জির মস্তিষ্কের অংশ। সেই মস্তিষ্ক, যা শেষ মুহূর্তে আর কাজ করছিল না। সেই মস্তিষ্ক যাতে ভূত ভর করেছিল।

কোনও শিক্ষাই বিফলে যায় না। দাশরথির মতো পকেটমারের সেরা মিস্তিরি হতে পারত সে। প্রায় অন্ধকার ঘরে এক পুলিশের পকেট থেকে সেলোফেন নেওয়া তার বাঁ হাতের কাজ। কিন্তু তাকে তো নিতেই হত। নইলে মাস্টার শাস্তি পেত না যে! লোকটা বিশ্বজিৎকে খুন করিয়েছিল। আর বিশ্বজিৎ এই দুনিয়ায় তার সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষ।

ছিল।

দ্বাদশ পর্ব- কোথাও পাখির শব্দ শুনি

"এবারে কী করবে?"

"কী আর করব? প্রাইভেটে চাকরিবাকরির চেষ্টা করব।"

"আর গোয়েন্দাগিরি?"

"নাহ। অনেক শিক্ষা হয়েছে। আর না।"

"তা বটে। দ্যাখো, মাত্র তিন মাস। সবকিছু কেমন বদলে গেল, তাই না? আমাদের সবার জীবন। আমরা কেউ আর আগের মতো রইলাম না। তুমি না, আমি না, বাবা মা না, অপর্ণা না..."

"অপর্ণার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল?"

"না। তবে ও যেরকম মেয়ে, আমি জানি যেখানে আছে, নিজের মতো, নিজের শর্তে বেঁচে আছে। মেয়েকে আর এসবে জড়াতে দেবে না।"

"এইসব আর কোথায়? নীবার তো একরকম শেষই হয়ে গেল।"

"গেল? তুমি শিওর?"

"দ্যাখো, আসল পান্ডা প্রশান্ত মজুমদার মারা গেছে, দেবাশিস গুহ খুন হয়েছে, বিশ্বজিৎ শেষ, অমিতাভও আর নেই। সুকল্যাণবাবু হাতে জিপিএস টাকার ধরিয়ে দিয়েছিলেন প্রথম দিনই। নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ হয়েছিল। পুলিশসময় মতো না এলে হয়তো আমিও..."

"অ্যাই বলেছি না, এসব বলবে না আমার সামনে! বাদ দাও। বলছি, বাসু তাহলে কে? অমিতাভ মুখার্জি, তাই তো?"

"সবাই তাই বলছে। কিন্তু আমার গাটফিলিং আলাদা। মুখার্জি আর বাসু এক লোক না। অবশ্য হতেও পারে। এক দেহ। আলাদা মানুষ। যদি ভূত সবকিছু ভুলিয়ে দিতে পারে, তবে মুখার্জিকেও ভোলাতে পারে যে সেই আসলে বাসু। জেকিল আর হাইড কেস। স্প্লিট পারসোনালিটি। নিজেই জানে না, নিজের শরীর কী করছে। মুখার্জি দেবাশিসকে পাগলের মতো ভালোবাসত আর বাসু

ঠিক উলটো। ঘৃণা করত চরমভাবে। অনেকসময় এমন এক্সট্রিম কেস হয়, অনুপমাদি বলছিলেন।“

“অনুপমা, মানে তোমার থেরাপিস্ট? ভালো কথা, তোমার কেসটা নিয়ে কী বললেন?”

“বললেন ট্রমা কাটতে সময় লাগবে। অন্তত বছরখানেক গোয়েন্দাগিরি থেকে দূরে থাকতে। টেনশন-ফ্রি থাকতে। একটা নামও বলেছেন এই রোগের। ডিসোসিয়েটিভ অ্যামনেশিয়া। এতে রোগীর কোনও ট্রমা হলে সে সেই ট্রমার কারণ যে ঘটনাগুলো সেগুলো ভুলে যায়। আমি যেমন দেবাশিসদার সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক কিছু ভুলে গেছি, যাচ্ছি... মজার ব্যাপার, গতকাল আমি অনেক চেষ্টা করেও দেবাশিসদার মুখটাই মনে করতে পারলাম না।”

“সে না পারো গে। আমার মুখটা না ভুললেই হল।”

“ও বাবা! তোমার মুখটা ভুলতে পারি? তুমি তো স্বয়ং রাজকুমারী। মহারানি ভিক্টোরিয়ার বংশধর। আমি ছাপোষা প্রজা, তোমার দাসানুদাস।“

“গুড। সারাজীবন এমন দাস হয়েই থাকবে।”

“সারাজীবন!

“আজ্ঞে।”

“সারাজীবনের চুক্তিতে দাস হতে গেলে বরং জীবনানন্দ দাশ হয়ে যাব। বেটার।”

“বাজে কথা রাখো। বলছি, এই কেসটার কোনও সমাধান হল না তবে?”

“সব কেসের কি সমাধান হয়? দেবাশিসদার খুনের রাতে ঠিক কী ঘটেছিল কেউ জানে না। জানবেও না। জ্যাক দ্য রিপারের কেসের সমাধান হয়েছে আজ অবধি? তবে আমার চিন্তা একটাই...”

“কী?”

“ভূতের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। বাসুকে নিয়ে চিন্তা নেই। কিন্তু ভূতের স্বভাবই হচ্ছে আর একবার জেগে ওঠা। সে আবার জেগে উঠলে মুশকিল। কোথায় কীভাবে আবার সে মাথাচাড়া দেবে কেউ জানে না।”

“আর তারিণীর ডায়রি? ফর্মুলা?”

“সেসব সুকল্যাণ মিত্র নিয়ে নিয়েছেন। আমার চেয়ে পুলিসের কাস্টডিতে ওসব থাকা নিরাপদ। অবশ্য বাই চান্স যদি ওখান থেকে লিক হয়ে যায় তবে...”

“তোমায় সেসব ভাবতে হবে না। একটা কথা বলব, শুনবে?”

“কী?’

“আমি পত্রিকা অফিসে একটা চাকরি পেয়েছি। যা মাইনে দেয়, তাতে তোমাকেও চালিয়ে নিতে পারব। তোমার আর কষ্ট করে এক্ষুনি চাকরি খুঁজতে হবে না।”

“তাই? তোমার ঘাড়ে বসে খাব? কিন্তু কী দাবিতে?”

“দাবি তুমি বাবার কাছে জানালেই হয়ে গেল। বাবাও তো আগের মতো নেই। অনেক নরম হয়ে গেছেন। এখন আমি বুঝি সেই ছোটোবেলায় টুলবক্সের কম্পাস ভাঙায় কেন মেরেছিলেন। ম্যাসনিক কম্পাস ভাঙার চেয়ে অশুভ কিছু হয় না। সেই অশুভ তো হলই, বলো। যাই হোক, তুমি বাবার সঙ্গে কথা বলবে কি?”

“সে তো বলা যাবে। আগে তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা সেরে রাখি।”

“কী কথা?”

“বাড়িটি থাকবে নদীর কিনারে, চৌকো,
থাকবে শ্যাওলা রাঙানো একটি নৌকো,
ফিরে এসে খুব আলতো ডাকবো, বউ কই....
রাজি?”


সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

১৯ জুন, ২০১৮, চন্দননগর, রাত্রি ১১.৪৫

১।

অপলক দৃষ্টিতে লাশটার দিকে চেয়ে থাকে বাসু। মনে হয় এইমাত্র খুনটা যে করল সে অন্য কেউ। ঠিক এইভাবে তো আজকে অন্য একজনের খুন হবার কথা ছিল। সেই যার বিরাট বড়ো বাড়ি, সেই যাকে শুরু থেকে মাস্টার বলে ডেকে এসেছে সে। দেবাশিস তাকে নিজের শর্তে চালাতে চেয়েছিল। ভেবেছিল আজ থেকে তাকেই মাস্টার বলে মানবে বাসু। এমন আবার হয় নাকি? বাসু মানতে চায়নি। দেবাশিস সজোরে একটা থাপ্পড় মেরেছিল তার গালে। বলেছিল, "পোষা কুত্তা, কুত্তার মতো থাকবি। ট্যাঁ ফুঁ করবি তো সোজা নরকে পাঠিয়ে দেব। আর বেরোতে পারবি না।"

দেবাশিসকে কথায় পেয়েছিল। বলে চলেছিল, কতদিন ধরে সে অপেক্ষা করেছে আজকের দিনটার জন্য। তার শেষ বাধা, সেই মাস্টার আজ দূর হবে। বাসু তাকে সাহায্য করবে। তবে বাসুর কিছু হবে না। তুর্বসুকে পুলিশ ধরবে খুনের পায়ে। আর সেই খুনের সহকারী নিশীথ দত্ত। সবকিছু দেবাশিস ঠিক করে রেখেছে। বাসুকে শুধু তার ইচ্ছেমতো চলতে হবে। এই প্রথম বাসু আদেশ মানতে অস্বীকার করল। আরও একটা চড়। আরও একটা। বাসু দুহাত দিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করল। দেবাশিস মেরেই চলে। শেষবার বাসু হাত বাড়িয়ে দেবাশিসের কবজি চেপে ধরল ইস্পাতকঠিন হাতে।

বাসু প্রথমে ভদ্রভাবে ভূতের বাক্সটা চেয়েছিল। পায়নি।

"অসম্ভব!!" বলেছিল দেবাশিস।

এই ঘরটা বাসুর খুব চেনা। বাসু জানে কোথায় ক্লোরোফর্ম থাকে, কোথায় ইথার। এই দেবাশিস নামের লোকটার গায়ে বিশেষ জোর নেই। নেতিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই। অবিরাম মাথার ভিতরে কে যেন বলে চলেছে, "লিং চি"....

"লিং চি"... "ডেথ বাই থাউজেন্ড কাটস।" লোকটা বেঁচে থাকতে কাউকে শাস্তি দেয়নি। দেবাশিসের প্রতিটা নোংরা পাপ, প্রতিটা নষ্টামির কথা সে জানে। সে জানে দেবাশিস এখন মরিয়া। খ্যাপা কুকুরের মতো সে যাকে পাবে কামড়াবে। একটাই অস্ত্র তার। ভূত। এই ভূত যতক্ষণ তার বশে আছে, সে সবাইকে বশে রাখবে। বাসুকেও। বাসু আর তার বশে থাকবে না।

বাধ্য হয়ে বাসুকে অন্য পথ নিতে হল। দেবাশিস নিজেও হয়তো ভাবতে পারেনি এমনটা হবে। সে বাসুকে চিনতে পারেনি। বাসু কি নিজেকে চেনে? মুখের স্কি মাস্কটা খুলে নিজেকে বারবার আয়নায় দেখবার চেষ্টা করল বাসু। চেনা চেনা লাগছে কি? লাগছে। যেন গতজন্মে কোথায় দেখেছিল। সময় নেই আর বিশেষ।সে বুঝতে পারছে আবার তলিয়ে যাচ্ছে গভীর অন্ধকারে। সে জানে এরপর সে ঘুমিয়ে পড়বে। কবে কখন আবার জেগে উঠবে কেউ জানে না।

এখন একটা পদক্ষেপে ভুল মানেই সব গণ্ডগোল। প্রথমেই সে কাঁপা হাতে হাতের ছেঁড়া কাগজটার একটা ছবি তুলে নিল দেবাশিসের ফোনে। হোয়াটসঅ্যাপ করুন তুর্বসু রায়ের নম্বরে। তুর্বসু এখনও এসবের কিচ্ছু জানে না। তুর্বসুর জানা উচিত। বারবার সে ভেবেছে তুর্বসুকে জানাবে। পারেনি। এবার হয়তো পারবে। দেবাশিসের ফোনের ফ্লিপ কভার খুলে গুঁজে রাখল সেই কাগজ। টয়লেটের একপাশে রেখে দিল মোবাইলটা। আয়না ঠেলে ঢুকল পিছনের ঘরে। এই ঘর তার সাজাঘর। এই ঘরে ঢুকলে সে বদলে যায়। তার মাথা, হাত, পা, চিন্তা, চেতনা কিছুই ইচ্ছেমতো কাজ করে না। যেন অন্য একজন লোক দখল নিয়েছে শরীরের। মাথার। বাসু এসব পছন্দ করে না। বাসু এতদিনে নিজের মতো সিদ্ধান্ত নিতে শিখেছে। সে বুনসেন বার্নার জ্বালায়। একে একে ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলতে থাকে প্রিয়নাথের পাণ্ডুলিপি, তার নিজের হাতে লেখা ডায়রি। প্রথম প্রথম লোকটা তাকে এই ডায়রি দিয়েছিল। সে যা বলবে লিখে লিখে মনে রাখার জন্য। ঘুম পাচ্ছে। কোনওমতে সব পুড়িয়ে আয়নাটা বন্ধ করে

দিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল তার। ঘুম.... যা সব চিন্তা, সব দুঃখ, সব কষ্ট নিমেষে ভুলিয়ে দেয়... ঘুমাবার আগে অস্ফুটে সে শুধু বলল, "মাস্টার" ....

২।

একটু বাদেই সামান্য খুঁড়িয়ে সেই বাড়িতে ঢুকলেন ফতুয়া পায়জামা পরা, ঝোলা ব্যাগ কাঁধে এক ভদ্রলোক। তাঁর কাছে খবর ছিল, দেবাশিস বাসুকে ব্যবহার করে চরম কোনও অনিষ্ট ঘটাতে চায়। বিশেষ করে আজকে দুপুরে যে ঘটনা ঘটেছে, তা শুনে তিনি শান্তিতে থাকতে পারছেন না। মাস্টারের মুখে সন্ধেবেলা ঘটনাটা শুনে এত রাতে তিনি নিজে আসতে বাধ্য হয়েছেন দেবাশিসকে বোঝাতে। এত কিছুর পরেও। বসার ঘরে ঢুকে চমকে গেলেন তিনি। সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। ভূত নিজের খেলা দেখিয়েছে। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দেবাশিস চেয়ারে বসা।

মৃত।

অণ্ডকোশ ছিন্ন হয়ে লুটাচ্ছে। কোন এক সুতীব্র ঘৃণায় বাসু খুন করে বসেছে দেবাশিসকে। সারা ঘর আলুথালু। ঘরের এক কোণে সোফা জুড়ে কাঠের একটা অদ্ভুত বাক্স পরম মমতায় জড়িয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে একজন। বাসু। এ বাসু ছাড়া কেউ হতেই পারে না....

দেবাশিসের শয়তানি বুদ্ধিতে শিউরে উঠলেন নিশীথ দত্ত।

সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন মাস্টারকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন লোক এসে দাঁড়াল পিছনের খিড়কির দরজায়। বেহুঁশ বাসুকে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে গাড়ি ছুটল কলকাতার দিকে। এই প্রথম তিনি মাস্টারকে মিথ্যে বললেন। জানালেন ভূতের বাক্সের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। হাতে এখন অঢেল সময়। বেশ কয়েকবার বাক্সটায় হাত বোলালেন। এই সেই বাক্স! এর জন্যেই কতগুলো

প্রাণ গেছে! পাশাপাশি খুলে দেখলেন চারটে তরল ভরা বোতল আর একটায় কিছু সাদা বড়ি।

রাত একটা বেজে গেছে। রাস্তায় জনমানব নেই। গাড়ি ছুটল গঙ্গার দিকে। ওপারের বাতিস্তম্ভের আলো নদীতে ধাক্কা খেয়ে যেন ভ্যান গঘের ছবি। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নামলেন। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন গঙ্গার পাড়ে। ঠান্ডা জোলো হাওয়ায় চুল উড়ে যাচ্ছে এলোমেলো। ঝোলাব্যাগ থেকে বাক্স বার করে এক-একটা বোতলের কর্ক খুলে ভিতরের তরল ঢেলে দিলেন গঙ্গায়। একশো বছরের পাপ এতদিনে দূর হল। একদম শেষে বাকি সেই অগ্নিনিরয়। হেল ফায়ার। বোতলে চকচক করছে কটা সাদা বড়ি। ভূতের বড়ি।

অজর।

অমর।

অক্ষয়।

ছুড়ে নষ্ট করে ফেলতে গিয়েও ফেলতে পারলেন না। ঢুকিয়ে নিলেন ফতুয়ার পকেটে। এটা থাক। যদি ভবিষ্যতে কাজে লাগে। কাউকে বলবেন না এটার কথা। মাস্টারকেও না। বাকি রইল গণপতির বাক্স। ওটাকে জলে ফেলতেই সামান্য ভেসে টুপ করে ডুবে গেল সেটা। খানিক সেদিকে চেয়ে গাড়িতে ফিরে এলেন। এবার একটাই কাজ। প্লাস্টিকে মোড়া সেই অণ্ডকোশ। তিনি খুব ভালো জানেন এটা কোথায় ফেলে আসতে হবে। বাড়ি ফিরতে প্রায় ভোর। ভেজানো দরজা দিয়ে উকি মেরে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন তিনি। বাসু ঘুমাচ্ছে। ভালো করে ঘুমাক ছেলেটা। ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

৩।

ওর ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। মাথাটা কেমন ঝিম মেরে আছে। উঠেই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল দেবাশিস গুহ আগের দিন অনেক রাতে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন। প্যাড থেকে ছেঁড়া একটা কাগজের টুকরোর ছবি।

কাঁপা কাঁপা হাতে তোলা। স্পষ্ট কিছু নয়। অনেক চেষ্টা করে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, কোনও ছড়া বা কবিতা জাতীয় কিছু। রুলটানা পাতায় বাংলা অক্ষরে লেখা।

সে এবার দেবাশিস গুহের নম্বরে ফোন করল। ফোন বাজতে থাকল।

পিঁক... পিঁক পিঁক... পিক পিক ...


THE
STROBRIDGE
LITHO CO

কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিস

বিজ্ঞাপন

- এই পুস্তকটি ম্যাসন সিরিজের তৃতীয় বা অন্তিম খণ্ড হিসেবে বিবেচিত হইবে।
- এই পুস্তকে ব্যবহৃত সকল স্থান, স্থানিক ইতিহাস, গুপ্ত সমিতি, গোপন চিহ্ন, চিকিৎসাবিদ্যা ও জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যসমূহ লেখকের জ্ঞানমতে সম্পূর্ণ সত্য।
- পুস্তকে বর্ণিত কিছু চরিত্র সম্পূর্ণ বাস্তব এবং কয়েকটি ঘটনা সরাসরি সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে আহৃত হইয়াছে। যে সকল জীবিত ব্যক্তিকে এই পুস্তকে চরিত্ররূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, লেখক ব্যক্তিগতভাবে দূরভাষে তাঁহাদের অনুমতি লইয়াছেন; যদিচ তাঁহাদের সংলাপ ইত্যাদিতে কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে লেখক তাঁহাদের নিকট ঋণী।
- মূল কাহিনি সম্পূর্ণ কাল্পনিক।
- কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইহার সহিত বাস্তবের মিল পাইলে লেখক বা প্রকাশক দায়ী নহেন।